ঝুমুর আর হারুনের ভালবাসানির্ভর বিবাহিত জীবনে এ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠল। কী সেই প্রশ্ন? কেন হারুনকে ভালবেসেও তার প্রত্যেক অপমানের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত শোধ রচনা করেছিল ঝুমুর?

9 788177 561937

শোধ • তসলিমা নাসরিন

আনন্দ

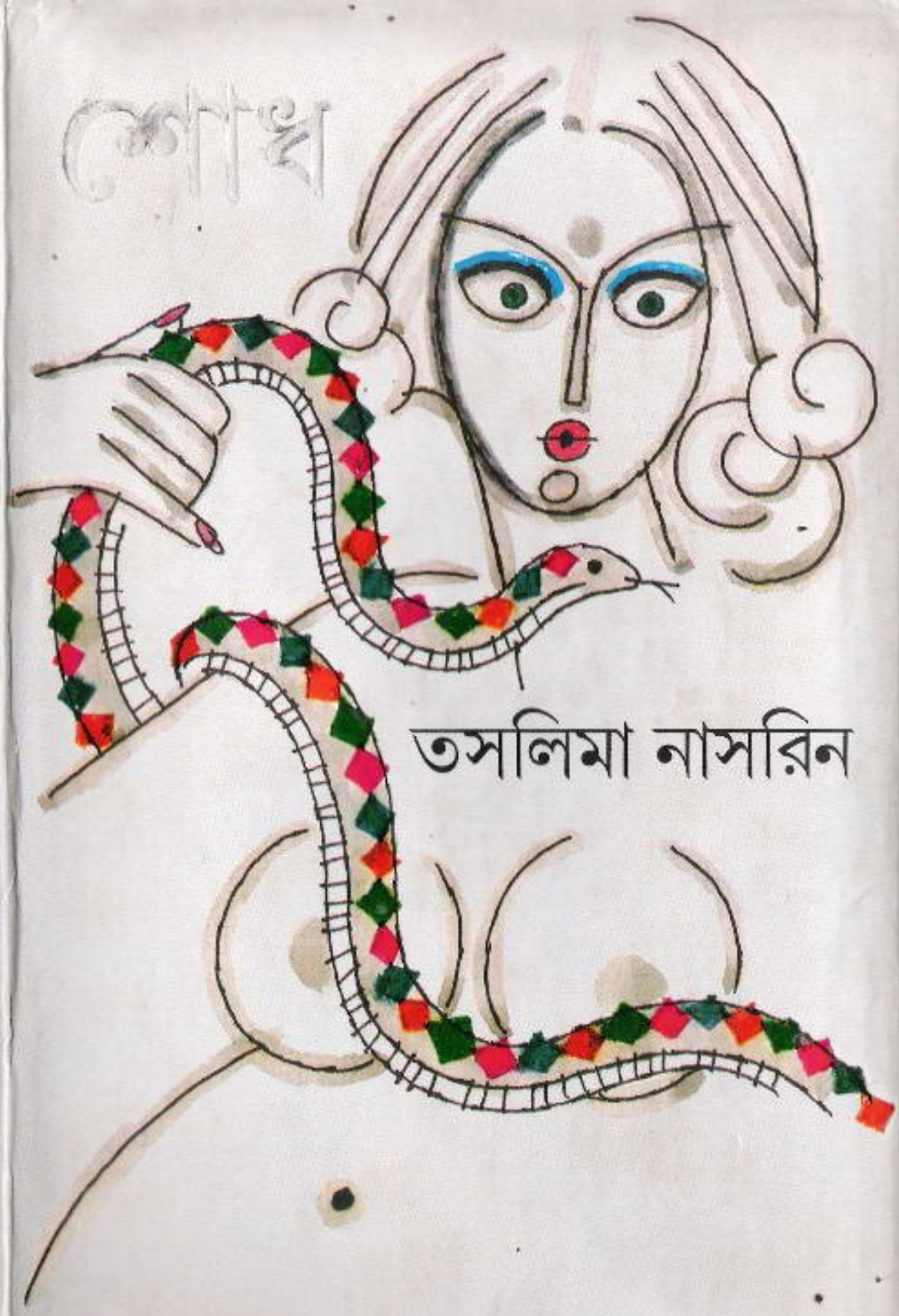

১

চারদিন হল এরকম হচ্ছে। সকালে ঘুম ভাঙার পরই লক্ষ করছি কোনও এক বস্তু নাড়ির ভেতর পাক খেতে খেতে ওপরে উঠছে, শরীর এবং মনের সবটুকু শক্তি খাটিয়ে যতই একে নিম্নগামী করতে চাই, ততই আমার সাধ্যকে ব্যঙ্গ করে বস্তুটি ওপরে ওঠে, উঠতে উঠতে একসময় জিভ স্পর্শ করে, মুখ ভরে ওঠে টকটক লালায়। দৌড়ে স্নানঘরে গিয়ে শেষ অবদি উবু হতে হয়। এ ছাড়াও, সারাদিনে জগৎ কম দুলছে না। পত্রিকা পড়ছি, রান্না করছি, নয়তো বারান্দায় উদাস দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ চোখের সামনে দুলে ওঠে সব। কিছুতে ভর দিয়ে, কোথাও বসে বা শুয়ে দুলে ওঠা জগৎকে শান্ত করে হয়। এরকম যে হচ্ছে তা হারুনকে, স্নান করে প্রাতরাশ সেরে আপিসে যাবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে, বলি, বলার সময় ঠোঁটের কোণে এক টুকরো লজ্জারাঙা হাসি এসে বসে, এ হাসিটির দিকে হারুনের চোখ পড়ে না, পড়ে না কারণ সে তখন গলায় টাই বাঁধছে, চোখ দুটো তার আয়নায় ব্যস্ত। হাসিটি ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যেতে থাকে, যখন দেখি আমার মাথা ঘোরা, গা গুলিয়ে ওঠা, বমি হওয়ার খবর শুনেও হারুন আয়না থেকে চোখ সরাচ্ছে না, আমাকে চুমু খাচ্ছে না, জড়িয়ে ধরছে না, দুহাতে আমাকে শূন্যে তুলে হই হই আনন্দ করছে না, পাঁজাকোলা করে নাচছে না সারাঘর। পাঁজাকোলা নাচ আমি প্রথম দেখেছিলাম শিপ্রার বাড়িতে। ওকে চমকে দেব বলে পা টিপে টিপে ওর ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখি দীপু, ওর স্বামী, ওকে নিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে। চমৎকার ওই দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবী খুব সুন্দর জায়গা, যদি কয়েক হাজার বছর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যেত! দীপু তার দু বাহুর শয্যা থেকে শিপ্রাকে নামালে, শিপ্রা আমাকে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে, দীপু দাঁড়িয়েই ছিল পাশে, বলল, দুচোখে ওর সুখ উপচে পড়ছিল যখন বলছিল, যে, ইদানীং সকালে ওর বমি বমি লাগে শুনে দীপু খুশিতে এমন নাচছে। দীপু সেদিন আপিসেই যায়নি, সারাদিন বাড়িতে উৎসব করেছে। মুগ্ধ চোখে ওদের দেখেছি, কী যে ভাল লাগে ওরা যখন হেসে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, দেখতে। টাই বাঁধায় হারুন এত অপটু নয় যে কোনও শব্দ বা বাক্য সে তার কানে নেবে না, আর চোখের সামনে কারও দাঁড়িয়ে থাকাও সে তার চোখে নেবে না। টাই বাঁধার দৃশ্য থেকে নিজেকে আলগোছে সরিয়ে নিয়ে প্রতিদিনকার মতো রুপোর টিফিন বাক্সে দু চাক পাউরুটি, দুটো সেদ্ধ ডিম আর একটি আপেল ভরে আপিসের ব্যাগে ঢুকিয়ে, সম্ভবত সে শুনতে পায়নি আমি কি বলেছি, ভেবে, আবার এসে সামনে দাঁড়াই হারুনের, তখন টাই বাঁধা শেষ করে জুতো পরছে সে,

যদিও এত মন দিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে তাকে আগে কখনও দেখিনি, তবু ফিতে বাঁধা শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে, গত চার দিন ধরে যা হচ্ছে আমার—বলি। এবারও আগের সেই লজ্জারাঙা হাসিটি ঠোঁটের কোণে এসে বসে, এবং এবারও সেই হাসিটির দিকে হারুন ফিরে তাকায় না। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ হলে মনে হঠাৎ একটি আশা জন্মে যে সে আমাকে চমকে দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে বাড়ির বাইরে, গাড়িতে উঠিয়ে শহরসুদ্ধ ঘুরে বেড়াবে, আপিসে বলে দেবে সে আজ যাচ্ছে না, যাচ্ছে না কারণ আজ তার বড় আনন্দের দিন অথবা এ ঘরেই সে আমাকে কোলে তুলে নৃত্য করবে, বাড়ির সবাইকে ডেকে সুখরবটি দেবে এবং বাচ্চা কার মতো দেখতে হবে, বাচ্চার নাম কি হবে এসব বলে দিন পার করবে, দীপু যেমন করেছিল সেই প্রথম দিন। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ হলে হারুন এসবের কিছুই করে না, আপিসের কালো ব্যাগটি হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোয়, দেখে ঠোঁটে দ্বিতীয়বার যে হাসিটি বসেছিল সেটি উবে যায়, কিন্তু মাথা ঘোরানো আর বমি হওয়া যে, যে কোনও মাথা ঘোরানো আর বমি হওয়ার মতো নয়, তার ইঙ্গিত দিতে, যেন হারুনের না শুনতে পাওয়ার কোনও কারণ না ঘটে, গলার স্বরকে আগের চেয়ে ওপরে তুলে, বলি, বুঝতে পারছ না বুঝি কেন এমন হচ্ছে?

হারুন এবার মুখ খোলে, মুখ খোলে—চোখ খোলে না—চোখ আধবোজা—চোখ দরজায়, বলে, বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ ঘরে আছে, খেয়ে নিয়ো।

চোখের সামনে দুলে ওঠে শিপ্রার চতুর্দোলা।

—কী বললে?

হারুন যে বলেছে আমাকে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ খেতে, তা শুনেও, জিজ্ঞেস করেছি কী বলেছে সে, কারণ বিশ্বাস না হলেও আমার পরখ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে সত্যিই বমি বা বমির উদ্রেককে নেহাত বমি বা বমির উদ্রেক ছাড়া আর কিছু হারুন ভাবছে না। কী বলেছে সে তা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলে সে তার উত্তরটি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাববে, সংশোধন করার হলে করবে, এবং বলবে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ খেয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও প্রস্তাব বা পরামর্শ যদি উদয় হয় মনে বা মস্তিষ্কে, এই সুযোগটি দেওয়া ও কী বলেছে সে তা জানতে চাওয়ার আরও একটি কারণ আমার। হারুন যখন বাইরে বেরোয়, তার পেছন পেছন সদর দরজা অবদি গিয়ে দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম যতক্ষণ না সিঁড়ি পেরিয়ে সে আড়াল হয়, আড়াল হলে দরজার খিল এঁটে ঘরের বউ ঘরে মুখ ফেরাবে। প্রথমদিনই আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, পেছন থেকে হারুনকে যেন কখনও না ডাকি, ডাকলে অমঙ্গল হয়। সে মনে রেখে আজও দরজায় দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়াই কেবল দেখি, আজ যেহেতু কোনও ব্যতিক্রম দিন নয়, আজ যেহেতু যে কোনও বৃহস্পতিবারের মতোই বৃহস্পতিবার, তাকে জিজ্ঞেস করি না কোনও উৎসব উদযাপনের কথা। একবার যে ইচ্ছে হয়নি পেছনে ডাকি, তা নয়, ইচ্ছে হয়েছে ডাকি, ডেকে বলি, তুমি বুঝি একটুও বুঝতে পারছ না এরকম কেন হয়! বলা হয় না, অমঙ্গল-আশঙ্কায় ইচ্ছের টুঁটি টিপে দরজার খিল

এঁটে ঘরের বউ ঘরে মুখ ফেরাই। ঘরে রাজ্যির কাজ। বাড়ির সবার জন্য নাস্তার আয়োজন করতে হবে, রসুনি রুটি বেলবে, সে রুটি আমাকে চুলোর পাশে দাঁড়িয়ে ভাজতে হবে, রসুনিই ভাজতে পারে, কিন্তু আমি ভাজলে বাড়ির সবাই আরাম বোধ করে, আমি যে লক্ষ্মীবউ সে সম্পর্কে সবাই নিশ্চিত হয়। রুটির সঙ্গে কী হবে, ডিম ভাজা, নাকি সবজি, সে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, রসুনি নিলেও পারে, কিন্তু আমি নিলে বাড়ির সবারই ভাল লাগে। বাড়ির সবাই খুশি হলে হারুনও খুশি হয়, মূলত হারুনকে খুশি করতে আমি গত দেড়মাস ধরে এ বাড়ির সবার জন্য তিনবেলা খাবার আয়োজন করা, ঘরদোর গোছানো, কাপড়চোপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছি, মাথার ঘোমটা দেড় মাসে একবারও খসেনি, না খসলে বাড়ির সবাই খুশি হয়, বাড়ির সবাই খুশি হলে হারুনও খুশি হয়, তাই।

কিন্তু আজ যে কোনও বৃহস্পতিবারের মতোই বৃহস্পতিবার, কোনও বিশেষ দিন নয় কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম করার, তবু রসুনিকে রান্নাঘরে রুটি বেলতে দেখেও, ও-ঘরে না ঢুকে সোজা শোবার ঘরে এসে শুয়ে থাকি বিছানায়। পাক খেয়ে ওপরে উঠতে থাকা বস্তুকে যেমন আটকে রাখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হই তেমনই বুক চিরে বেরোতে থাকা দীর্ঘশ্বাসকেও। বারবার শিপ্রার সুখী মুখখানা ভেসে ওঠে মনে, সূক্ষ্ম এক ঈর্ষাও বুকের এক কোণে পাখির বাসার মতো বাসা বাঁধে। কী আছে শিপ্রার যে দীপু তাকে কোলে তুলে নাচে আর হারুন শুকনো মুখে আমাকে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ খাওয়ার উপদেশ দেয়! শিপ্রা কি আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত, বেশি সুন্দরী, আমার চেয়েও ভালবাসতে শিপ্রা বেশি জানে! কোনও জাত-শত্রু যদি থাকে আমার সেও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে রূপে গুণে শিপ্রার চেয়ে এক কাঠি কেন, দু কাঠি ওপরে আমি।

আমার সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছে শিপ্রা, কলেজে একবছর পড়ে পরীক্ষা না দিয়ে, মোদ্দা কথা রণে ভঙ্গ দিয়ে ওর ক্লাসেরই এক ছেলে দীপুকে বিয়ে করে পিঁপড়ের মতো কিছু আসবাব কিছু বাসন কোসন সঞ্চয় করে সংসার করছে। ভালবেসে বিয়ে তো আমিও করেছি, সংসার তো নিপুণ হাতে আমিও করছি, পান থেকে চুন খসতে দিচ্ছি না, স্বামীর আদেশমতো পছন্দমতো জীবনের প্রতিটি দিন চলছে, দিন কেন, প্রতিটি বেলা চলছে, প্রতিটি মুহূর্ত, তবে এই বৈষম্য কেন। বৈষম্যের কারণ খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হতে থাকি, দীর্ঘশ্বাস আটকে রাখার ব্যর্থতার মতো। শিপ্রাকে গুলশানের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেছিল দীপু। দীপুর আত্মীয়রা বলেছিলেন, এত টাকা খরচা করার দরকার কী! সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করলে তো খরচ অনেকটা বাঁচে। আত্মীয়দের উপদেশে কান দেয়নি দীপু, নিজের অত টাকা ছিল না, সরকারি হাসপাতালে সময়মতো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ডাক্তার পাওয়া গেলেও বিছানা পাওয়া যায় না, ভিড় বাড়লেই রোগীদের বিছানা থেকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হয় মেঝেয়, এসব খবর পেয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে সে শিপ্রাকে ক্লিনিকে নিয়েছিল। ক্লিনিকে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম শিপ্রাকে, শিপ্রাকে দেখার চেয়ে বেশি দেখেছি দীপুকে, দীপুর ব্যস্ততা। শিপ্রা কখন ফলের রস খাবে, কখন দুধ, কখন ওষুধ, ওসব নিয়ে দীপু ছিল অসম্ভব রকম

উত্তেজিত। সময় দেখে সে ওর মুখের সামনে তুলে ধরছিল সব, ওকে খাইয়ে পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল চুলে, পেটেও নাক ঘষে বারবার বলছিল আমার ছোট্ট বাবুসোনাটা কী করছে ওখানে! শিপ্রা ব্যথায় সামান্য নড়ে উঠলেই দৌড়ে দৌড়ে ডাক্তার ডাকছিল দীপু, ডাক্তার না পেলে নার্স ডাকছিল। কখনও নার্স, কখনও ডাক্তার এসে শিপ্রাকে পরীক্ষা করে যাচ্ছিল, যাবার সময় দীপুকে বলছিল এত উতলা না হতে, সুন্দর মুখের একটি নার্স চোখ টিপে বলেছিল, প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় অবশ্য বাবারা এমন উতলা হয়ই। দূরে একটি চেয়ারে বসে এসব দেখতে দেখতে মনে মনে শিপ্রার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে একটি চাঁদমুখ বাচ্চার মা হয়েছি, মনে মনে বাচ্চাটিকে আদর করেছি। গা গুলিয়ে ওঠে আবার, নাড়ির ভেতর পাক খেতে খেতে ওপরে উঠছে বস্তুটি, দৌড়ে স্নানঘরে গিয়ে উবু হই। বাড়িতে হারুনের মা, বাবা, দু ভাই, ভাইএর বউ, বোন, বোনের স্বামী সন্তান কেউ জানে না এ বাড়িতে একজন মানুষ বড় অসুস্থ, তার বমি হচ্ছে, তার জগত দুলছে, সম্ভবত সে সন্তান ধারণ করছে, সম্ভবতই বা কেন, এ নিশ্চিত যে সে সন্তান ধারণ করছে, সন্তান ধারণই এসব উপসর্গের কারণ।

স্নানঘর থেকে বেরোতেই দেখি রসুনি দাঁড়িয়ে আছে, কেন দাঁড়িয়ে আছে সে আমি অনুমান করতে পারি, সবাই ঘুম থেকে উঠেছে, এখন নাস্তা খেতে বসবে, থালায় গরম গরম রুটি চাই, অথচ রুটি এখনও ভাজা হয়নি, রুটি ভাজতে আমি এখনও যাচ্ছি না রান্নাঘরে। রসুনির চোখে প্রশ্ন, কেন? কিছু বলতে হয় না রসুনিকে, ও আমার চোখ দেখে বুঝে নেয় আমার ইচ্ছে নেই রান্নাঘরে যাওয়ার। রসুনি কথা দেয় ও আজ নিজেই রুটি ভেজে ডিম ভেজে সবাইকে খাওয়াবে, আমার দায়িত্বটি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।

আবার সেই বিছানায় উপুড় হয়ে শোয়া আমার, জানালা গলে বাইরে তাতানো রোদ বিছানায় এসে পড়েছে, পিঠ পুড়ে যাচ্ছে সে রোদে, তবু ইচ্ছে করে না জানালার পর্দা টেনে দিতে, পর্দা টানলে আকাশটুকু আর পাব না, ওই এক চিলতে আকাশটুকু বড় প্রিয় আমার। সারাদিনের কাজ শেষে আমি ঘরে বসে আমার ওই আকাশটুকু দেখি, মনে মনে প্রতিদিনই পাখি হই, উড়ে বেড়াই। এটুকু ঢেকে গেলে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এটুকু ঢেকে গেলে আমার নিজের জগৎ বলে কিছু আর থাকে না। আমাদের ঘরটি, হারুন আর আমি যে ঘরে ঘুমোই, বাড়ির দক্ষিণের ঘর, ঘরের লাগোয়া বারান্দাটিতে বিকেলের দিকে দাঁড়ালে হু হু করে হাওয়া এসে গা ভাসিয়ে নেয়। বারান্দা থেকে বড়জোর বাড়ির বাগানখানা চোখে পড়ে, বাকি সব উঁচু দালানকোঠা, রাস্তায় লোকজন হাঁটছে, গাড়িঘোড়া চলছে, এমন চলমান জীবনের ছবি খুব দেখতে ইচ্ছে হয় আমার, যে বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায় সেটির গা ঘেঁষা ঘরটি রাণু আর হাসানের, প্রথম কদিন ও-বারান্দায় দাঁড়িয়েওছিলাম, শাশুড়ি বললেন বাড়ির বউয়ের এমন রাস্তার লোকের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ভাল দেখায় না, তা ছাড়া পাড়া-পড়শি দেখলে মন্দ বলবে। হারুনকে শাশুড়ি নিজেই জানিয়েছিলেন ব্যাপারটি, যে আমি ফাঁক পেলেই রাস্তার ধারের বারান্দাটিতে দাঁড়াই, হারুন শুনে বলেছে, তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই

ঝুমুর? তুমি যে এ বাড়ির বউ, তা বোধ হয় বেশির ভাগ সময় ভুলেই যাও। এ কথা হারুন, আমি বেশ জানি, ঠিক বলেনি। এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে আমার এক মুহূর্তের জন্য মনে করার স্পর্ধা হয়নি যে আমি এ বাড়ির বউ নই। গলা নামিয়ে কথা বলতে হয়, অনেকটা ফিসফিস করে, কেবল গলা নামিয়ে নয় চোখ নামিয়েও কথা বলতে হয়, বড়দের কারও চোখে যেন চোখ না পড়ে, না পড়াটাই লজ্জাশীলা লক্ষ্মীবউয়ের লক্ষণ। লক্ষ্মীবউ হওয়াটা যে সহজ ব্যাপার নয়, বিয়ে হওয়ার পর থেকে আমি বেশ টের পাচ্ছি, হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাকে বলে। বিয়ের দিন হাবিব মাথায় লম্বা এক টুপি পরে হিজড়াদের মতো নাচছিল, দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, হারুন জিভে কামড় দিয়ে দৌড়ে এল আমার দিকে, হচ্ছে কী, চিৎকার করছ কেন?

—চিৎকার করছি কোথায়! হাসছি।

—এভাবে হাসতে হয় নাকি? অন্য ঘর থেকে লোকে শুনছে।

বিয়ের আগে আমি অমন করেই হাসতাম, আমার হাসি দেখে হারুন বরাবরই বলেছে, তুমি খুব প্রাণোচ্ছল মেয়ে। তাইতো এত ভাল লাগে তোমাকে।

—তাই বুঝি?

—তাই।

সেই হারুনই তেড়ে আসে আমাকে থামাতে।

—কী করে হাসতে হবে তবে?

—হাসো ক্ষতি নেই, তবে এমন ব্যাটাছেলেদের মতো শব্দ করে হেসো না।

শব্দহীন হাসি আমি কোনওকালেই হাসিনি, ধীরে ধীরে এখন সেটি অভ্যেস করতে হচ্ছে। আজকাল অবশ্য হাসির কোনও কারণ ঘটে না। একরকম বাঁচোয়া।

রাস্তার ধারের বারান্দায় যখন দাঁড়িয়েছিলাম, মাথায় আমার ঘোমটা ছিল কি না হারুন পই পই করে জিজ্ঞেস করেছে। যতবারই বলেছি, মনে নেই, ঘোমটা ছিল কি না, ততবারই সে অবাক হয়েছে। লোকে নিশ্চয়ই মন্দ বলবে, ছি ছি! আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলেছে, ও-বাড়ির কোনও বউদের চেহারা দেখ কখনও? দেখ না। কারণ বউরা ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাইরে বেরোয় না। সব বউই ঘরের ভেতর থাকে। বারান্দায় এসে পুরো পাড়ার লোকদের চেহারা দেখায় না। এখানে এমনই নিয়ম, যে বাড়ির বউ-এর টিকিটি কেউ দেখতে পায় না, সে বাড়ির বউ-এর সুনাম তত বেশি। হারুনের অনুযোগের পর রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়ানো আমার বলতে গেলে চুকেছে। ধানমণ্ডি এলাকাতেও যে কোনও বাড়ির বউ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন কি না এ নিয়ে মাথা ঘামায় লোকে আমার জানা ছিল না। ওয়ারি হলে না হয় কথা ছিল। পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকায় লোকে এর ওর বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, কে কোথায় দাঁড়াচ্ছে, বসছে, শুচ্ছে এসব নিয়ে কথা বলে, লোকের লম্বা নাক অন্যের বাড়িতে গলানোর জন্য চব্বিশ ঘণ্টা খাড়া থাকে।

বিয়ের এক সপ্তাহ পর সকালে হারুন যখন আপিসে যাচ্ছে, শিপ্রার বাড়ি যাব বলতে ও অবাক হয়েছিল, শিপ্রার বাড়ি কেন?

—কেন মানে? যাব দেখতে।

—কী দেখতে?

তাও তো বটে, কী দেখতে! শিপ্রাকে দেখতে। শিপ্রাকে দেখার হঠাৎ জরুরি কী প্রয়োজন আমার তা হারুন বুঝে পেল না। ওদের বাচ্চা, যে বাচ্চার নাম আমার দেওয়া, সুখ, সুখকে এখনও আমার দেখা হয়নি, ওকে দেখতে। হারুন হেসে বলেছিল, ঝুমুর তোমার আগের জীবন কিন্তু এখন আর নেই। এই জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

—কীরকম শুনি? আমার তো মনে হয় সব একই। কেবল তোমাকে আরও কাছে পাচ্ছি, এই যা বাড়তি পাওনা।

—আর কিছু বদল দেখতে পাচ্ছ না? তোমার নাম বদল হল, তুমি এখন মিসেস হারুন উর রশিদ, তুমি এখন হাসান হাবিব আর দোলনের ভাবী, তোমার ঠিকানা আর ওয়ারি নয়, ঠিকানা ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা। এখন তুমি আগের মতো টই টই করে ঘুরে বেড়াতে পারবে না, এখন তুমি ঘরের বউ।

—ও।

শিপ্রার বাড়িতে হারুন পরে নিজেই আমাকে নিয়ে গেছে। যদিও বলেছে, মোটে তার সময় নেই, এটুকু সময় বের করতে কম হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি তার। বিয়ে আমার জীবনকে যে বদলে দিয়েছে সে আমি টের পেয়েছি, হারুনকেও বদলেছে। আগে এমন দিন গেছে যে সারাদিন, সকাল থেকে সন্ধে অবদি ঘুরে বেড়িয়েছি দুজন, ঢাকার বাইরে চলে গেছি, কখনও কুমিল্লা, কখনও নেত্রকোণা, কোনও কারণ নেই, এমনি, গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে, কংশের জলে সূর্য ডোবা দেখতে, টিলার ওপর বসে আকাশে তাকিয়ে থাকতে। হারুন বলত, তোমার সঙ্গে ইচ্ছে করে জীবনভর ঘুরে বেড়াই, ইচ্ছে করে সারাজীবন এভাবে ঘন হয়ে বসে জীবনের সব গল্প করি, কাজ কর্ম সমাজ সংসার কিচ্ছু ভাল লাগে না। সারাদিন এক সঙ্গে কাটানোর পরও হারুনের মন ভরত না, বলত, দিন এত ছোট কেন, বল তো! দিন ছোট আমার কাছেও মনে হয়েছে। বারো বছরের মতো দীর্ঘ একটি দিন হলে মনে হত যেন সাধ মিটবে। অথচ বিয়ে ঘটে যাওয়ার পর হারুন বলতে শুরু করেছে, জীবনে কাজই হল সবচেয়ে বড়। মন দিয়ে কাজ না করলে কেউ সিঁড়ি ডিঙোতে পারে না, সে যে কাজই হোক না কেন। বিয়ের তিনদিন পরই যখন হারুন নটা-পাঁচটা আপিস করতে শুরু করল, বড় খালি খালি লেগেছিল আমার, বলেছিলাম আরও কটা দিন না হয় ছুটি কাটাও! হারুন কপাল কুঁচকে বলেছে, এতদিন আপিস না করে আমার কত টাকার ক্ষতি হয়েছে তা তোমার সাধ্য নেই হিশেব করা। আর এখন খামোকা ঘরে বসে থাকব কেন? বিয়ে তো হয়েছেই।

—বিয়ে হয়ে গেলে বুঝি আর ইচ্ছে টিচ্ছে থাকে না?

—তা থাকবে না কেন? তবে এখন তোমাকে চাইলেই পাওয়া যাবে, হাতের কাছেই যখন আছ, তাই আগের মতো পাগল পাগল লাগে না।

হারুন এখন চাইলেই আমাকে পেতে পারে, মোটেই সে মিথ্যে বলেনি। তবে কি আমাকে নাগালের মধ্যে পেয়েছে বলেই আমাকে কাছে পাবার বা জয় করার

আকাঙ্ক্ষা তার কমে গেছে? হতে পারে, তবে আমার মনে হয় যখন তখন কাউকে হাতের কাছে পাওয়া মানেই হৃদয়ের কাছে পাওয়া নয়। কারণ আমি নিজেই লক্ষ করেছি, হারুনের নাগালে এসে আমি তার সঙ্গে যত দূরত্ব অনুভব করেছি, নাগালের বাইরে যখন ছিলাম, তত করিনি।

রসুনি আলগোছে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে, রোদে পিঠ পেতে শুয়ে থাকা আমাকে দেখে জানালার পর্দা টেনে দেয়, এরপর ফিসফিস করে বলে, ভাবী নাস্তা খেয়ে যান। না নাস্তা খাব না, শরীর ভাল নেই। শরীরে ভাল না হওয়ার কি কারণ ঘটেছে, আমার খুব কাছে সরে এসে আমি ছাড়া আর কেউ যেন শুনতে না পায়, এমন মৃদু স্বরে ও জানতে চায়। রসুনির ফিসফিসের কারণ আমি অনুমান করি, ভয়, ভয় কারণ সকালের নাস্তা না তৈরি করায় আমি একটি অপরাধ করেছি, অপরাধীর সঙ্গে খোসগল্প করলে লোকে অসন্তুষ্ট হবে, ভেবে—অথবা এও হতে পারে যে সংসারে আর যে কারও শরীর খারাপ হলেও হতে পারে, কিন্তু বউদের হওয়া যেহেতু উচিত নয়, যেহেতু বউদের থাকতে হয় সদা সুস্থ, কারণ বউদের কাঁধে সংসারের সব দায়িত্ব, কারণ সংসারে অন্য কারও অসুখ করলে বউদের হাতের সেবাতেই তাদের সেরে উঠতে হয়, তাই বউদের ত্রিসীমানায় যেন রোগ শোক জাতীয় বালাই না ঘেঁষে, ঘেঁষলে সংসারের আর সবাইকে তা বিরক্ত করে, আর বিরক্তির কারণটির সঙ্গে কোমল স্বরে কথা বলা যে রীতিমতো অন্যায়, ভেবে। রসুনিও কোনও বাড়িতে বউ ছিল, ওকেও ও-বাড়িতে তাজা থাকতে হয়েছিল, ওরও অসুখ করা বারণ ছিল, রসুনি শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়া বোঝে বলেই ফিসফিস করে, বারবার দরজায় চোখ চলে যায় ওর, ঘরে কেউ ঢুকছে না, ওর ফিসফিস শুনছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে। রসুনি জানালার পর্দা টেনে দিয়েছে রোদ থেকে আমার গা বাঁচাতে, আমার জন্য রসুনির বাড়তি একটি স্নেহ আছে আমি বুঝি, সম্ভবত এ বাড়ির কাজগুলো ভাগ করে রসুনি আর আমি করি বলে। এ বাড়ির কাজের মেয়ে রসুনি, আমি এ বাড়ির বউ, দুজনের পদে বিস্তর তফাত হলেও কাজ করার বেলায় তফাত নেই। রসুনিও রাঁধে, আমিও রাঁধি, রসুনিও ঘর দোর পরিষ্কার করে, আমিও করি। মাঝে মাঝে রসুনিকে আমার চেয়ে ভাগ্যবতী মনে হয়, রসুনি যখন ইচ্ছে এ বাড়ির কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে, আমি পারি না। রসুনি তার কাজের বিনিময়ে মাইনে পায়, আমি পাই না। রসুনি মাথায় ঘোমটা ইচ্ছে করলে দেয়, ইচ্ছে না করলে দেয় না, ইচ্ছে না করলেও আমাকে ঘোমটা দিতে হয়। ও যখন মেঝেয় বসে বলে যাচ্ছিল নাস্তা খেয়ে হারুনের বাবা মা এখন বিশ্রাম করছেন, হাবিব বাইরে গেছে, হাসান ঘুমোচ্ছে, রাণু কী একটা বুনছে, তখনই ঘরে ঢোকেন শাশুড়ি, কী কারণে কাজ ফেলে রসুনি এ ঘরে আড্ডা দিচ্ছে তা জিজ্ঞেস করেন। রসুনি দ্রুত আমার মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে হুড়মুড়িয়ে দাঁড়ায়, দৌড়োয় বলতে বলতে আমাকে নাস্তা খেতে ডাকতে এসে দেখেছে আমার অসুখ, তাই খানিক বসেছিল। শাশুড়ি বিছানায় বসে আমার কপালে হাত দিয়ে বলেন, না, জ্বর তো নেই। যেন অসুস্থতার একমাত্র লক্ষণ জ্বর। দশটা বেজে গেছে, আর আমি এখনও শুয়ে আছি, দৃশ্যটি দৃশ্য

হিশেবে কুৎসিত, সে আমি অনুমান করি। নাস্তা খেতে ইচ্ছে করেনি আমার, তা তিনি মেনে নিচ্ছেন কিন্তু জানি দুপুরের রান্নাটা দেখিয়ে দেবার জন্য, সবজি বা ডাল না হোক, মাছ বা মাংসটা অন্তত রান্না করতে রান্নাঘরে যাচ্ছি না কেন তাই তিনি বিরক্ত হচ্ছেন ভেবে মাথা তুলে বলি, নিচু গলায়, যে জ্বর নেই তা ঠিক, কিন্তু বিষম মাথা ধরেছে। মাথা ধরা! এ নাকি তাঁর লেগেই আছে। মাথা ধরলে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললে বেশ সেরে যায়, এ এমন কিছু নয়। আমাকে ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালার জন্য উঠতে হয়। কিন্তু স্নানঘর অবদি যাওয়ার আগেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দীর্ঘশ্বাসটি আমার মাথার কারণে নয়, দোলনের জন্য। দোলনের স্বামী টোবাকো কোম্পানিতে চাকরি করত, সে চাকরি চলে গেছে, এখন আনিস—দোলনের স্বামী এ বাড়িতে বসে আছে, হারুন কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আনিসকে ব্যবসা ধরিয়ে দিতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে হয়। শাশুড়ি সাধারণত তাঁর দু ছেলে হাসান আর হাবিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন। দুজনের কারও তেমন পড়াশুনা হয়নি, হাসান আই এ পর্যন্ত পড়েছে, হাবিব ম্যাট্রিক পাশ করার পর নামকাওয়াস্তে কলেজে ভর্তি হয়েছে, ক্লাস করার পরীক্ষা দেওয়ার নাম গন্ধ নেই। সমাজ সংসার নিয়ে হাসানের খুব একটা আগ্রহ নেই। বাড়ির কারও সঙ্গে কোনও কিচির মিচিরে সে যায় না, টেবিলে খাবার দেওয়া হলে ডাল ভাত হলেও যা, মাছ মাংস হলেও তা, রা-শব্দ খুব করে না, মুখ বুজে খেয়ে ওঠে। এমন মুখচোরা ছেলে হঠাৎ এক সন্ধেয় লাল একটি শাড়ি যেমন তেমন করে পরা বারো কি তেরো বছরের এক মেয়েকে বাড়ি তুলে বলল, একে বিয়ে করেছি। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, শাদা একটি রুমালে নাকের জল চোখের জল মুছতে মুছতে মেয়েটি বড় বড় চোখ করে সবার দিকে তাকাচ্ছিল, মেয়েটির ঠোঁটের লাল ছতড়ে চিবুক বেয়ে নামছিল, বাড়ির সবার চোখ তখন হাঁ, মুখ হাঁ—এ মেয়ে কে, কোত্থেকে একে তুলে এনেছে হাসান, রাস্তা থেকে, নাকি বেপাড়া থেকে নাকি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে ভাগিয়ে আনা! হাঁ হওয়া চোখগুলো এক মুখ থেকে, আরেক মুখে ঘুরে বেড়ায়, কপালে সংশয়ের ভাঁজ একটি একটি করে বাড়তে থাকে। হাসান যখন মেয়েটির হাত ধরে ভেতরে ঘরের দিকে হাঁটতে নিচ্ছে, হাসানের চুল মুঠি করে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বৈঠক ঘরে নিয়ে গেলেন শ্বশুরমশাই, হারুনও হিড়হিড়ের পেছন পেছন দৌড়ে কষে এক থাপ্পড় লাগিয়েছে হাসানের গালে, দেখে লাল শাড়ির মেয়েটি মেঝেতে গড়িয়ে ভ্যাঁ। ভ্যাঁ কেন, ঘটেছে কি? ঘটেছে, লাল শাড়ি নাকের জলে চোখের জলে প্রায় স্নান করতে করতে বলল, খিলগাঁও অফিসার্স কলোনিতে তার বাবার বাড়ি, হাসানের হাত ধরে বাড়ি থেকে সে নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে এসেছে। এসব ঘটনা রসুনির কাছ থেকে শোনা আমার, আমি এ বাড়িতে আসার ছ মাস আগে ঘটনা ঘটেছে। বিয়ের পর হাসান চেষ্টা করছে বিদেশ যেতে, এই দেশে আর যেই থাকুক, মানুষ থাকতে পারে না, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। প্রায়ই বিদেশ যাওয়ার নানারকম কাগজ এনে সে বাড়ির মানুষকে চমকে দেয়, শিগগিরই সে দেশ ছাড়ছে বলে সবাইকে আশার এবং আতঙ্কের মধ্যে রাখে। হাবিব একেবারে উলটো, বিদেশ তাকে টানে না। দেশের মজা নাকি

আলাদা, লাটসাহেবের মতো বেঁচে থাকা যায়। বাড়িতে হল্লা করে সবচেয়ে হাবিবই বেশি, প্রেমে পড়ার বা বিয়ে করার কোনওরকম ইচ্ছে নেই, এসবকে খামোকা ঝামেলা বলেই তার মনে হয়। মাছ খাবে না, মাংস খাবে, আবার গোরুর মাংস হলে চলবে না, তার মুরগি চাই, মুরগি আবার যে কোনও মুরগি হলে চলবে না, কচি মুরগি চাই। প্রায় বিকেলে একটি গিটার গলায় ঝুলিয়ে ওতে টুংটাং করে আর গলা ছেড়ে গান গায়। বলে, সুরের মজা একবার পেয়ে গেলে লেখাপড়া, নটা পাঁচটার গোলামি কিছুই করতে ইচ্ছে না, তুচ্ছ মনে হয়, জীবন আর কদিনের, একটু নেচে গেয়েই না হয় পার হল। হাবিবের কথা ও কাজে শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই উদ্বিগ্ন, হারুন আরও বেশি। আজ শাশুড়ি হাসান বা হাবিবের কী গতি হবে সে বিষয়ে না ভেবে আনিসের গতি নিয়ে ভাবছেন। আমার কাছে আনিসের অসুবিধেটির কথা পাড়ার কারণ, আমি অনুমান করি, যেন আমি হারুনের খুব মন ভাল সময়ে আনিসের এই দুরবস্থার কথা পাড়ি। আমি জানি, এসব হারুনকে বলার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ সে নিজেই এ নিয়ে ভাবে। প্রায় রাতেই ঘরে বসে ঘন ঘন সিগারেট ফোঁকে আর গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী এত ভাব বল তো!

—ও তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না কেন, তুমি বলেই দেখ না, বুঝি কি না বুঝি।

আমি যে বুঝব, রান্নাবান্নার কাজ করলেও আমি যে রসুনির চেয়ে বেশি লেখাপড়া করেছি, আমি যে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী—এ কথা মনে করিয়ে না দিলেও, আমি যে বুঝব বোঝালে, তা অনেকটা জোর দিয়ে বলি, বলার পরও আমাকে বোঝানোর কোনও তাগিদ আমি দেখি না হারুনের মধ্যে।

চাপাচাপি করলে বলে, আনিসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ওকে কোনও ব্যবসায় লাগানো যায় কিনা ভাবছি।

—তোমার নিজের ব্যবসায় তো নিতে পারো।

—তা পারি। কিন্তু ভাবছি, কোরিয়ার সঙ্গে কোলাবোরেশনে একটা ফার্ম হচ্ছে। ওতে ওকে ম্যানেজার করে দেওয়া যেতে পারে।

আমি হাসান আর হাবিবের কথা তুলেছিলাম, কারণ শাশুড়ি আমাকে তাগাদা দিতে বলেছিলেন, হারুন শুনে বলল, আমি ওদের দুজনকেই পাঠিয়ে দেব বিদেশে। যা হোক কিছু করে খাক।

হারুন যখন নিজেই ভাবে তার ভাই বোন নিয়ে, ওদের গতি করা নিয়ে, আমার কোনওই প্রয়োজন নেই তাগাদা দেওয়ার, সে আমি বুঝি। হারুন প্রায়ই দোলন, আনিস আর তার নিজের মা বাবার সঙ্গে আনিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে বৈঠক ঘরে বসে, আমি সেখানে চা বিস্কুট দিয়ে আসি মাত্র। অথচ শাশুড়ি আমাকে আনিসের সমস্যার কথা বলছেন, বলার উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে এই সমস্যাটি যে সত্যি বড় সমস্যা তা যেন আমি বুঝতে পারি, হয়তো তিনি ভাবছেন এটিকে মোটেও সমস্যা বলে ভাবছি না, তাই তিনি জানাতে এসেছেন, আমার মস্তিষ্কের কোষে প্রবেশ করিয়ে দিতে এসেছেন খবরটি যে দোলনের এখন

বড় দুঃসময়। তিনি সম্ভবত ভাবছেন যে যেহেতু হারুন আমাকে ভালবাসে, আমি যদি হঠাৎ বলে বসি যে না কারও জন্য ভাবার দরকার নেই, কেবল আমার জন্য ভাব, তবে ভালবাসার কারণে তার মতিভ্রম হলেও হতে পারে, হতে পারে হারুন নিজের ভাই বোনের সমস্যাকে আর সমস্যা বলেই মনে করার সময় পাচ্ছে না, এরকম হলে আমি যেন হারুনকে দিয়ে যে করেই হোক দোলনের এই দুঃসময়কে সুসময় করার জন্য ব্যস্ত হই। আমার দুঃসময়ের কথা কে ভাবে, আমার গা গরম নয়, তাই আমার কোনও অসুস্থতা নেই, আমাকে রান্নাঘরের দিকে যেতে হয়, বাড়িতে কাজের মানুষ দুজন আছে, কেবল রসুনিই নয়, সখিনা বলে আরও একজন, ওরা দুজনেই ভাল রাঁধতে পারে, তবু বাড়ির বউ-এর হাতের রান্না নাকি সকলেরই খাওয়া উচিত। বিশেষ করে স্বামী কেন চাকর বাকরের হাতের রান্না খাবে! ওদের হাতের রান্নাই যদি খেতে হবে তবে আর বিয়ে করা কেন? মাথায় ঠাণ্ডা জল না ঢেলেই রান্নাঘরের পেঁয়াজ রসুনের, কাঁচা মাছের, হলুদের আদার গন্ধের মধ্যে নিজেকে নিজের ঘোরানো মাথাসহ ঢুকিয়ে দিই। রসুনি মাছ কুটে রেখেছে, আনাজপাতি কাটা ধোয়া সারা, সখিনা মশলা বাটছে। আমার গা গুলিয়ে ওঠে, তবু চুলোয় কড়াই চেপে রান্না চড়িয়ে দিই। রসুনি ভাল রাঁধে তবু আমার রান্না খেতে সবারই কেন এত ইচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তেলে পেঁয়াজ ছেড়ে হলুদ মরিচ ধনে ছেড়ে নাড়তে থাকি, নাড়তে নাড়তে ভাবি রসুনি আজ পঁচিশ বছর ধরে রান্না করছে, রান্না করতে অভ্যস্ত সে, রীতিমতো অভিজ্ঞ, আর আমি এ কাজে মাত্র দেড়মাস, আমার রান্না সুস্বাদু হওয়ার কোনও কারণ নেই, রসুনির কাছ থেকেই শিখেছি যা শেখার, রসুনির চেয়ে আমি অনেক কাঁচা, রান্নায় অনভিজ্ঞ, ওর হাতের রান্নার চেয়ে আমার হাতের রান্না সুস্বাদু হওয়ার কোনও কারণ নেই, তবু বাড়ির সকলের দেখি আমার হাতের রান্না খাবার জন্য জিভ পেতে বসে থাকে। কেন—রসুনির চেয়ে আমার হাত ফর্সা বলে, রসুনির হাতে কাচের চুড়ি, আমার হাতে সোনার বলে? নাকি রসুনির হাতে বই খাতা ওঠেনি, আমার হাতে উঠেছে বলে! রসুনির হাত বড় বড় পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব লেখেনি, আমার হাত লিখেছে বলে এই হাতের একটি আলাদা স্বাদ আছে!

হারুন আপিস থেকে ফিরে এসে ঠিক অন্যদিনের মতোই আচরণ করে, তার আচরণে কোনও চিহ্ন নেই যে সে আমার বমি হওয়া আর মাথা ঘোরার কোনও ঘটনার কথা জানে। খেতে বসে দিব্যি সে গল্প করল এক কোরিয়ান লোক তার আপিসে ঢুকে না জানে ইংরেজি, না জানে বাংলা, কোরিয়ান ভাষায় এক ঘণ্টা অবদি বকে গেছে, এসব। হারুনের মনে হয়েছে কোরিয়ান ভাষাটি কোনও ভাষা নয়। আনিসকে নিয়ে কাল সে কোরিয়ান লোকটির কাছে যাবে বলল। বলল, একজন দোভাষীর ব্যবস্থা কালই করবে। এসব। খেয়ে দেয়ে হারুন টেলিভিশনে নাটক দেখল, মমতাজউদ্দিন আহমেদের নাটক। মমতাজউদ্দিন নিজে অভিনয় করেছে এক আত্মভোলা শিক্ষকের, দেখে হারুন বেশ কবার সশব্দে হেসেছে। আমি সোফায় বসে নাটকের চেয়ে বেশি দেখেছি হারুনকে। নাটক শেষ হবার আগেই মাথা ঘোরার কারণে আমাকে শোবার ঘরে চলে আসতে হয়। হারুন শুতে

এসে একবারও জিজ্ঞেস করে না কেন আমি নাটক পুরো না দেখে চলে এসেছি, বরং মমতাজউদ্দিনের চমৎকার অভিনয়ের কথা সে হাতে তুড়ি বাজিয়ে বলতে শুরু করে। আমি বলি, মাথা ঘোরার কারণে চলে আসতে হল আমাকে। নিজে থেকেই বলি, প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করে কোনও লাভ নেই জেনে।

—ও তাই বুঝি, আমি তো ভাবলাম আবার কী না কী! হারুন বলে।

মাথা ঘোরালে তো নাটক দেখার প্রশ্নই ওঠে না, উঠে আসতেই হয়। এ এমন কোনও অন্যায় কাজ আমি করিনি। যদি হারুন এবং তার পরিবারের লোকজনকে আমার পছন্দ না হত, নাটক দেখতে গিয়ে তাদের সুখ এবং শোক প্রকাশের ধরন আমার ভাল না লাগত আর সে কারণে যদি নাটক ত্যাগ করতাম, তবে না হয় হারুনের রাগ করার অবকাশ থাকত এবং প্রশ্ন করার কারণ থাকত। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। গোপনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলি যখন সে আমার শাড়ি খুলে নেয়, তার যেমন করে ইচ্ছে করে সম্ভোগ সারে, অন্যদিনের মতো। সেরে একটি সিগারেট ধরায়, অন্যদিনের মতোই, ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সারাদিনের ক্লান্তি কী রকম চলে গেল দেখেছ! শরীরে এখন অদ্ভুত এক প্রশান্তি। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়, হারুন আমাকে ভালবেসে আমার শরীরের গভীর জলে সাঁতার কাটেনি, সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে সে আমাকে ব্যবহার করেছে।

ঘরের লাগোয়া স্নানঘর থেকে হারুনের সাঁতার কাটা ঘোলা জল ধুয়ে এসে দেখি তার সিগারেট ফোঁকা শেষ। আমার দিকে পিঠ করে শোয়া। পাশে শুয়ে বলি, একটি হাত তার গায়ের ওপর রেখে, কণ্ঠে লজ্জা মেশানো আমার, জানো এই বমি হওয়া আর মাথা ঘোরানো ব্যাপারটি কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে। উত্তরে হারুনের নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

২

সকালে হারুন যখন দাঁত মাজছিল, তখনই তার সামনে ওই স্নানঘরেই আমার বমি হয়। হারুন দাঁত মাজা ফেলে রেখে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে রাখে এক হাতে, আরেক হাতে মগ ভরে জল দেয়। বমি শেষে তার কাঁধে মাথা রাখি, দুচোখ বুজে আসে আমার অবসাদে। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলাসে করে জল নিয়ে আসে, সঙ্গে দুটো প্যারাসিটামল আর একটি মটিলন এগিয়ে দিয়ে তাড়া দেয়, খেয়ে নাও তো।

—এসব খেলে বমি বন্ধ হবে?

—নিশ্চয়ই হবে।

ওষুধগুলো খেয়ে আমি শুয়ে থাকি। চোখ বুজে নয়, চোখ খুলে, হারুনের স্নান করার শব্দ শুনি, হারুনের তোয়ালে পেঁচিয়ে ঘরে ঢোকা দেখি, আপিসের শার্ট প্যান্ট পরা দেখি, টাই বাঁধা দেখি, গায়ে সুগন্ধী লাগানো দেখি। যখন জুতো পরছে, বলি, আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে।

—অন্যরকম কী রকম?

—মনে হচ্ছে বাচ্চা টাচ্চা।

—আরে ধুর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি হারুনের ব্যস্ত মুখে। আজ সে দ্রুত আপিসে যাচ্ছে, দুপুরের খাবার নেবে না, আজ দুপুরে আপিসের এক সহকর্মী কস্তুরিতে তাকে খাওয়াবে। আমি দরজা অবদি হারুনের পেছন পেছন যাই, সে অদৃশ্য হলে দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুই আবার। ভাবি, হারুন কি কোথাও কারও কাছে শোনেনি যে বাচ্চা পেটে এলে মাথা ঘোরা বমি বমি হয়। বয়স তার বত্রিশ, বত্রিশ বছর বয়সে এসব উপসর্গের কারণ জানবে না, এ কেমন কথা! হারুনকে কখনও আমার এত বুদ্ধিহীন মনে হয়নি। বুদ্ধি করেই সে এগিয়েছিল আমাকে পেতে। তা না হলে শিল্পকলা একাডেমিতে গানের অনুষ্ঠানে যে ছেলেকে এক পলকের দেখা দেখেছি, ভুলে যাবারই কথা, এরকম কত ছেলেকেই তো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, রাস্তা ঘাটে রেস্তোরাঁয় দেখি, কিন্তু মনে তাকে করাতে বাধ্য করেছিল। বাড়িতে হঠাৎ এক সন্ধেবেলায় ফোন পেয়ে চমকে উঠেছিলাম, চিনতে পারছেন?

—না তো!

—আমার সঙ্গে একদিন কিন্তু আপনি কথা বলেছেন।

—তা বলতে পারি। অনেক অপরিচিতের সঙ্গে আমার হাটে বাজারে কথা হয়। নাম কি বলুন।

আমি রুষ্ট স্বরেই বলি। মাঝে মাঝে উটকো লোকের টেলিফোন যে আমাকে বিরক্ত করে না তা নয়।

—নাম বলে কি লাভ বলুন। কয়েক হাজার হারুন আছে দেশে। অন্তত দশজন হারুনকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন।

দশজন হারুনকে আমি চিনি কি না ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, আমার এক দূরসম্পর্কের কাকাতো ভাই আছে, হারুন। এ পর্যন্তই। কণ্ঠস্বরটি ভারী, চিনতে পারছি না বলার পরও ওপাশ থেকে ফোন ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখিনি, যতক্ষণ না মনে পড়েছে শিল্পকলার মাঠে গানের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আমরা মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, যেখানে একটি ছেলে, অসম্ভব সুন্দর দুটো চোখ—কথা বলা চোখ, পরনে ধোপদুরস্ত জামা কাপড়, গানের অনুষ্ঠানে এলে ছেলেরা যেমন পাজামা পাঞ্জাবি আর চপ্পল পরে, কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে মুখে কবি কবি ভাব নিয়ে হেঁটে বেড়ায়, তেমন নয়, যেন মন্ত্রণালয় থেকে সোজা অনুষ্ঠানে এসেছে, ফিরে গিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রীকে খবর দেবে গান কেমন হল, দূরে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে লক্ষ করছিল, আরজুর পীড়াপিড়িতে আমি যখন গান ধরেছিলাম, আমাকে। একসময় আমাদের আসরে নাক মাথা গলিয়ে দিয়ে আরও শুনতে চাইছিল গান। আমার সঙ্গে সুভাষ, আরজু, চন্দনা আর নাদিরা ছিল। ওরা হই হই করে উঠল, আরও শুনতে। আমি হেসে বলেছিলাম, আপনি কে মশাই, উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, আবার গানও শুনতে চাইছেন। ছেলেটি, আসলে ছেলেটি না বলে লোকটি বলাই ভাল, হেসেছিল, চমৎকার সে হাসি। মাঠের আসর ভেঙে আমরা

যখন ঢুকে গেলাম ভেতরে মূল অনুষ্ঠানে, লোকটি আমাদের খুব একটা দূরে বসেনি, তাকাচ্ছিল আমার দিকে বারবারই। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে সন্ধে পেরিয়ে যায়। বেরিয়ে আসতে আসতে পেছন থেকে লোকটি বলছিল, যারা গাইল, তাদের সবার চেয়ে কিন্তু ভাল গান আপনি। শুনে চন্দনা আমার পেটে কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলেছিল, কী রে গাধাটা এমন পিছু লেগেছে কেন তোর! গাধার পিছু লাগাতে একটি কাজ হয়েছিল ভাল, আমি আর সুভাষ যখন রিকশা পেতে পেতে হেঁটে হেঁটে কাকরাইলের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, একটি শাদা টয়োটার গতি শ্লথ হল আমাদের পায়ের কাছে। যাবেন কোথায়, চলুন পৌঁছে দিচ্ছি। না, আমরা রিকশা পেয়ে যাব। পাবেন না, আজ রিকশা সব স্টেডিয়ামে, ফুলবল খেলা শেষ হল মাত্র। আমরা বহুদূরে যাব, পুরনো ঢাকায় বলে আমি কাটাতে চেয়েছিলাম হারুনকে। আরে আমিও তো পুরনো ঢাকাতেই যাচ্ছি, ওদিকেই থাকি। আমার তবুও গাড়িতে উঠতে দ্বিধা ছিল, সুভাষই আমাকে টেনে ওঠালো। ওয়ারিতে আমাদের পৌঁছে দিয়ে হারুন চলে গেল। গাড়িতে বসে যা কথা হয়েছিল তার, হয়েছিল সুভাষের সঙ্গেই, ঢাকা শহরে মশার উৎপাত, পুরনো ঢাকায় যানজট ইত্যাদি। আমাকে নামিয়ে দেবার সময় অবশ্য বলেছিল, আপনার গান কিন্তু আরও শুনতে চাই। কোথায় কখন সে আমার গান শুনবে তা পরিষ্কার করে বলেনি। ওটুকু পরিচয়ে কেউ কারও বাড়িতে ফোন করে বসে আমার জানা ছিল না। বাড়ির ঠিকানা পেলে ফোন নম্বর পেতেও দেরি হয় না। আমি জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করিনি কোত্থেকে এবং কেন আমার ফোন নম্বর জোগাড় করেছে।

প্রথম দিন ফোনে আমি ব্যস্ত আছি কথা বলার সময় নেই ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরদিনও সে ফোন করে, তার পরদিনও।

—কী ব্যাপার বলুন তো!

—বিরক্ত হচ্ছেন?

বিরক্ত আসলে আমি হচ্ছিলাম না। কিন্তু আমার খুব স্বস্তিও হচ্ছিল না। জানা নেই, শোনা নেই, তার সঙ্গে ভাল আছি, কেমন আছেন ইত্যাদির বাইরে খুব একটা কথা এগোতে চায় না, যদিও হারুন কথা এগোনোর জন্য নিজের জীবনের যত গল্প আছে, করতে থাকে। শুনতে শুনতে একসময় আমার জানা হয় হারুন ইঞ্জিনিয়ার, নিজে সে একটি ব্যবসা শুরু করেছে, জেনারেটর তৈরির কারখানা তার সাভারে, মতিঝিলে আপিস। ধানমণ্ডিতে বাড়ি, বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন নিয়ে রীতিমতো সুখের সংসার তার।

—আমার কিন্তু একটা গান পাওনা আছে?

—কেন?

—ওই যে আপনাদের গাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

—গাড়ি ভাড়া আদায় করছেন নাকি?

হারুন ওপাশে ঠা ঠা শব্দে হাসল।

পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটি আপনার উৎসাহেই হয়েছিল, মনে আছে? আমি এও বলেছিলাম, কাউকে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করলে তা নিঃস্বার্থভাবেই করা

উচিত।

এতেও গান শোনার আগ্রহ হারুনের কমেনি। প্রায়ই সে ফোন করে শাদামাটা কথা বলার পর বলত গান শোনান। গান তাকে শোনাতেই হত, আমি যে একা গাই, নিভৃতে কেবল আমার জগৎটিতে, তা হারুন মানল না। প্রায় জোর করে আমাকে গাওয়াত, কথার জোরে, আমিও অনেকটা বাঁধা পড়তাম তার ভারী কণ্ঠের আকুলতার কাছে অথবা আমার কিছুটা কৌতূহলের কাছেই। ভাবতাম দেখি না কি হয়, এই কথোপকথন শেষ অবদি কোথায় কতদূর যায়। এরপর নিজেই সে বলত এটা গান ওটা গান, আমি কান পেতে রই, ফাগুন হাওয়ায়, দূরে কোথায় দূরে দূরে। একদিন বলল আমার মন মানে না। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ মনে কী দুর্ঘটনা ঘটল? হারুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, সে আপনার মতো নিষ্ঠুর লোক বুঝবে না। শেষে দু লাইন গাইলাম। বলল, কেমন ঝড় উঠেছে দেখেছেন, ওই গানটা করুন তো, আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। গাইলাম কিন্তু এও প্রশ্ন করলাম, আমি কি আপনার ভাড়া করা গায়িকা যে গেয়ে প্রভুর মন এবং মান রক্ষা করব? এরপর হারুনকেও গাইতে হত। গাইতে সে অত পারত না, কিন্তু চেষ্টা করত। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, দীর্ঘক্ষণ আমার গান শুনত সে, কোনও কোনও দিন পাঁচ-ছ ঘণ্টা ফোন নিয়ে বসে থাকত, আমি একটির পর একটি গেয়ে যাচ্ছি, আর মুগ্ধ শ্রোতা হারুন শুনতে শুনতে বাহ বাহ করেছে, বলেছে আপনার গলায় যাদু আছে, সত্যি বলছি। অবাক ব্যাপার এইজন্য যে হারুন এখন গান শোনে না, বিয়ের পর একদিনও আমাকে বলেনি গান গাও। গুন গুন করে যাই গাই ঘরে, কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায় সে যেন আমি যে গান গাইতে জানি এ খবরটি তার জানা ছিল না। চোখে তার কিছু শাসনও থাকে যেন আমার কণ্ঠস্বরটি পাশের অভিভাবকের ঘরে গিয়ে আবার কোনও বিপদ না ঘটায়।

পরিচয়ের তিনমাস আমরা গান নিয়েই কাটিয়েছিলাম। দুটো গান আমি খুব বেশি গাইতাম, তবু মনে রেখো আর হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল। হৃদয় বাসনা কি কারও কখনও পূর্ণ হয়? হয় না জানি, তবু গাইতে ভাল লাগে। গাইলে মন কী যেন কী পাওয়ায় ভরে ওঠে। হারুনের সঙ্গে আমার একান্ত সময়গুলোয় কী এক পাওয়ায় ভরে থাকত মন। কী এমন পাওয়া, আসলেই কি কোনও পাওয়া, নাকি মিছিমিছি, পাওয়া নয় তবু পাওয়া বলে ভাবা, পাওয়ার মতো মনে হওয়া, না পাওয়ার দুঃখকে কিছু পাওয়া ভেবে মনে মনে সুখ পাওয়া! ফোনে কথা বলতে বলতে একদিন হঠাৎ হারুন বলল, এভাবে আর ভাল লাগে না।

—মানে?

—মুখোমুখি বসতে চাই।

—তাতে কী হবে?

—আর কিছু না হোক, মন ভরবে।

—তা হলে মন কী ভরছে না এখন? এত কথায়? এত গানে?

—না। চোখে চোখ রেখে কথা না বললে মনে হয় কী যেন সব বাকি রয়ে গেল।

এরপর আমাদের একদিন দেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। আমাকে চত্বর থেকেই শাদা টয়োটায় তুলে নিয়ে গেল সে আপিসে। আপিসটি বেশ গোছানো। হারুন যে ঘরে বসে, সে ঘরটিতে ঢুকে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল টেবিলের ফুলদানিতে তাজা গোলাপ দেখে। ফুলগুলোর কিছু আমার চুলে গুঁজে, কিছু আমার কোলে ছড়িয়ে বলেছিল, তোমাকেই মানায় এসব। ফুলের জলসায় নীরব হয়ে বসেছিলাম। ভাল লাগছিল হারুনের উত্তেজনা দেখে, খানিক পর পর পিওন ডাকছে খাবার আনতে, কী খাব আমি, চা নাকি সেভেন আপ, চিকেন বান, পিৎজা, ক্লাব স্যান্ডুইচ? খাবারে আমার মন ছিল না। আমি হারুনকে দেখছিলাম, তার সেই অসম্ভব সুন্দর চোখ দুটি, চোখে একটু একটু মুগ্ধতা এসে বসছিল আমার।

—চোখে চোখ রেখে কথা বলার কথা ছিল। এখনও সে কাজটিই কিন্তু হয়নি।

হারুন ঠোঁটের কোণ কামড়ে হেসে উঠল, হাসিটি আমাকে গভীর স্পর্শ করেছিল। করেছিলই তো, তা না হলে অতদূর যাই সাধ করে!

এখন হারুনের নানান রকম ব্যস্ততা। তখন অবশ্য আপিস কামাই করে চলে আসত কার্জন হলে, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। ক্লাস শেষে বেরিয়ে দেখতাম সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়, মুখে স্মিত হাসি, চোখ রোদচশমায় ঢাকা বলে চোখের হাসিটুকু দেখা যেত না, কী যে ভাল লাগত আমার, ইচ্ছে হত ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে দেখুক আমার জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একজন। আমি কেবল ভাল ছাত্রী, ভাল নেত্রীই নই, ভাল প্রেমিকাও বটে। কেবল ক্লাসের সামনে থেকে আমাকে নিয়ে উধাও হয়ে যেত হারুন তা নয়, দেয়ালে দলের পোস্টার সাঁটছি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি লাইব্রেরির মাঠে, ক্যানটিনে বসে চা খাচ্ছি, হারুন এসে উপস্থিত। সবকিছুর মধ্য থেকে আমাকে আলগোছে তুলে নিয়ে যেত। গাড়িতে আমাকে পাশে বসিয়ে সিগারেট ধরাত, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে কথা বলত, বেশ লাগত। হারুন যখন আমার হাতের ওপর হাত রাখত, আমার হাতটিকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগত, হাত স্পর্শ করে হারুনের নিশ্চয়ই ভাল লাগছে, আমি হারুন হয়ে আমাকে অনুভব করতাম। প্রায়ই দূরে কোথাও চলে যেতাম, নির্জন সবুজের প্রতি হারুনের পক্ষপাত ছিল, আমারও। দূরে কোথাও, দূরে দূরে ভেসে বেড়াতাম। বুড়িগঙ্গা সেতু পেরিয়ে প্রায়ই ধলেশ্বরী নদীর পারে বসে থাকতাম। ওখানে বসেই হারুন একদিন বলেছিল, তোমার সঙ্গে এ কিন্তু আমার প্রথম প্রেম নয়।

আমার সঙ্গে প্রথম প্রেম নয়, আর কারও সঙ্গে হারুন ঘন হয়ে এরকম বসেছিল, এখানেই, এই নদীর ধারেই, ঠিক এভাবে আর কারও হাত সে স্পর্শ করেছিল, ঠিক যেভাবে আমার চোখে চেয়ে সে বলে ভালবাসি, এরকম আর কারও চোখে চেয়েও সে একই কথা বলেছিল। বুকের মধ্যে সুতোর মতো একটি কষ্ট ঝুলতে থাকে। ভেবেছিলাম আমিই তার প্রথম, কিন্তু নই। প্রথম হলে সব এত মধুর লাগে কেন বুঝি না। ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিলাম, অহংকার এসে আমার গ্রীবায় বসেছিল, আমার কিন্তু প্রথম।

দূরে ডিঙি নৌকোর দিকে তাকিয়ে, ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে, ঝাপসা হয়ে

আসছিল যখন দুচোখ, জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর হঠাৎ করে আমাদের দুজনের মাঝখানে এক নীল স্তব্ধতাকে ভেঙে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওকে নিয়ে কী এখানেও বসতে?

—অনেক।

—ও দেখতে বুঝি খুব সুন্দরী ছিল?

—ছিল।

আমি চুপ হয়ে যাই। ভেতরের সুতো-কষ্টটি দলা পাকাতে থাকে।

—ওকে খুব ভালবাসতে বুঝি?

—বাসতাম।

—আমাকে যত ভালবাস, তার চেয়ে বেশি?

হারুন হাসতে হাসতে আমার হাতটি তার উষ্ণ হাতে নেয়, আলতো চাপ দিয়ে বলে, এই তুমি কি রাগ করছ নাকি, বোকা মেয়ে। সে তো পুরনো সম্পর্কের কথা বলছি। মেয়েটিকে আমি ভালবাসতাম, এখন আর বাসি না। এখন তোমাকে বাসি। তা ঠিক, হারুন যুক্তিহীন কিছু বলছে না। আমারও কারও সঙ্গে প্রেম হতে পারত, তারপর সে প্রেম ভেঙেও যেতে পারত, তারপর নতুন কারুকে দেখে মনে হতে পারত, এ ঠিক তেমন, যেমন আমি চাই। শিপ্রার আগে এক প্রেমিক ছিল, সে প্রেমিকটির সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল দুবছর, সে ছেলে মদ খেত বলে শিপ্রা সম্পর্কটিকে আর বহন করতে পারেনি, তারপর তো দীপুর সঙ্গে প্রেম করে ওকে দিব্যি বিয়েই করে বসল। এমন যে হয় না, হয়।

—ওকে খুব মনে পড়ছে বুঝি?

হারুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, নাহ।

—মনে পড়ছে না, বল কী? ওকে মনে করে কষ্ট হয় না? ওকে না পাওয়ার কষ্ট!

হারুন হেসে বলল, মোটেও না।

হারুনের চোখে চেয়ে সত্য লুকোচ্ছে কি না পরখ করছিলাম। আমার চোখে এক থোকা ঈর্ষা কাঁপছিল।

—কাউকে ভালবাসলে কি কখনও ভুলে থাকা যায়? আমি জিজ্ঞেস করি।

—যাবে না কেন? খুব যায়।

—তা হলে একদিন আমাকেও ভুলে যাবে। আমাকেও তোমার মনে পড়বে না।

—তুমি আর ওই মেয়ে কি এক হল?

—না হওয়ার কী আছে? ও মেয়ে, আমিও মেয়ে। দুজনকেই ভালবেসেছো তুমি।

—তোমার সঙ্গে ওর তুলনা চলে না।

—কেন?

—ও খুব খারাপ মেয়ে ছিল?

—খারাপ কেন?

—ও তুমি বুঝবে না।

জানি না তখন আমার কিছু ভাল লেগেছিল কি না এই ভেবে যে ওই মেয়েটি খারাপ আর আমি নিশ্চয়ই ভাল। আসলে এখন বুঝি কেউ খানিকটা প্রশংসা করলে এত আহ্লাদিত হওয়া উচিত নয়। যে মানুষ তার পুরনো প্রেমিকাকে এক বাক্যে খারাপ বলে, সে তার নতুন প্রেমিকাকেও সুযোগ ও সুবিধে মতো খারাপ বলতে পারে। অসম্ভব কি! আমি পরে হারুনকে বলেছিলাম, লিপি সম্পর্কে তোমার ওই মন্তব্য বড় অশোভন ছিল।

হারুন উত্তর দিয়েছিল, তুমিই বল, যে মেয়ে গান ভালবাসে না, কেবল জমিজমা বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সার গল্প করে সময় পার করে, তাকে কি আমি বিয়ে করতে পারি?

—বিয়ে না কর, সে প্রশ্ন আসছে না। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের রুচির পার্থক্য থাকতেই পারে, তার মানে কিন্তু এই নয় যে তোমার সঙ্গে রুচিতে যার মেলে না, সে খারাপ। জেনারেটর ব্যবসা আমার রুচির সঙ্গে মেলে না, তাই বলে কি আমি বলব তুমি খারাপ!

হারুন এর পর আর কথা বলেনি। আমি বুঝতে পারিনি সে সামান্যও অনুতপ্ত কি না। সম্ভবত মনে মনে বলছিল, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি কিন্তু মনে নিচ্ছি না, মনে নেওয়া আর মেনে নেওয়া দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস কি না।

ধলেশ্বরীর তীর থেকে উঠে সন্ধের দিকে আমাকে তার আপিসের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। আপিসের আর সবাই তখন বাড়ি চলে গেছে। চারদিকের সুনসান নীরবতা দুহাতে সরিয়ে সরিয়ে যখন ঢুকছিল ঘরটিতে, একটু ভয় ভয় করছিল আমার, মুহূর্তে আবার ভয় ডর সব ভেসে গিয়েছিল ভালবাসার ঝড়ে। হারুন সেদিন আমাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল। আলতো চুমু নয়, রীতিমতো তেঁতুল চোষার মতো ঠোঁটজোড়া চুষে খাওয়া। এক চুমুতেই ঠোঁট আমার ফুলে ঢোল হয়ে রইল, যেন বোলতার কামড় খেয়েছি। ফুলে ওঠা ঠোঁট দেখে হারুনের সে কি কোমর ভাঙা হাঁটু ভাঙা হাসি। হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না।

আমি ঠোঁট ঢেকে রেখেছিলাম দুহাতে। আমার দুহাত সরিয়ে বারবারই সে দেখছিল ফোলা ঠোঁট।

—কী এত দেখার আছে।

—চুমু খেলেই এমন ফুলে ওঠে ঠোঁট তোমার! এত কচি ঠোঁট। কেউ ছোঁয়নি আগে এ ঠোঁট। আমার আগে কেউ চুমু খায়নি তোমার ঠোঁটে!

হারুনের চোখে চিকচিক করছিল আনন্দ। সে ছাড়া অন্য কেউ আমার ঠোঁটে চুমু না খাওয়ার আনন্দ। সে রাতে ফোলা ঠোঁট নিয়ে বাড়িতে বিপাকেই পড়েছিলাম। রাতের খাবার খেতে ডাকলে অন্ধকারে বিছানা থেকে মাকে বলে দিলাম বাইরে খেয়ে এসেছি, ফোলা ঠোঁট নিয়ে জানি হাজার প্রশ্নের সামনে পড়তে হত। ঝামেলা যত এড়ানো যায় তত মঙ্গল। রাত যত বাড়ে খিদে তত বাড়ে আমার। খিদেয় সারারাত ছটফট করেছি, ঘুমই হয়নি। পরদিন সকালে হারুনের ফোন পেয়ে চলে গেলাম তার মতিঝিলের আপিসে, দুজনে দুপুরে সুপারস্টারে

খেলাম। সারাদিন হারুন আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। আমাকে আগে কেউ চুমু খায়নি বলে তখনও আনন্দ কমেনি তার। আমাকে বুকের মধ্যে প্রায় আঁকড়ে ধরে রাখল, যেন ছুটে না যাই, একটি অনাঘ্রাতা নারীকে সে হাতের মুঠো পেয়েছে, এ নারীকে তার পেতেই হবে। এ হরিণী তার, তার ভেতরের বাঘটি এই হরিণীকে এখন তারিয়ে তারিয়ে খাবে। হারুনকে আর দশটি ছেলের চেয়ে তখন আমার আলাদা মনে হয়নি। মনে হয়নি হারুন আমাকে যে কোনও শর্তে ভালবাসতে পারে। ধলেশ্বরীর তীরে বসে সে লিপি, লুনা, লিসা, লিমার সঙ্গে প্রেম করতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে হলে একটি কাঁচা ও কচি মেয়ে ছাড়া চলবে না। হারুন বিয়ের কথা তুলল, আমাকে সে বিয়ে করতে চায়।

আমার রাজি না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না।

এরপর থেকে আমাদের প্রতিদিনই দেখা হচ্ছিল। গুলশানে তার এক বন্ধু শফিকের বাড়ি আমাকে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা নিয়ে যেতে শুরু করল হারুন, রাস্তা ঘাটে নদীর ধারে ক্যাফে রেস্তোরাঁয় সময় কাটানো আর কত যায়, মানুষের হাঁ করা চোখের আড়াল হতে চাইতাম আমরা। চা বিস্কুট খেতে খেতে শফিকের সঙ্গে গল্প হত। শফিক মুহূর্তের জন্য অন্য ঘরে গেলেই হারুন দ্রুত আমাকে চুমু খেয়ে নিত। আমার বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতেই বেশি যেতাম হারুনকে নিয়ে, সুভাষের, আরজুর, কখনও চন্দনা আর নাদিরার বাড়িতে, শিপ্রার বাড়িতেও। ওদের কাউকে কাউকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতাম—মধুপুর জঙ্গল, শালবন বিহার, স্মৃতিসৌধ, সাভারের ওপর দিয়ে কোথাও গেলে হারুন তার কারখানা ঘুরে আসত। কখনও সে ধানমণ্ডিতে তার নিজের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেত না, বলত, তার বাবা মা ভাই বোনকে আগে থেকে আমাকে দেখিয়ে পুরনো করতে চায় না, বউ করেই ঘরে তুলবে সে, চমকে দেবে বাড়ির সবাইকে। বন্ধুদের বাড়িতে ঘন ঘন আর কত যাওয়া যায়, ওরা তো কেউ নিজেদের আলাদা বাড়িতে থাকে না, এক শিপ্রা ছাড়া সবাই থাকে বাপের বাড়িতে। সুতরাং জায়গার অভাবে অগত্যা একসময় ওয়ারিতেই আশ্রয় খুঁজতে হল। হারুন নির্জনতা চাইত, তাকে নির্জনতা দেওয়া সম্ভব হত না আমার পক্ষে। আমার বাবা মা বসতেন এসে, কখনও নূপুর এসে বসত আমরা যখন কথা বলতাম, নূপুরের বাচ্চাটি ঠ্যাং বেয়ে কাদা পায়ে হারুনের কোলের দিকে উঠত। বাড়ির নেড়ি কুকুরটি হারুনকে দেখে ক্রমাগত কুঁ কুঁ করে গাল দিত, উঠোনের হাঁস-মুরগি ঘরময় আপন মনে হেঁটে আর হেগে বেড়াত, মা-মুরগি পেছনে তার পিলপিল বাচ্চাসেনাদের নিয়ে ঘরের আসবাব দিব্যি দখল করে নিত। হারুন বসে বসে এসব দৃশ্য দেখত আর আমার দিকে অসহায় তাকাত।

প্রায়ই সে বলত, একেবারে নীরস গল্প করা ভাল লাগে বুঝি!

—রসালো গল্প কী রকম শুনি?

—এই চুমু টুমু। একটু আদর। একটু বুকে হাত।

হারুনের এসব কথায় আমি আমূল কেঁপে উঠতাম। তখন বয়সই আমার কেঁপে উঠবার। তখন বয়সই আমার হারুনের আদ্যোপান্ত ভাল লাগার। তার সামান্য

ছোঁয়া পেলেই আমি ভাল লাগায় তিরতির কাঁপতাম। ডান হাতে স্টিয়ারিং আর বাঁ হাতে আমার হাতখানা সে ধরে রাখত, যখন গাড়ি চালাত। গিয়ার পালটাবার সময়ও হাত সরাত না, ডান হাতেই গিয়ার পালটে আবার স্টিয়ারিং-এ হাত দিত। সেই হারুন, সেই হারুনের জন্য আমার এখন হৃদয় জেগে ওঠে, শরীরও। আরও আরও দীর্ঘদিন যদি তার ওই সামান্য স্পর্শ পেতাম! ওই হাত ধরে থাকা। এখন এই যে প্রতিদিন হারুন আমাকে গভীর স্পর্শ করে, আমার অতলে তলিয়ে যায় প্রায় রাতে, তবু মনে হয়, ওই সামান্য স্পর্শের স্বাদের কাছে এ কিছুই নয়। ওটুকুই ভাল ছিল, সামান্যটুকুই।

আমাদের বিয়ে অনেকটা হঠাৎ করেই হয়, যদিও বিয়ের বয়স আমারও হয়েছিল, হারুনেরও, এবং আমি যে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করছি না, এরকম কথা হয়েই ছিল, তবু একটি ঘটনা আমাদের বিয়েকে তরান্বিত করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের পরীক্ষা মাত্র শেষ করে অকেজো বসে আছি, ঠিক অকেজো নয়, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা ঠিকই চলছিল, শহর চষে বেড়ানো ছিলই, ছাত্র রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকা ছিলই, কেবল ক্লাস করার ঝামেলা চুকেছিল। আমার রাজনীতি করা নিয়ে মাঝে মাঝে হারুন হাসত, বলত, ছাত্র ইউনিয়ন করে কোনও লাভ আছে?

—কী লাভের কথা বলছ?

—এ দল তো কখনই জিতবে না।

—না জিতুক, তবু আদর্শ বলে কথা। ধর শিবিরের খুব জনপ্রিয়তা, নির্বাচনে জিতেই যাবে, তবে কি শিবিরে নাম লেখাব?

হারুন চোখ টিপে বলেছিল—আসলে মেয়েদের ছাত্র ইউনিয়ন করাই মানায়।

—কেন বলছ?

—গান বাজনা...

—গান বাজনা বুঝি ছেলেরা করে না? তুমি নিজেই তো গান ভালবাস।

হারুন কথা বাড়ায়নি।

নির্জনতা না জুটুক, তবু আমাদের ওয়ারির বাড়িতে হারুনকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, ওর সঙ্গে বাইরে বেরোনো, রাত করে ফেরা এসব দেখে একদিন বাবা আমাকে ডাকলেন, যতটা ধারাল করা যায় স্বর, করে বললেন হারুনকে বিয়ে কর নয়তো ওর সঙ্গে এরকম মেলামেশা বন্ধ কর। আমি শুনে অবাক হয়েছিলাম। আমাকে আরও অবাক করে বাবা বলেছিলেন, আমি কিন্তু আর দেখতে চাই না ও ছেলে এ বাড়িতে শখের গল্প মারতে আসুক।

আমি বলেছিলাম, যখন বিয়ে করার তখন করব।

বাবা ধমকে বললেন, যখন কখন?

—আর ছ মাস পর।

—ছ মাস পর আর এখনে পার্থক্যটা কী? ছ মাস পর করতে পারলে এখন করতে পারবে না কেন?

বাবার সঙ্গে আমার আর তর্ক করার ইচ্ছে হয়নি। মাও বলেছিলেন খামোকা

কথা বাড়াসনে, বেশি উত্তেজিত হলে কী হয় কে জানে। মাও বাবার দিকটা ভেবেছিলেন, রক্তচাপ বেশি বাবার, বছর কয় আগে নূপুরের কারণে রক্তচাপ বেড়ে হৃদপিণ্ড বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল, অল্পতে বেঁচে গেছেন, এখন আমার কারণে আবার যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। দুর্ঘটনা ঘটুক আমিও চাইনি।

হারুনকে সেদিনই বললাম, আমাদের যদি বিয়ে করার কোনও সম্ভাবনা থেকে থাকে তবে সে খুব তাড়াতাড়িই ঘটে যাওয়া ভাল।

হারুন খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছিল আমার তাড়া দেখে। আমিই বরং ওর বিয়ের প্রস্তাবে বারবারই পরীক্ষা শেষ হোক, এ বছর না সামনের বছর বলে ওকে বাধা দিচ্ছিলাম। হারুন আমার দিন পেছোনোয় বলেছিল, ঠিক আছে ছ মাস পর বিয়ে করব। ছোট ভাই দুটোর একটু গতি করে, ছ মাস পর যেন না কোরো না। আমি তখন কোনও কথাই শুনব না।

আমি কথা দিয়েছিলাম ছ মাস পর আমি ঠিক লাল টুকটুক বউ সাজব।

—এই ছ মাস অবদি আবার আমার থেকে তোমার মন উঠে যাবে না তো!

আমি হেসে বলেছিলাম, কী মনে হয় তোমার?

হারুন বলেনি কী মনে হয় তার। তবে বলেছিল ছ মাস পর আমার কোনও আপত্তি সে শুনবে না। সোজা আমাকে উঠিয়ে তার ধানমণ্ডির বাড়ি নিয়ে যাবে। এত দেরি তার সহ্য হয় না। তার বন্ধুরা বাচ্চার বাপ হয়ে বসে আছে। আর সে কি না এখন পর্যন্ত...

—এত তাড়া দিচ্ছ কেন? হারুন বলল।

বাবার কথা বললাম যে এভাবে আমাদের মেলামেশা তিনি পছন্দ করছেন না।

—তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল।

—তিনি বুঝবেন না।

—বুঝবেন না কোনও কথা হল?

—হল।

সব কিছুর তো একটা আয়োজন লাগে, বিয়ে কি এমন হুট করে হয়?

—হওয়ালেই হয়।

—ঘটনা কী? তোমার বাবার এমন অস্থির হওয়ার?

—সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বল।

আমার বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে করেনি। সোজা কথা, বিয়ে করতে হলে এখনই, পারলে আজই।

—ছ মাস পর বিয়ে করার কথা ছিল।

—ছ মাস আমি অপেক্ষা করতে পারব না।

—কী করবে?

—জানি না।

আমি বিষণ্ন ছিলাম খুব। হারুনকেও আমার বিষণ্নতা অল্প অল্প গ্রাস করে নিল। হারুন দেরি করেনি, সাতদিনের মাথায় কাছের কিছু আত্মীয়স্বজন আর ঘনিষ্ঠ

বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে অনেকটা ঘরোয়াভাবেই বিয়ে ব্যাপারটি চুকিয়েছে।

বাবা কেন আমার বিয়ের জন্য ক্ষেপেছিলেন তা বেশ বুঝি। নূপুর প্রেমে পড়েছিল এক বিত্তবান যুবক আকরামের। আকরাম ঘরের ছেলের মতোই ছিল। যখন তখন বাড়িতে আসত, সারাদিন নূপুরের সঙ্গে গল্প করে কাটাত। বাড়ির সবাইকে বেশ আপন করে নিয়েছিল, মাকে মা বলে ডাকত, বাবাকেও বাবা। বাবা বলতেন আকরাম হচ্ছে আমার বড় ছেলে। নূপুরকে আকরাম আজ বিয়ে করে, কাল বিয়ে করে এমন। বিয়ের সময় কেমন সাজানো হবে বাড়ি, কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে, কী কী খাওয়ানো হবে, সে-সবের পরিকল্পনাও হয়ে গিয়েছিল। কেবল পোলাও মাংস নয়, আকরাম বলত মাছও হবে, বেগুন ভাজাও। বেগুন ভাজাটা আবার কেন? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আকরাম তার এক বন্ধু সঞ্জীবের বিয়েতে বেগুন ভাজা, রুই মাছ ভাজা খেয়ে এমনই আরাম পেয়েছিল যে তার বিয়েতেও যে একই ব্যবস্থা হবে, এবং এ যে হবেই সে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল। বেগুন ভাজা কেন নয়, পালটা প্রশ্ন করেছিল আকরাম আমাকে। আমি উত্তর না দিয়ে বলেছিলাম, টাকি মাছ ভর্তা কেন নয়? কেন চেপা শুটকি নয়? কেন চিংড়ি মাছের মালাইকারি নয়? কেন সরষে ইলিশ নয়? কেন ভাজা কই নয়? এগুলোই তো ভাতের সঙ্গে খেতে বেশি স্বাদ। আকরাম হেসেছিল আমার তালিকা শুনে, নূপুরও। হাসতে হাসতে নূপুর বলেছিল, বিয়ের দিন তোকে রান্নাঘরে বসিয়ে পান্তা ভাতের সঙ্গে চেপা শুটকি খাওয়াব, দেখিস। সেই আকরাম, পাঁচ বছর নূপুরের সঙ্গে প্রেম করেছে, কিন্তু বিয়ে করেনি। এই ঘটনায় বাবা এত আঘাত পেয়েছিলেন যে চোখের সামনে কারও মেলামেশা দেখলেই তাঁর সন্দেহ হয় এই বুঝি ছেলে কেটে পড়বে, হারুনকেও নিশ্চয়ই তাঁর মনে হয়েছে, আমার সঙ্গে বছর পাঁচ প্রেম করে আজ বিয়ে করে কাল বিয়ে করে—বিয়েতে বাড়ি কেমন সাজানো হবে, কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে, কি খাওয়ানো হবে ইত্যাদির পরিকল্পনা করে ধুম করে একদিন পালিয়ে যাবে আকরামের মতো।

আমাদের বাড়িতে বিত্তের বাড়াবাড়ি কখনই ছিল না। কিন্তু অভাবও কখনও এমন অবস্থায় পৌঁছয়নি যে আমাদের কোথাও যেন-তেন করে পার করে বাবা বাঁচতে চাইতেন। কলেজে শিক্ষকতা করে যা আয় করতেন তাতে সংসার মন্দ চলত না। নূপুর বিয়ে আর করবেই না বলে স্থির করেছিল, কিন্তু মাস কয় গেলে ও নিজের সন্ন্যাস থেকে বেরিয়ে এল। বাবা ওর জন্য দেখে শুনে এক পাত্র জোগাড় করলেন, ও না করেনি বিয়েতে। দুলাল, যার সঙ্গে নূপুরের বিয়ে হয়েছে, স্বভাব চরিত্র ভাল, ভাল চাকরি করে। নূপুর নিজেও সোনালি ব্যাঙ্কে হিসাবরক্ষক পদে ঢুকেছে। লেখাপড়া করেছে বাংলা সাহিত্যে, রক্ষা করতে হয় টাকা-পয়সার হিশেব। এই এক দুর্ভাগ্য দেশটির, কারও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে যথার্থ জায়গায় ব্যবহার করতে পারে না। নূপুর আর দুলাল বেশ ভালই আছে। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই দুজন মিলে শান্তিনিকেতন ঘুরে এসেছে। একটি দস্যি কন্যার জন্মও দিয়েছে। আমার জন্য পাঁচ-ছবার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, বাবা খোঁজ নিয়ে না করে

দিয়েছেন। সম্ভবত আরও ভাল পাত্র বাবা আশা করতেন। হঠাৎ যে অমন ক্ষেপে উঠে বলেছেন হারুনকে এক্ষুনি বিয়ে করতে অথবা হারুনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে, তা প্রেমিক পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই বলেছেন। বাবা হয়তো আমাকে হারুনের কাছে অপমানিত হতে দিতে চাননি, কিন্তু নিজে আমি অপমানিত হয়েছিলাম।

বাবাই আমাকে ও কথা বলে অপমান করেছিলেন। হারুনকে অবিশ্বাস তো তিনি করেছেনই, আমার মনে হয়েছে আমাকেও অবিশ্বাস করছেন তিনি। আমার রূপ ও গুণ একটি পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট নয় তাই তিনি মনে করেছিলেন নিশ্চয়ই। সেই অপমানবোধ আর নিজের ওপর গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি হারুনকে তাড়া দিয়ে বিয়ে ঘটিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে এতদিন আমি একটি দুশ্চরিত্র আর ফাঁকিবাজ কাউকে নিয়ে ঘুরিনি, একধরনের তৃপ্তি পেয়েছি।

বিয়ের পর এ বাড়িতে ওঠার পর জীবন হঠাৎ করে পালটে গেছে। প্রথম দিনই আমার মুখে হারুন শব্দটি উচ্চারিত হওয়ায় হারুনের বাবা-মা দুজনই আপত্তি করলেন, বললেন স্বামীর নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। যাকে যে নামে ডেকে অভ্যস্ত আমি সে নাম হঠাৎ করে যদি আর উচ্চারণ করা না যায়, বিষম বেকায়দায় পড়তে হয়। আমার অস্বস্তি দেখে হারুন বলল, ওঁরা পুরনো কালের মানুষ, ওঁরা যেমন চান, তেমনই কর, ওঁদের সামনে না হয় ডেকো না। ওঁদের সামনে হারুনকে না ডাকতে ডাকতে এখন আড়ালেও হারুন বলে না ডাকার অভ্যেস হয়ে গেছে আমার। বিয়ের এই দেড়মাস পর আমি লক্ষ করছি হারুনকে আমি এই শোনো, শুনছ, বলে ডাকি। আমার জিহ্বা ক্রমে আড়ষ্ট হয়ে আসছে। হারুন কিন্তু এতে কোনও আপত্তি করে না।

বিয়ের পর আমাদের দুজনের এলোমেলো ঘোরাঘুরি শহরে, দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া, বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দেওয়া, বলতে গেলে চুকেছে। ঘন ঘন যা বেরোনো হয়েছে, বিয়ের পর পর, হারুনের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া, মাথায় ঘোমটা দিয়ে হারুনের পেছন পেছন সে সব বাড়িতে ঢুকে বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম করা, পা ছোঁয়ার অভ্যেস আমার কোনও কালেই ছিল না। কিন্তু হারুন বলেছে বিয়ে কিন্তু জীবনকে পালটে দেয়। নতুন অনেক কিছুর অভ্যেস তোমাকে করতে হবে।

রাতে হারুন বাড়ি ফিরে এলে আবার বমি হওয়া আর মাথা ঘোরার প্রসঙ্গ টানি। তার দেওয়া ওষুধে যে কাজ হয়নি বলি।

কাজ না হওয়ার তো কোনও কথা নয়! হারুন প্যান্ট পালটে লুঙ্গি পরতে পরতে বলে।

—তোমার কী অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে না?

—অন্যরকম কী রকম?

হারুন আকাশ থেকে পড়ে। যদিও সকালে আমি বলেইছি অন্যরকমটি ঠিক কী

রকম।

—তোমাকে তো বলেইছি কী রকম মনে হচ্ছে আমার।

—কী রকম শুনি।

—মনে হয় বাচ্চা...

—তোমার মনে হলেই তো হবে না।

—তা হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল। ডাক্তার দেখে বলুক কী হয়েছে।

—এই সামান্য কারণে ডাক্তারের কাছে দৌড়োতে চাচ্ছ? তোমার সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি। বলে শব্দ করে হেঁটে যায় হারুন খাবার ঘরের দিকে, নিঃশব্দে রাতের খাবার খেয়ে ঠায় বসে থাকে টেলিভিশনের সামনে। আমি ঘরের জানালার পাশে একা, আকাশ থেকে অন্ধকার চুঁয়ে পড়ে, সেই দিগ্বিদিক ঘোর কালোর দিকে আরও ঘোর কালো চোখ মেলে চেয়ে থাকি আর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি একা একা।

৩

সকালে হারুন নাস্তা না খেয়ে আপিসে চলে গেল। টিফিন নিল না, রুপোর বাক্স পড়ে রইল রান্নাঘরে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, খাবে কী তা হলে? রা করেনি। হারুন চলে গেলে আমি বাড়ির সবার জন্য নাস্তা বানিয়ে, সবাইকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, হারুনের শার্ট প্যান্ট মোজা ইত্যাদি কী কী ধুতে হবে রসুনিকে দিয়ে, ঘরের আসবাবপত্র ঝেড়ে মুছে জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। একধরনের অবসর জীবন যাপন করছি এ বাড়িতে। বিয়ের পর থেকেই এই অবসর যাপন আমার চলছে। যদিও এখানে রান্নাবান্না কাপড়-ধোয়া, ঘর গোছানোর ব্যাপারগুলো দেখতে হয়, নিজের হাতে করতেও হয়, তবু এগুলোকে কখনও আমার সত্যিকার কাজ বলে মনে হয় না। এর জন্য রসুনি আছে, আর রসুনিকে সাহায্য করার জন্য শাশুড়ি আছে। আমি এসব কাজে জড়িত না হলেও সংসার ঠিক এভাবেই চলবে, আগে যেমন চলছিল। যে কাজগুলো আমি নিজে হাতে সারলে বাড়ির সবাই খুশি হয়, তা সেরেও, দেখি সময় থেকে যায় হাতে অনেক। এই সময় নিয়ে ঠিক বুঝে পাই না কী করব আমি বা কী করা উচিত। সময়গুলো আমার সারা গায়ে বিষপিঁপড়ের মতো কামড়াতে থাকে। ঘরে বসে থাকার মেয়ে কোনওকালেই ছিলাম না। ছোটবেলা থেকেই কেবল ছুটে বেড়িয়েছি। নূপুর ছিল চুপচাপ মেয়ে, কোথাও বসল তো বসলই, অত ধৈর্য আমার ভেতরে ধারণ করতে পারিনি। যখন ছোট ছিলাম, মা একবার আমাদের দু বোনকে নতুন ফ্রক পরিয়ে এক পীর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মার সঙ্গে বসে নূপুর পীরের বাণী শুনে গেল কয়েক ঘণ্টা ধরে, আর আমি বাগানের আম গাছের মগডালে উঠে কোঁচড় ভরে আম পেড়ে আনলাম। এ করেও থেমে থাকিনি, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বউচি খেলে কাঁটাগাছে জামা ছিঁড়ে কাদায় পিছলে

পড়ে নতুন ফ্রকের বারোটা বাজিয়েছিলাম।

ছোটবেলাতেই কেবল নয়, পুরো বড়বেলা জুড়ে দুরন্তপনা আমার স্বভাব ছেড়ে কোথাও যায়নি। গাছ দেখলেই গাছে চড়ার ইচ্ছে কোনওদিন মরেনি। পুকুর দেখলে সাঁতার কাটার ইচ্ছেও।

এই কদিন আগে নূপুর ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ির ফেরার পথে আমাকে দেখতে এসেছিল এ বাড়িতে। ও ধানমণ্ডি শাখার সোনালি ব্যাঙ্কেই কাজ করে। থাকে গ্রিন রোডে। এ বাড়ি থেকে ওর আপিস আর ওর বাড়ি দুটোই একরকম ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। কিন্তু স্বামী নিয়ে আমার আলাদা সংসার নয় যেহেতু, আমাকে দেখতে আমার শ্বশুরবাড়ি আসতে ওর সংকোচ হয়। তা না হলে নূপুর দেড়মাসে এক বার মাত্র আসত না। ও আমাকে বলল, তুই তো যেতে পারিস। আমার পক্ষে একা যাওয়া যে সম্ভব নয়, যদি আমার যেতে ইচ্ছে করে তবে হারুনের অবসর হলে বা ইচ্ছে হলে আমাকে সে নূপুর বাড়িতে নিয়ে যাবে, সে অপেক্ষায় আমার বসে থাকতে হবে, তা শুনে নূপুর হাঁ হয়ে থাকে। ও দেখে গেছে আমি কেমন লক্ষ্মীবউ হয়ে শ্বশুর বাড়ি বসে আছি, কোথাও একা বেরোচ্ছি না। স্বামী দেবতাটির সঙ্গে রাত ছাড়া দেখা হচ্ছে না এটি ওর মতো চুপচাপ মানুষকেও অবাক করেছে। ও কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেছে, তা হলে কী করে দিন যাচ্ছে তোর?

—যাচ্ছে।

কী করে যাচ্ছে তা আমি স্পষ্ট করে নূপুরকে কিছু বলি না। ও সম্ভবত অনুমান করে নেয় কী করে যাচ্ছে।

নূপুর বয়সে আমার দু বছরের বড় হলেও বন্ধুর মতো। ওর যখন বারো বছর বয়স, টাইফয়েড জ্বরে প্রায় মরে যাবার অবস্থা হয়েছিল। বাবা-মা দুজনেই শোকে অস্থির। এক মেয়ে চলে গেলে, বাকি থাকবে আর একটি মেয়ে। পাড়ার সফি ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন, আপনার একটি ছেলে থাকলে দুঃখ কিছু কম হত, সে বুঝি। আমার অল্প বয়স যদিও, অবাক হয়েছিলাম ডাক্তারের কথা শুনে। বাড়ির বড় মেয়ের অসুখ করেছে, সন্তানের আরোগ্যের জন্য ব্যাকুল হবেন বাবা মা, এই তো স্বাভাবিক, পুত্রসন্তান থাকলে কন্যার প্রতি বাবা-মার আবেগ কিছু কম থাকে এ আবার কেমন কথা! নূপুর শেষ অবদি বেঁচে উঠেছে। অসুখের কারণে পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে এক ক্লাস নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে। এতে আমার অবশ্য আনন্দই হয়েছিল, ক্লাসে আমার সঙ্গী আরও একজন বেড়েছিল। বাবা কখনও ছেলের জন্য হাহাকার করেননি। ছেলে নেই বলে বাইরের কেউ হাপিত্যেশ করলে বাবা আমাকে দেখিয়ে বলতেন, এ হচ্ছে আমার ছেলে, একে দিয়েই আমার ছেলের কাজ হয়।

বাড়িতে কারও অসুখ হলে, আমি ডাক্তার ডেকে এনেছি, ওষুধ কিনে এনেছি। এমনকী কাঁচা বাজারের ভিড়ে ঢুকে বাজার করেছি। নূপুরকে দেখে বাসু নামে পাড়ার এক ছেলে শিস বাজাত, নূপুর আমাকে কান্না কান্না গলায় বলেছিল বাসুর কথা। একদিন পাড়ার ছ-সাতজন আমার বয়সী ছেলে নিয়ে বাসুর বাড়িতে ঢুকে ওর বই খাতা ছিঁড়ে কলম পেনসিল ভেঙে ওকে কটা কিল ঘুসি লাগিয়ে

এসেছিলাম, অবশ্য সোজা বাড়িতে আসিনি, সুভাষদের বাড়িতে লুকিয়েছিলাম দু ঘণ্টা। বাসু এরপর আর শিস বাজায়নি। বাসুর সঙ্গে নূপুরের ভাল বন্ধুত্বও হয়েছিল।

ছোটবেলায় আমার একটা দল ছিল। দলে ছিল সাতজন ছেলে দুজন মেয়ে। লাটিম, মার্বেল, ঘুড়ি, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন সব খেলতাম ওয়ারির মাঠে। আমি ছিলাম দলের নেতা। আমার সঙ্গে পেরে উঠত না আমার চেয়ে বয়সে দু তিন বছর বড় এমন কোনও ছেলেও। সেই দুর্দান্ত দুরন্ত আমি খেলাধূলায় যেমন ভাল ছিলাম, লেখাপড়াতেও। ক্লাসে ভাল পাঁচজনের মধ্যে আমার নাম থাকত। বাবা প্রতিবছর আমার পরীক্ষার ফল দেখে খাঁচা ভরে সন্দেশ কিনে আনতেন। বাবা বলতেন, আমার ছেলের প্রয়োজন নেই, আমার এই মেয়েই জজ ব্যারিস্টার হবে, আমার মান রাখবে। পদার্থবিজ্ঞান জজ ব্যারিস্টার হবার পথ নয়, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করতে চেয়েছিলাম, বাবা আপত্তি করেননি। বলেছিলেন ভাল বিষয়। হ্যাঁ ভাল বিষয় বটে। চুলোর ওপর হাঁড়ি পাতিল কত ডিগ্রি কোণে রাখলে সেটির নড়চড় হবে, কী তাপে এবং চাপে ভাত সেদ্ধ হবে সেই বিদ্যা প্রয়োগ করার জন্য পদার্থবিজ্ঞান ভাল বই মন্দ বিষয় নয়।

বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েছিলেন। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার কারণে মা কিন্তু ইস্কুলই ডিঙোতে পারেননি। কিন্তু মাও তাঁর দু কন্যাসন্তান নিয়ে কখনও বিব্রত হননি। আত্মীয় পড়শিরা মাকে দেখে চুক চুক দুঃখ করত। মাকে আড়ালে নিয়ে বলত, বাচ্চা যে আর হবে না আপনার তা তো নয়, এবার যেমন তেমন করে একটা ছেলে হওয়ান, ছেলেই ভরসা। মা বলতেন, ছেলে ধুয়ে জল খাব? ছেলে হলে কী লাভ বলুন? তেরো বছর বয়সে সিগারেট ধরবে, চৌদ্দো বছর বয়সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইস্কুলের মেয়েদের দিকে শিস দেবে, পনেরো বছর বয়সে মদ ধরবে, ষোলো বছর বয়সে কোমরে ছুরি রাখবে। আমার মেয়েই ভাল।

মার মন্তব্যে ওরা চুপসে যেত।

মা নিজে ইস্কুল না ডিঙোলেও আমাদের বড় হওয়ার পরামর্শ দিতেন সব সময়ই। বড় হওয়া, মার ধারণা, লেখাপড়া করলেই হয়। বলতেন আমার জীবনে লেখাপড়া হয়নি বলে এখন ধর্মকর্ম করছি, এ হচ্ছে অবসরের কাজ। জীবনের শুরু থেকেই আমার অবসর জীবন চলছে। তোমাদের জীবন হবে অন্যরকম। লেখাপড়া না করতে পারার যে দুঃখ ছিল মার, আমাদের দু বোনের বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙোনোতে মার সে দুঃখ লাঘব হয়েছে হয়তো। কিন্তু আমি বুঝি না ইস্কুল না পাশ করা মার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা আমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। সংসারের ঘানি দুজনকে একইরকম টানতে হচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে আসাতক দেখছি ছেলের বউ হওয়া মানেই সংসারের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া। এ বাড়িতে ছেলের বউ আরও একজন আছে, রাণু। রাণু মেট্রিক অবদি যায়নি। কিন্তু কী লাভ হয়েছে আমার পদার্থবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে? যে কোনও অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত গৃহবধূর চেয়ে আমি কি বেশি যোগ্যতা রাখি সংসারকাজে? এ সংসারে

রাণুও যা, আমিও তা। বধূ, এই আমাদের পরিচয়। কে কত বেশি ক্লাস ডিঙিয়েছে, শ্বশুরবাড়িতে তার হিশেব হয় না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি লক্ষ করি চোখে জল জমছে আমার। আঁচলে সে জল দ্রুত মুছে নিয়ে আমি হারুনের আপিসে ফোন করি।

হারুন ফোন ধরে আমার গলার স্বর শুনে বলে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি। এমনি।

—এমনি?

কোনও কারণ ছাড়া এমনি ফোন করেছি শুনে সে বিস্মিত। অথচ এই হারুনকে বিয়ের আগে যখন তখন আপিসে ফোন করতাম। তার ব্যস্ততা বলে কিছু ছিল না তখন, কখনও জানতে চায়নি কেন ফোন করেছি। আপিসে বসেই ফোনে সে রাজ্যির গল্প করত আমার সঙ্গে। আর এখন বেশ রুষ্ট কণ্ঠে, কারণ ছাড়া এভাবে আপিসে ফোন করো না তো! কত কাজ থাকে, জানো তো।

জানি বটে। কত কাজ হারুনের। কাজ যেন হঠাৎ করে বড় বেশি বেড়ে গেছে। এসব কাজ অবলীলায় তুচ্ছ করেছে একসময়, আর এখন আমার জন্য একটি মুহূর্ত খরচ করাকেও তার অপচয় বলে মনে হয়। মানুষ কী করে এত পালটে যায়! আমি ফোন রেখে ভাবতে থাকি। জানি, ভেবে কূল পাব না। শাশুড়ি এসে আমার দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বলেন, তোমার শ্বশুরের বাতের ব্যথাটাও এখনও কমছে না। শ্বশুরের বাতের ব্যথা না কমলে আমি কী করতে পারি। হারুন এলে তিনি নিজেই বলবেন যে তার বাবার বাতের ব্যথা কমছে না। হারুন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ব্যাস।

মাথায় ঘোমটা তুলে দাঁড়িয়ে থাকি নতমুখ, শ্বশুরের বাতের ব্যথার খবর শোনার পর, আমি অনুমান করি তিনি চাচ্ছেন আমার মুখখানা করুণ দেখাক, চাচ্ছেন দুশ্চিন্তায় যেন আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এ বাড়িতে কারও কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, কারও কোনও অসুখ হলে যদি শোক প্রকাশ না করি, আমি তা হলে কীসের যোগ্য বউ! বউ হলেই তো হয় না, যোগ্য হতে হয়। শাশুড়ি প্রায়ই বলেন, তাঁর দাপুটে শাশুড়ি বিষম ভালবাসতেন তাকে, তিনি যোগ্য বউ ছিলেন কি না তাই। কোনও কাজের লোক ছিল না, সব কাজ শাশুড়ি একা নিজের হাতে করতেন। এত কাজ করা মানুষটির কাজের প্রতি এত অনীহা কেন, বুঝি না। বসে থেকে থেকে বিশাল শরীর বানিয়েছেন। ধপ ধপ শব্দ হয় হাঁটলে, মেঝে কাঁপে। শ্বশুরের বাতের ব্যথার কথা বলে তিনি থামলেন না, বললেন তাঁর গা ম্যাজম্যাজ করে আজকাল প্রায়ই, রসুনিকে যে গা টেপার জন্য ডাকবেন, তাও সম্ভব হচ্ছে না, রসুনি তাঁর গা টিপলে বাড়ির কাজ করবে কে? আমি নিশ্চিত যে শাশুড়ির ইচ্ছে আমি তাঁর গা টিপি, নয়তো রসুনি যে কাজগুলো করছে, সে কাজের দায়িত্ব আমি নিয়ে রসুনিকে তাঁর গা টিপতে পাঠাই। এ আর এমনকী, সোজা রান্নাঘরে গিয়ে মশলা বাটা থেকে রসুনিকে মুক্ত করি। এই ভাল, শাশুড়ির গা টেপার চেয়ে এই কাজ ভাল বেশি। গা যে আমি তাঁর টিপিনি কখনও তা নয়। তিনি গা ম্যাজম্যাজের কথা বললে আমি নিজেই বলেছিলাম, আমি টিপে দিচ্ছি। সে শখের

গা টেপা শুরু করেছিলাম দুপুরবেলা, সন্ধে নামলে তবে মুক্তি পেয়েছি, গা তো নয়, যেন আস্ত একটা পাহাড়। হারুন রাতে খেতে গিয়ে নাক কুঁচকে যখন বলেছিল, তুমি রাঁধোনি নাকি আজ? বলেছিলাম, তোমার মার গা টিপে আজ আমার বেলা গেছে, রাঁধার সময় পাইনি। আমার কণ্ঠে ঝাঁজ ছিল খানিক, সে ঝাঁজ হারুনের ভাল লাগেনি, বলেছিল, যে মেয়ে রাঁধে, সে মেয়ে চুলও বাঁধে শুনেছি।

—চুল বাঁধা আর গা টেপা এক কথা নয়।

—তুমি কি জানো যে আমার মা-ই তোমার মা। তোমার নিজের মার গা ব্যথা হলে তুমি কি গা টিপে দাও না?

—আমার মা-র কখনও গা ব্যথা হয় না।

—গা ব্যথা হলে কী করবে?

—ব্যথার ওষুধ খাবেন।

—ওষুধে সব অসুখ সারে না।

তা ঠিক, হারুনের কথা তখন না মানলেও এখন আমি মানি, যে, ওষুধে সব অসুখ সারে না। তা না হলে ওর দেওয়া প্যারাসিটামল আর মটিলন খেয়ে আমার মাথা ঘোরা আর বমি হওয়া বন্ধ হত। হয় না।

সখিনা কাপড় ধুচ্ছে, রান্না একাই আমাকে করতে হবে। হাঁটুতে থুতনি গুঁজে ফুলকপি কেটে আর কিছু সিম বেছে দিয়ে রাণু চলে যায় ওর ঘরে। দুপুরে রান্নাঘরে ঢুকে যা হোক কিছু একটা করে বউ হওয়ার দায়িত্ব পালন করে ও। বাড়ির বড়বউ-এর বড় দায়িত্ব, ছোটবউ-এর দায়িত্ব তত নয়, এ রাণু ভাল জানে।

নাস্তা খেয়ে আরেক দফা ঘুমিয়ে দোলন ঢোকে রান্নাঘরে, রান্না কখন শেষ হবে? সুমাইয়ার খিদে পেয়েছে।

সুমাইয়া যদি খিদেয় কাঁদতে থাকে, তা হলে দোলন নয় শুধু, শ্বশুর শাশুড়ি সবাই অখুশি হবেন আমার ওপর। তাপ বাড়িয়ে চাপ বাড়িয়ে রান্না করি, কাউকে অখুশি করা আমার উচিত নয়। রান্না শেষ করে সুমাইয়াকে খেতে দিয়ে শ্বশুরের ঘরে ঢুকি, ঢুকি ঢুকতে হয় বলে, জিজ্ঞেস করি জিজ্ঞেস করতে হয় বলে যে বাতের ব্যথার জন্য ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছেন তা তিনি নিয়মিত খাচ্ছেন কি না, যদিও জানি নিয়মিতই তিনি খাচ্ছেন, আরও জিজ্ঞেস করতে হয় দুপুরের খাওয়ার আগে এখন কিছু খাবেন কি না, চা বা কফি। শাশুড়ির গা টেপা চলার মধ্যে খবর নিতে ঢুকি, ঢুকি ঢুকতে হয় বলে, জিজ্ঞেস করি জিজ্ঞেস করতে হয় বলে যে গা ম্যাজম্যাজ কিছু কমেছে কি না। না কিছু কমেনি। হাসান হাবিব আর আনিস মিলে ভি সি আর-এ হিন্দি ছবি দেখছিল। ওদের বলি স্নান করে এসে খেয়ে নিতে। আজ কি খাবার রেঁধেছি, হাবিব জিজ্ঞেস করে।

—খাসির মাংস, ফুলকপির তরকারি, ডাল। চলবে?

—চলবে।

রাণু স্নান সেরে কুরশিকাঁটা নিয়ে বসেছে আবার। ওকে জিজ্ঞেস করি, এত সেলাই শিখলে কোথায়?

ও মুখ না তুলে বলে, আমি তো ভাই তোমার মতো এত লেখাপড়া করিনি।

উল কুরশি বোনাই শিখেছি।

—হুম। তা কার জন্য বুনছ এটি।

—কারও জন্য না। রাণু বলে।

কারও জন্য নয়, অথচ বুনছে। কেন বুনছে ও জানে না । কি বুনছে, সম্ভবত তাও জানে না।

বুঝি না, কুরশি বোনায় এত কেন আগ্রহ ওর, আসলেই খুব আগ্রহ নাকি সময় কাটানো অথবা জীবনের নানারকম অপূর্ণতাকে একরকম লুকোনো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিই। হাসান, হাবিব, আনিস আর শ্বশুরের খাওয়া শেষ হলে আমি, শাশুড়ি, দোলন আর রাণু বসি খেতে। আমাদের খাওয়া শেষ হলে রসুনি আর সখিনা।

বড়বউ-এর তাবৎ কর্তব্য পালন করে যখন জানালায় দাঁড়াই, মনে হয় কারও জন্য অপেক্ষা করছি বুঝি, কেউ আসবে বলে তাকিয়ে আছি। কার জন্য অপেক্ষা করব, হারুন আসবে শেষ বিকেলে। মাঝে মাঝে ভাবি, হঠাৎ হঠাৎ হয়তো সে চলে আসবে একেবারে ভর দুপুরে, যখন আমি স্নান করে বেরোই, মাথায় তোয়ালে পেঁচানো, অটপৌরে শাড়িতে আমাকে তখন বড় স্নিগ্ধ লাগবে দেখতে, হারুন আমাকে জড়িয়ে ধরবে, বুকের সঙ্গে আমাকে মিশিয়ে বলবে, উফ তোমার শরীরটা তুলোর মতো নরম লাগছে। বিয়ের পর হারুন তিনদিন ছুটি নিয়েছিল, এক মুহূর্ত আমার চোখের আড়াল হয়নি। দুপুরবেলা স্নান করতে গেলে আমাকে টেনে ঢোকাত স্নান ঘরে। নিজে উলঙ্গ হয়ে আমাকেও উলঙ্গ করত। ঝরনাতলে দাঁড় করাত আমাকে, অদ্ভুত এক আনন্দ হত আমার, আমার ভেজা মসৃণ শরীরটিতে হাত বুলিয়ে সে উষ্ণ হয়ে উঠত, ও সময় হারুন পাঁচ-ছবার শরীরের গভীর খেলা খেলত, এখন এই দেড়মাসে সেটি একবারে এসে দাঁড়িয়েছে। সময় কোথায়? আপিস থেকে ফিরে বাড়ির সবার খোঁজ খবর নিয়ে, কার কী প্রয়োজন ইত্যাদি জেনে, খেয়ে দেয়ে, টেলিভিশন দেখে যখন শুতে আসে, তখন অনেক রাত। তার ক্লান্ত শরীর একবার আমার শরীরের সঙ্গে মেশে। ঘুম এলে আমার দিকে পিঠ ফিরে শোয়। এভাবেই আমাদের যৌথ জীবন যাচ্ছে। দিন যত যায় তীব্রতা তত কমে যায় আবেগের, তাইকি! আমার খুব ইচ্ছে করে শিপ্রার কাছে জিজ্ঞেস করতে, যায় কি? শিপ্রার বাড়িতে ফোন নেই যে জানা যাবে। চন্দনার কাছেও জিজ্ঞেস করা যেত, কিন্তু ওর বিয়ে হয়নি, নাদিরারও বিয়ে হয়নি। আসলে ওদের কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে হয় না আমার। বিয়ের পর পর চন্দনা, আরজু, সুভাষ, নাদিরা এত ঘন ঘন ফোন করত যে হারুন বলল, এ তোমার শ্বশুরবাড়ি, এ কথা জানো তো! আমাকে কতবার যে হারুন মনে করিয়ে দিয়েছে, এ আমার নিজের বাড়ি নয়, এ হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। ফোনে ওদের সঙ্গে কথা বলতেও আড়ষ্টতা ছিল আমার। বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকত সামনে। এরপর হারুন হঠাৎ বাড়ির ফোন নম্বর পালটে দিল। কেন পালটাল, কারণ চাকরি পেতে লোকেরা নাকি বাড়িতে ফোন করে তাকে বিরক্ত করে। আমার কিন্তু মনে হয়েছে আমার বন্ধুরা যেন এ বাড়িতে আর ফোন না করে, সে কারণেই নতুন নম্বর এনেছে সে, এবং এ

একরকম আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে নতুন ফোন নম্বর আমি যেন যাকে তাকে না দিই। কাউকে দিইনি নতুন নম্বর। হারুন দিতে না বলেনি, কিন্তু ওর গোপন ইচ্ছেটুকু আঁচ করতে পেরেছিলাম।

হারুন হন্তদন্ত হয়ে সন্ধেয় ফেরে আপিস থেকে। তার এক্ষুনি এক নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে।

তোমার একার নেমন্তন্ন? জিজ্ঞেস করলাম। সাধারণত বিবাহিতদের নিমন্ত্রণ করলে সস্ত্রীক করা হয়। কিন্তু হারুন আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলে না বরং তার শার্ট প্যান্ট তড়িঘড়ি ইস্ত্রি করে দিতে বলে। আমি ইস্ত্রি যখন করছি, হারুন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কী উপহার নেওয়া যায় বল তো?

—ফুল নাও।

—আরে ধুর, ফুল কী করে নিই, এ তো বিয়ের নেমন্তন্ন?

শাশুড়ি পাশেই ছিলেন, বললেন, কোরান শরিফ আর জায়নামাজ দে, সবচেয়ে ভাল উপহার।

—ভাবছি ডিনার সেট দেব।

দোলন ঢোকে আলোচনায়।

—কী যে বল ভাইয়া, এত দাম দিয়ে ডিনার সেট দেবে! টি সেট দাও, দাম কম পড়বে।

আমি আর উপহার প্রসঙ্গে কথা বাড়াই না। হারুন যা দেবে ঠিক করেছে, সে তাই দেবে।

আমাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া প্রসঙ্গে হারুনকে কিছু বলার সুযোগ পাই না। সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে সে বেরিয়ে যায়।

আমি তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবি, এ কি সেই হারুন যে আমাকে ভালবাসত? যে আমাকে প্রায়ই তার বন্ধু শফিকের বাড়ি নিয়ে যেত! এ কি সেই হারুন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসত, ফুল ভালবাসত? হারুন কি আসলেই ফুল ভালবাসে, এ বাড়িতে একটি শুকিয়ে যাওয়া গোলাপও নেই। তা হলে আপিসে তার টেবিলের ফুলদানিতে যে তাজা গোলাপগুলো ছিল, কেন ছিল? কাকে দেখাতে?

হারুন শিল্পকলায় গানের অনুষ্ঠানে কেন গিয়েছিল, এ নিয়ে ভাবি আজকাল। পাত্রী নির্বাচন করতে কি? কোমলমতি মেয়েরা গান শুনতে যায়, কোনও একটি সুন্দরীর পিছু নিয়ে যদি বিয়ে অবদি করা যায়, নিশ্চিত হওয়া যায়, এ মেয়ের গুণ আছে, গুণী মেয়েকে বিয়ে করার কৌশলই কি ছিল হারুনের! বিয়ের আগের হারুনকে আর এই হারুনকে আমি মেলাতে পারি না। যে বলত বিকেল পাঁচটায় সুইসের সামনে চলে এসো।

বলেছিলাম, সুইস কোথায় ?

—সুইস চেনো না, বল কি? ঢাকা শহরের মেয়ে হয়ে এ কথা বলা তোমাকে মানায় না।

সেই হারুনকেই এখন যদি বলি কিছু কিনতে যাব, বলবে একা যেও না, দোলন

নয়তো হাবিবকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

সঙ্গে যাবার প্রয়োজন হয় কেন, বিয়ে হয়েছে বলে আমার! বিয়ে হয়েছে বলে কি আমি এখন অন্ধ, পথ চিনব না? বিয়ে হয়েছে বলে কি আমি এখন পঙ্গু, কারও কাঁধে আমার ভর দিয়ে হাঁটতে হবে?

হারুনকে বলেছিলাম, আমি কি পথঘাট চিনি না? আমাকে একা বাইরে যেতে বারণ করছ কেন?

কোথায় যেতে চাও?

—ওয়ারি যাব।

—ওয়ারি যাবে কেন?

—কেন মানে? এমনি।

—এমনি এমনি কেন যাবে?

হারুনের কথায় যুক্তি ছিল বটে। ওয়ারিতে কোনও কাজ না থাকলে খামোকা ওয়ারি যাব কেন।

এখন তুমি এ বাড়ির বউ। বাপের বাড়ি এত ঘন ঘন যাওয়া উচিত নয়। তোমার বাবা-মাই অপছন্দ করবেন তোমার যাওয়া। ভাববেন নিশ্চয়ই এ বাড়িতে তুমি শান্তি পাচ্ছ না।

—বলছ কী? ওঁরা খুশি হবেন আমি গেলে।

হারুন বলেছিল, বিরক্ত হয়েই বলেছিল, যাবেই যখন ঠিক আছে, যেয়ো। গাড়ি পাঠিয়ে দেব। দোলন বা মাকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। অথবা রাত অবদি অপেক্ষা করো, আপিস শেষ করে আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

বিকেল থেকেই শাড়ি পরে ওয়ারি যাবার জন্য তৈরি হয়ে ছিলাম। হারুন আপিস থেকে ফিরলে বললাম, চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—আমার এত ক্লান্ত লাগছে। এখন আবার বাইরে যাওয়া!

—তুমি তো বলেছিলে যাবে।

—তা বলেছিলাম।

—আচ্ছা, ওয়ারিতে খুব কি দরকার তোমার যাওয়ার? খুব দরকার না থাকলে খামোকা যাওয়ার কোনও মানে হয়? গাড়ির তেল খরচেরই বা এত কী দরকার!

এসব মন্তব্যের পর আমার আর যেতে ইচ্ছে করেনি। বলেছি, বাদ দাও।

আমি যে খুব খুশি হয়ে যাওয়া বাদ দিয়েছি তা নয়। তা দেখেও হারুন সে রাতে একবারও আমার মন ভাল করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বাবার বাড়িতে না হয় না-ই গেলাম, কিন্তু এরকম বেকার বসে থাকাই বা কতদিন!

হারুনকে তার পরদিন সকালে যখন আপিস যাচ্ছে, বলেছিলাম, লেখাপড়া করেছি কি ঘরে বসে থাকার জন্য? রাত জেগে জেগে পড়ে পাশ করেছি, কঠিন কঠিন সব পরীক্ষা, কেবল সংসার ধর্ম পালন করার জন্য?

হারুন চমকে তাকিয়েছিল আমার দিকে? কী বলতে চাচ্ছ কী?

—বলতে চাইছি একটা চাকরি করলে ভাল হত।

—তুমি চাকরি করবে? হারুনের বিস্ময় কাটে না।

—কেন করব না?

—বল কী?

—কী চাকরি করতে চাও?

—যে কোনও। যা জোটে।

—কীরকম শুনি?

—তোমার আপিসেই তো কত লোককে চাকরি দাও, আমাকে দেবে?

—মানে?

মানে যে কি তা আমার বুঝিয়ে বলা হয় না তাকে।

হারুন আবার প্রশ্ন করে, তুমি চাকরি করতে চাও কেন?

—চাকরি করব বলেই তো লেখাপড়া করেছি। লেখাপড়া জানা মানুষের কী ঘরে বসে থাকা উচিত এমন?

—লোকে চাকরি করে টাকা কামানোর জন্য। আমার টাকায় কী তোমার হচ্ছে না?

আমি হেসে উঠি, তা হবে না কেন? আমি তো সে কথা বলছি না। অভাবের কথা বলছি না, বলছি কাজের কথা। মাথাটাকে কাজে লাগানো উচিত। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা জানোই তো।

একথা শুনে হারুন আমার কোমর জড়িয়ে বিছানায় বসল, আমাকেও বসাল। চিবুক তুলে আমাকে তার দিকে ফিরিয়ে বলল, আমার বাবা-মাকে দেখবে, আমার ভাই-বোনদের দেখবে, এদের ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব তো এখন তোমার। বাড়ির বড় বউ তুমি। তোমার ওপর এরা সবাই ভরসা করে। এদের মন পেতে চেষ্টা করবে, বুঝলে। যদি এদের ভালবাসা পাও, সে তোমারই জয়। এই সংসারকে তুমি আপন করে নিলে আমার কত ভাল লাগবে, ভেবে দেখেছ?

আমি ওর হাত থেকে আমার চিবুক সরিয়ে বলি, চাকরি করলে যে বাড়ির বউ হিসেবে যে কর্তব্য তা পালন করব না তা তো বলছি না। সবই করব।

—কী করে করবে, সময় কী করে হবে তোমার, বল? আমাকে দেখছ না। সময় জোটে কোনও ওদের সঙ্গে বসার। তার ওপর হুট করে বিয়ে করেছি। এখন কাজের বাইরে যে সময় বাঁচে, তা তোমাকেই দিই।

হারুন আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশে শোয়, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিতে দিতে নরম কণ্ঠে বলে, এ বাড়ি তো এখন তোমার। একে গুছিয়ে রাখবে, যত্ন করবে। এত কাজ, আর বলছ সময় কাটে না? কাজ করতে চাইলে কি কাজের অভাব হয়?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

হারুন নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, ঠিক আছে, যদি খুব বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে, মার হাতে বাজার খরচার টাকা দিয়ে যাচ্ছি আজ, সঙ্গে আরও কিছু দেব, তুমি দোলনকে নিয়ে নিউ মার্কেট যেয়ো, পছন্দ করে কিছু জিনিস কিনে এনো।

ছোট বাচ্চাকে যেমন লজেন্স ধরিয়ে দিয়ে কান্না থামাতে হয়, হারুন আমার

চাকরির আবদার থামাতে সেরকম লজেন্স ধরিয়ে দেওয়ার মতো বাজার করার টাকা দিয়ে চলে গেল। আর হারুন বেরিয়ে যাওয়ার পর পর বিকেলে দোলনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গিয়ে কিছু হাঁড়ি পাতিল আর কাপড় চোপড় কিনি। হারুন রাতে জিজ্ঞেস করেছে কি কেনাকাটা করেছি। বলেছি, হাঁড়ি পাতিল। দেখালামও এনে।

বাহ, বেশ সংসারী তো তুমি!

—আর কী কিনলে?

—শ্বশুরের জন্য পাঞ্জাবি পাজামা। শাশুড়ির জন্য শাড়ি। দোলনের শাড়ি। রাণুর জন্যও একটি। হাবিবের জন্য জুতো। সুমাইয়ার জামা।

—আর?

—আর তোমার জন্য একটা ফতুয়া।

—আর?

—হাসান আর আনিসের জন্য দুটো শার্ট।

—আর?

—আর কিছু না।

হারুন আমার গালে দুটো চুমু খেয়ে বলে, বাহ এই তো আমার লক্ষ্মী বউ। এত লক্ষ্মী বউ আর কার আছে? কে বলে আমি ঠকেছি!

—কেউ কি বলেছিল ঠকেছ? আমি জিজ্ঞেস করি।

হারুন হেসে বলে, না মোটেই না। কার ঘাড়ে দুটি মাথা যে বলবে!

—তা হলে ঠকার প্রসঙ্গ উঠছে কেন?

উঠছে কেন হারুন না বললেও আমার ধারণা হয় হারুন নিজেই নিজেকে এই প্রশ্ন করেছে।

ভেবেছিলাম হারুন জানতে চাইবে আমার জন্য কিছু কিনেছি কি না। কিনিনি বললে হারুন রাগ করবে, আমাকে নিয়ে সেই রাতেই নিউ মার্কেট যাবে, আমার জন্য অন্তত একটি শাড়ি হলেও কিনবে। হারুন গালে চুমু খেয়েছে আমার, ওই চুমুতে আমি গন্ধ পাই তার ভালবাসার, আমার জন্য নয়, তার পরিবারের আর সবার জন্য। আমার আশঙ্কা হয় হারুন আমাকে যতটা ভালবাসে, তার চেয়ে বেশি বাসে তার মা বাবাকে, হাবিব হাসানকে, দোলনকে, দোলনের স্বামীকে। খুব সূক্ষ্ম এক অপমানবোধ আমার ভেতরে চুপচাপ বসে থাকে। হারুন সে রাতে আমাকে খুলে মেলে আদর করে, খুব গভীর করে আদর, সে রাতে তার বিষম উচ্ছ্বাস ছিল আমাকে নিয়ে।

সময় কাটাবার সব ব্যবস্থা হারুন আমাকে করে দিয়েছে। এ বাড়ির মানুষ নিয়ে আমার বাকি জীবন কাটাতে হবে। এদের সুখে আমাকে সুখী হতে হবে, এদের দুঃখে দুঃখী। এদের প্রয়োজনে আমাকে কাছে থাকতে হবে, অপ্রয়োজনে দূরে। এ বাড়ির প্রতিটি প্রাণীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হতে হবে আমাকে। আমি এখন যত না ঝুমুর, তার চেয়ে বেশি হারুনের বউ, হাবিব হাসান দোলনের ভাবী, শ্বশুর শাশুড়ির বউমা। নিজের অস্তিত্বকে আমি বিলীন করেও, বাড়ির সবার সুখে সুখী আর দুঃখে

দুঃখী হয়েও আমার আরও কিছু হতে ইচ্ছে করে, আরও কিছু করতে। বিয়ের পর হারুন আমাকে নিয়ে দুদিন কেনাকাটা করতে গেছে। নিজে পছন্দ করে শাড়ি কিনেছে আমার জন্য, শাড়ির প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে মিষ্টি হেসে হারুন বলেছে, তোমাকে ভালবাসি কি না বল তো। এই কথাটি হারুন তখন না বললেও পারত। শাড়ি দেওয়ার সঙ্গে ভালবাসাকে আমি ঠিক মেলাতে পারি না। শাড়ি তো পয়সা হলেই পাওয়া যায়, কেউ খানিকটা উদার হলে শাড়ি কাপড় বিলোতে পারে, যাকাত দেওয়ার সময় এলে সারা দেশে কয়েক লক্ষ লোক শাড়ি বিলোয়, শাড়ি তো হারুন তার ভাইয়ের বউকেও কিনে দেয়, তার মাকে দেয়, বোনকে দেয়, রসুনিকে দেয়, সখিনাকে দেয়। আমি আর ওদের চেয়ে পৃথক হলাম কই! ভালবাসা বোঝানোর জন্য অন্য কিছু নেই? রাতে এক বিছানায় শোয়াটাই হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু শুতে তো পুরুষলোকেরা যে কোনও মেয়ের সঙ্গেই পারে, ভালবাসা ছাড়াই। এই যে রাত নামলেই বেশ্যালয়গুলো ভরে ওঠে পুরুষে, কজন পুরুষ ওখানকার মেয়েদের ভালবেসে স্পর্শ করে?

৪

হারুন নিশ্চিত যে উপসর্গগুলো দেখা দিচ্ছে আমার শরীরে, তা মোটেও গর্ভবতী হওয়ার কারণে নয়। এত শিগগির, মাত্র দেড়মাসে, এ ঘটনা ঘটার কোনও কারণ নেই। আমি আশঙ্কায় নীল হতে থাকি, যদি বাচ্চা পেটে না আসার কোনও কারণ না থাকে, তবে কি হয়েছে আমার, অন্য কোনও রোগ, দুরারোগ্য কিছু।

হারুন আমার নীল হয়ে থাকা আড়চোখে দেখে।

নীল হয়ে থাকা আমাকে সে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার দূরে নয়, বাড়ির কাছেই ধানমণ্ডির এক ক্লিনিকে। দুশ্চিন্তার লেশমাত্র হারুনের মধ্যে ছিল না, পরম এক নির্লিপ্তি ছিল তার সারা মুখে। দেড়মাসে বাচ্চা পেটে আসে না হারুন এরকমই জানে। অসুখ বিসুখে সম্ভবত আমার ভোগা উচিত নয়। বাড়ির কেউই নতুন বউ-এর অসুখ করাকে ভাল চোখে দেখবে না হয়তো। বিয়ের আগে শেষ স্রাব আমি কবে দেখেছি, তা মনে নেই। ঋতুস্রাবের হিসেব করা কখনই আমার হয়ে ওঠে না। রক্ত দেখে প্রতিমাসেই চমকে উঠি, কখনও নিশ্চিত নই কোন তারিখে ঘটনাটি ঘটবে। ঘটবে যখন ঘটবে, এ এমন কোনও সুখকর জিনিস নয় যে মনে রাখার ইচ্ছে করে আমার। বিয়ের পর ঋতুর দেখা পাইনি, বিয়ের দেড়মাস পর মাথা ঘোরা আর বমি হওয়া শুরু হয়েছে যা আগে কখনও হয়নি এটুকুই জানি শুধু। এ নিয়ে আমি শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, অথবা দোলনের সঙ্গে, অথবা মা বা নূপুরের সঙ্গে, তাও বলিনি। কাউকে জানানোর আগে হারুনকেই জানানো দরকার বলে মনে করেছি, তার সঙ্গেই ইচ্ছে হয়েছে এ নিয়ে কথা বলতে একান্তে।

ডাক্তার সোফিয়া মজুমদার-এর অপেক্ষা-ঘরে আমি আর হারুন যখন

বসেছিলাম, আমার বুক কাঁপছিল, জিভ শুকিয়ে আসছিল, গেলাস গেলাস জল খাচ্ছিলাম। হারুন দিব্যি পত্রিকা পড়ছিল মন দিয়ে। পত্রিকা আমিও যে নিইনি হাতে তা নয়, পড়া হয়নি, পারিনি। হারুন আড়চোখে আমার অস্থিরতা দেখেছে, একবারও জিজ্ঞেস করেনি, আমার শরীর খারাপ লাগছে কি না। ডাক্তারের ঘরে যখন ডাক পড়ল, হারুন পত্রিকা রেখে আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকল, কিন্তু পত্রিকাটি রেখে আসতে মোটে তার ইচ্ছে করছিল না, বলল, ধুর ভাল একটা লেখা পড়ছিলাম! যেন ডাক্তারের ঘরে যদি তাকে না আসতে হত, সে বাঁচত। ঝামেলা যা কিছু আমার, আমিই সেরে আসলে সে স্বস্তি পেত।

—কী অসুবিধে?

—বমি হয়। বমি বমি লাগে। মাথা ঘোরে।

—মাসিক কবে হয়েছে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, মনে নেই।

ডাক্তার বললেন, মনে নেই কেন? দেখে তো লেখাপড়া জানা মেয়েই মনে হচ্ছে। হিশেব রাখেন না?

এই মৃদু ধমক দিয়ে ডাক্তার বললেন, বাচ্চা আছে আপনার?

—না।

হারুন মাঝখানে বলে উঠল, আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র দেড়মাস!

—রক্ত আর প্রস্রাব পরীক্ষা করতে দিন পাশের ঘরে, পরে ডাকা হবে।

ওসব পরীক্ষা করতে দিয়ে আবার অপেক্ষা-ঘরে বসে থাকতে হয় আমাদের। অপেক্ষার সময়টিতে আমার বুক কাঁপছিল, কি জানি কী হয় ভেবে, পেচ্ছাব পাচ্ছিল ঘন ঘন, ঘন ঘন তেষ্টা পাচ্ছিল। হারুন তখন পত্রিকার ওপর ঝুঁকে ছিল না, নাড়ছিল গাড়ির চাবি, দ্রুত।

ডাক্তার ফের ডাকলেন আমাদের, তিনি কিছু বলার আগে হারুন বলল, ওকে বমি বন্ধ হওয়ার ওষুধ লিখে দিন, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার হেসে বলেন, নিশ্চয়ই দেব, নিশ্চয়ই দেব।

ডাক্তার আমাকে ঘরের মধ্যেই পর্দার আড়ালে একটি বিছানায় শুইয়ে পরীক্ষা করে বললেন, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে, শুনে আমি স্বস্তি পেয়েছি, হারুনও।

কাগজে ওষুধ লিখতে লিখতে বলেন, তিন মাস পর আবার আসবেন দেখাতে।

—তিন মাস পর কেন? হারুনের উদ্বিগ্ন স্বর।

—ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তিন মাস পরই আমি দেখি। এরপর প্রতিমাসে দেখব।

কাগজটি হারুনের দিকে এগিয়ে ডাক্তার হেসে বলেন, বউকে ভাল ভাল খাওয়াবেন এখন।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না কি বলছেন। হারুন তেতো স্বরে বলে।

ডাক্তার হেসে বলেন, বাবা হচ্ছেন আপনি, বাড়ি গিয়ে আনন্দ করুন।

হাঁফ ছেড়ে বেরোলাম ডাক্তারের ঘর থেকে। বাচ্চা পেটে না হয়ে যদি বিশ্রী কোনও অসুখের খবর পেতাম, কী কাণ্ডই না হত! দুঃসংবাদ পাব, এই আশঙ্কায় অস্থির ছিলাম। ডাক্তার সুসংবাদ দিলেন, এর চেয়ে সুখের কোনও সংবাদ আর কী হতে পারে! আমাকে নিয়ে হারুন যখন গাড়িতে উঠল সুখের বন্যা বইছিল ভেতরে আমার। কিন্তু হারুন তো আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করছে না বরং গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে শুরু করেছে। বড় অভিমান হয় আমার। সে কি আমাকে চমকে দিতে নিচ্ছে! হারুন বেশ ভাল চমকাতে পারে, তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি, আমি তাকে জানালাম আজ আমার জন্মদিন, শুনে মাথা নাড়ল শুধু সে, কিছু বলল না, যেন আমার জন্মদিন এ কোনও বিষয়ই নয়, যেন দিনটি অন্য যে কোনও দিনের মতোই। হারুন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল না, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাল না, গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাল, আমি অভিমানী মুখ করে পাশে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে হারুন আমাকে সোনার গাঁ হোটেলের ভিতর চমৎকার এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে বড় একটি জন্মদিনের কেক আনল, মোমবাতি জ্বলছে কেকের ওপর, আর বিশাল এক ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে আমাকে বলল, শুভ জন্মদিন। দেখে চোখে জল চলে এসেছিল আমার, সুখের জল। সেই রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া সেরে আমাকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে ও, গাড়ির ভেতর লুকিয়ে রাখা একটি প্যাকেট আমার হাতে দিল, প্যাকেটে সুন্দর একটি কাঞ্চিপুরম শাড়ি। হারুন আমাকে আজও নিশ্চয়ই নিয়ে যাচ্ছে সোনার গাঁয়ে চমকে দিতে। কোনও উপহার সে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও, পরে দেবে।

হারুন যখন বাড়ির দিকে গাড়ি চালাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার কথা বলছ না যে!

কোনও উত্তর দিল না সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, সে কি বাচ্চা চাইছে না এখন! হতে পারে, বিয়ের ঠিক পর পর অনেকে বাচ্চা চায় না। বছর দুয়েক আনন্দ স্ফূর্তি করে, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেরিয়ে তারপর বাচ্চা নেয়। আবার এও মনে হয়, হারুন যদি বাচ্চা না চাইত, তবে তো সে জন্মনিরোধক ব্যবহার করত, তাও ও করেনি, আমাকেও ব্যবহার করতে বলেনি। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি আমার দিকে না তাকানো হারুনের মুখে। হারুনের ভাবলেশহীন মুখে। নিস্পৃহ মুখে। পাথর-পাথর মুখে। সেই মুখ থেকে সরিয়ে রাস্তায় চোখ ফেলে রাখি, এই রাস্তায় হাঁটি না কতদিন, পিচের রাস্তার সঙ্গে সম্পর্কই আমার জন্মের মতো গেছে। ইচ্ছে করে রাস্তায় খালি পায়ে দৌড়োই, আগের মতো ধুলোখেলায় মেতে আগের মতো উল্লাসে উতল হাওয়ায় ভেসে বাকিটা রাত কাটিয়ে দিই।

বাড়ি পৌঁছে হারুন খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকে। দুটো হাতে কখনও খামচে ধরছে চুল, কখনও দুটো হাত গালে, কখনও হাতদুটোয় মুখ ঢাকা। অসম্ভব সুন্দর সেই চোখ দুটোয় অচেনা এক সংশয়। এ কপট গাম্ভীর্য নয়, এ সত্যিকারের। ভেবে আমি অবাক হই যে সে কোনও চমক দিচ্ছে না আমাকে। আমি ঠিক বুঝে পাই না কেন হারুন এমন করছে। কেন সে একটি কথা বলছে না। আজকের মতো সুখের

দিন হারুনের নিশ্চয়ই আর আসেনি। বউ-এর পেটে বাচ্চা এলে কোনও স্বামী কি মুখ ভার করে থাকে! আর হারুনের মতো স্বামী! আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে হারুনের মনে কী হচ্ছে, কী সে ভাবছে।

পাশে বসি তার, কিন্তু সে ফিরে তাকায় না। পিঠে একটি হাত রাখি, তবু সে ফেরে না। জিজ্ঞেস করি, মন খারাপ কেন? এরও কোনও উত্তর সে দেয় না। পাশ থেকে উঠে গিয়ে জামা কাপড় পালটে, জুতো খুলে শুয়ে থাকে। বিছানায় তার শিয়রে বসে আমাকে তো বল কী হয়েছে, তুমি কী খাবে না, শরীর কি খারাপ লাগছে, হয়েছে কী, এমন অস্বাভাবিক আচরণের কারণ কী এসব জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর না পেয়ে চুপ হয়ে থাকি। এমন শব্দহীন হতে তাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। যদি ব্যবসায় কোনও ঝামেলা হত, আপিসে কোনও গণ্ডগোল, তবে তো বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাবার আগেই তার আভাস পাওয়া যেত। আমি বুঝে পাই না আমার কী করা উচিত। অসহনীয় নৈঃশব্দ্য আমাকে বিকট শব্দে চাবকাতে থাকে।

হারুন রাতে খেল না। স্বামী না খেলে স্ত্রীর খাওয়াটা ভাল দেখায় না। শাশুড়ি যখন খেতে ডেকেছেন আমাকে, বলেছি খিদে নেই, খেতে ইচ্ছে করছে না। হারুনের চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছি বারবার, তোমার কেন মন খারাপ, কাউকে কি মনে পড়ছে তোমার, কাকে, বল আমাকে। হারুন মাথা সরিয়ে নিয়েছে বারবারই। চুলে হাত বুলোনো তার পছন্দ নয়। পিঠে হাত রাখলেই পিঠ সরিয়ে নিয়েছে। আমার বিষম ভয় হতে থাকে। আজ এমন একটি সুখের দিনে কোনও আনন্দ সে করছে না, দীপুর মতো নাচছে না, বরং স্বাভাবিক যে জীবনের গতি ছিল তার, তাও আচমকা রোধ করেছে। শুয়ে থাকা, খেতে না ওঠা, কথা না বলা, মন খারাপ হারুনকে দেখে আমার বড় কান্না পেল। বিছানা ছেড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকি। মধ্যরাত অবদি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। হারুন আমাকে বিছানায় ডাকল না। টের পেলাম ও নিজেও ঘুমোচ্ছে না।

৫

রাতে যেমন খায়নি হারুন, সকালেও না। না খেয়ে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হয়। আমি আগের মতোই তার জন্য নাস্তা তৈরি করে রুপোর টিফিন বাক্সে গুছিয়ে দিই। সকালে তখনও আমাদের কোনও কথা হয়নি। আমিই প্রথম বলি, বলি তুমি আমার সঙ্গে কোনও কথা বলছ না, কেন বলছ না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু।

হারুন কোনও কথা না বলে গলায় টাই বাঁধে। যেন নিঃশব্দে টাই বাঁধার মতো জরুরি কাজ আর হয় না। বিষম কষ্ট হতে থাকে আমার। আমার কষ্টের কিছুই কি টের পায় না হারুন! শুরু থেকে আমার কোথায় কখন কি ত্রুটি হয়েছে—খুঁজি। না, কোনও ত্রুটি আমি খুঁজে পাই না। কী এমন ঘটেছে যে আমার পেটে বাচ্চা

জেনেও হারুনের মন ভাল হচ্ছে না! কী এমন ঘটতে পারে তার জীবনে!

হাবিব হাসান বা দোলনের হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনাও ঘটেনি, তার আপিসেও বড় কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। হলে, আমার কাছে লুকোলেও অন্তত সে শাশুড়ি বা শ্বশুরকে জানাত।

হারুন আপিসে চলে গেলে শাশুড়ি ঘরে ঢোকেন, আমি স্নানঘর থেকে সবে চোখের জল মুছে ঘরে এসেছি, তাঁর প্রথম প্রশ্ন, হারুন সকালে নাস্তা না খেয়ে আপিসে গেল কেন?

—আমি তো জানি না। সাধলাম তো খেতে।

—সাধলে অথচ খায়নি!

—না খায়নি।

—হয়েছেটা কী ওর?

—তা তো জানি না। কত জিজ্ঞেস করলাম, কিছু তো বলে না।

—কাল রাতেও তো খায়নি। ঝগড়া করেছ নাকি ওর সঙ্গে?

আমি মাথা নিচু করে থাকি, মৃদু কণ্ঠে বলি, না।

—আমার ছেলে খুব সহজ সরল, দেখো, ওর যেন কোনও কষ্ট না হয়।

শাশুড়ি ধপধপ হেঁটে ঘর থেকে বেরোন। আমি মাথা নিচু করে, মাথায় ঘোমটা, দাঁড়িয়ে থাকি। শাশুড়ির কাছে নতমস্তকে শোনা ছাড়া আমার আর করার কিছু থাকে না।

কাল রাতে তো আমিও খাইনি! আমি কেন খাইনি সে নিয়ে শাশুড়ি কোনও প্রশ্ন করেননি। হারুন আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে কি না, আমার মন খারাপ হয়েছে কি না তা জানার কোনও আগ্রহ শাশুড়ির নেই। আমার খাওয়া না খাওয়া এ বাড়িতে বড় কোনও ঘটনা নয়। হারুন যদি না খায় তবে সেটি ঘটনা। হারুন যদি মন খারাপ করে, সেটি ঘটনা। আমার পেটে হারুনের বাচ্চা এলেও ঘটনা নয়।

শাশুড়ি আমাকে সারাদিনই নানা রকম করে পরামর্শ বা আদেশ দিলেন যেন আমার কোনও আচরণে হারুন অসন্তুষ্ট না হয়, আমি যেন সদাসর্বদা সজাগ থাকি স্বামীকে সুখী করার জন্য। স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর বেহেস্ত, এ কথা যেন আমি ভুলে না যাই। স্বামীর সেবা না করলে আল্লাহতায়ালা নারাজ হবেন, আমাকে দোজখে ছুঁড়বেন তিনি, সেখানে আমাকে পুঁজ আর পচা রক্ত খেতে হবে, আমাকে আগুনে পুড়তে হবে, সাপের কামড় খেতে হবে।

সারাদিন অন্যদিনের মতোই আমি রান্নাঘরে রান্না করলাম, রাণু সবজি কেটে দিল, রসুনি আর সখিনা ঘরদোর ধোয়া-মোছা নিয়ে ছিল, দুপুরে বাড়ির সবাইকে হাবিব হাসান আনিস আর শ্বশুরকে খাইয়ে যখন শাশুড়ির সঙ্গে খেতে বসেছি, শাশুড়ি আমার থালার দিকে তাকিয়ে বারবারই বলতে লাগলেন, হারুনটা বোধহয় আপিসে না খেয়ে কাটাচ্ছে। হারুন না খেয়ে কাটাচ্ছে, আর তার বউ বাড়িতে বেশ আয়েস করে খাচ্ছে, ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু, সে কথাটিই আমার স্মরণ হল, আমাকে স্মরণ করানোর জন্যই আমি আঁচ করি, তিনি বলেছেন। শাশুড়ির সঙ্গে আমাকেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হল হারুনের জন্য, আধখাওয়া থালা আমাকে রেখে আসতে হল

রান্নাঘরে এবং বলতে হল এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, রাতে আপনার ছেলে ফিরলে তখন একসঙ্গেই খাবো। আমার এই আচরণে শাশুড়ি বেশ তুষ্ট হলেন।

আমি আসলে শাশুড়ির চোখের সামনে খেতে পারছিলাম না, নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছিল আমার। যেন আমারই অপরাধ সব। আমার অপরাধের কারণে হারুন বাড়িতে খাচ্ছে না, আমার সঙ্গে কথা বলছে না। আমার পায়ের তলার মাটি নড়ে ওঠে, আমি তলিয়ে যেতে থাকি অতলে।

সেই বমি, সেই মাথা ঘোরা নিয়ে আমি সংসারের কাজে মন দিই। শ্বশুরের জন্য চা করি, শাশুড়ির চুলে বিলি কেটে চামড়ায় নারকেল তেল লাগিয়ে দিই, চুলে খোঁপা করে দিই আর তিনি যা বলেন বয়সকালে খুব ঘন কালো চুল ছিল তাঁর, নিতম্ব ছাড়িয়ে সে চুল হাঁটুর কাছে গড়াতো, পাড়ার লোকে দেখতে আসত সে চুল—শুনি। এসব করে বেলা যেতে থাকে। বেলা যেতে যেতে হারুনের বাড়ি ফেরার সময় হয়। শাশুড়ি বলে দিয়েছেন, হারুনের মন ভাল রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা আমাকে করে যেতে হবে, মেয়েদের জীবনের এই একটিই ভরসা, স্বামী। শাশুড়ি আমার ভালর জন্যই পরামর্শ দিয়েছেন, সে আমি বুঝি। তিনি বলেছেন, হারুন যা খেতে ভালবাসে, তাই রাঁধবে, ও যেভাবে বলে সেভাবে চলবে, ওর মুখের ওপর কথা বলবে না, ও রেগে যেতে পারে এমন কোনও কাজই করবে না, যে শাড়ি পরলে তোমাকে ভাল মানায় ও বলে, সেই শাড়িই পরবে, তুমি চুলে বেণী করলে ওর যদি ভাল লাগে তবে বেণী করবে, আর যদি খোঁপা করলে ওর ভাল লাগে, তাহলে খোঁপা করবে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে স্বামীর মন যুগিয়ে চলা তো খুব কষ্টকর কিছু না।

তা ঠিক, আমি চিরুনি পরিষ্কার করতে করতে বলি।

শাশুড়ির চুল বাঁধা শেষ করে তাঁকে চা বিস্কুট দিয়ে ঘরে এসে আমার জন্মদিনে দেওয়া হারুনের কাঞ্চিপুরম শাড়িটি পরি, চুলে খোঁপা করে খোঁপায় সোনালি জরি গেঁথে দিই, চোখে কাজল পরি, ঠোঁটে লিপস্টিক। গালে রুজ। আমার সাজ দেখে রাণু বলে, ভাবী কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ না কি!

—নাহ।

—তাহলে সেজেছ কেন?

—এমনি।

বলতে লজ্জা হয় হারুনের মন ভাল করার জন্য সেজেছি। মন ভাল হলে হারুন আমার সঙ্গে কথা বলবে, বাড়িতে আবার আগের মতো খাবে, আমাকে জড়িয়ে ধরবে, জড়িয়ে ধরে আমাকে আদর করবে, আমাকে পাঁজাকোলা করে নাচবে।

হাবিবও যখন জিজ্ঞেস করে কোথাও যাচ্ছি কি না, বলেছি, লজ্জার মাথা খেয়ে যে, হারুন এলে কোথাও বেরোব, কোনও নাটক-টাটক দেখতে। বলি, যদিও জানি, হারুনের সঙ্গে নাটক দেখা বিষয়ে কোনও কথা হয়নি, আর কোথাও বেরোব উদ্দেশ্য নিয়ে সাজিনি, সেজেছি স্বামীকে মুগ্ধ করতে। এরকমও হতে পারে, সাজগোজ করা বধূকে দেখে স্বামীর হয়তো ইচ্ছে হবে কোথাও বেড়াতে

নিতে।

এই হারুন তো সেই হারুনই যার সঙ্গে সুইসে খেয়ে, মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটক দেখে, হাতে হাত ধরে হাঁটতাম বেইলি রোডের রাস্তায়, আমাকে টেনে সে টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরে ঢোকাতে চাইত, আমি টেনে তাকে সাগর পাবলিশার্সে। এই হারুন তো সেই হারুনই যে আমাকে বলত, কুনো ব্যাঙের মতো ঘরে বসে কর কি, বেরোও, বাইরে সুন্দর হাওয়া বইছে। এই হারুন তো সেই হারুনই যে আমাকে নিয়ে পূর্ণিমায় ভিজবে বলে এক রাতে মেঘনার পাড়ে গিয়েছিল, সামনে খোলা নদী খোলা আকাশ, তন্ময় হয়ে সেই আশ্চর্য সুন্দর আলোয় বসে আমার গান শুনেছে, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।

বুক ধুপপুক করে যখন বসে থাকি হারুনের অপেক্ষায়। মনে হয় এ যেন বিয়ের আগের কোনও সময়, হারুনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে যেমন করত। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে আমাকে কাঞ্চিপুরম পরা দেখে হারুন কথা বলে। জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলে?

—কোথাও না।

—কোথাও না, তবে এ সাজ কেন?

এ সাজ কেন, তা হারুনকে বলতে আমার লজ্জা হয় যে তোমাকে খুশি করার জন্য পরেছি। তোমার যেন ভাল লাগে দেখতে, মন যেন তোমার ভাল হয়। আমি যে কোনও অসুন্দরী মেয়ে নই, তুমি যে আমাকে বিয়ে করে ঠকোনি, আমি যে একটু সাজলে খুব সুন্দর দেখতে হই, তা যদি ভুলে গিয়ে থাকো, তা বোঝাতে। বলি না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

হারুন আমার উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকে। আমার বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না।

উত্তর না পেয়ে হারুন যখন প্যান্ট শার্ট পালটে লুঙ্গি পরার আয়োজন করে, আমি বলি, চল না কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি, আগের মতো, আমাদের তো এখন খুব সুখের সময়!

— সুখের সময়?

হারুনের দু চোখে কেবল নয়, সারা শরীরে বিস্ময়। হাতে পায়ে বুকে পেটে।

সুখের সময় কেন, এ হারুন জানে না।

আমি তার চোখে চেয়ে মিষ্টি হাসি। সে হাসিতে শরম, সে হাসিতে আনন্দ।

আমার হাসির কোনও অনুবাদ করতে পারেনি হারুন। আমাকেই বলতে হয়, যে, বাচ্চা হবে বলে সুখের সময়।

—বাচ্চা?

হারুন চকিতে বড় বড় চোখ করে ঘুরে দাঁড়ায়। তার চমকে ওঠা দেখে আমি চমকাই। কারণ এ তো আর আমার দাবি নয়, যে বমি হচ্ছে, মাথা ঘোরাচ্ছে, মনে হচ্ছে বাচ্চা পেটে। এ রীতিমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তারের বলা। এ তো আর মিছে কোনও কথা নয়। হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া।

হারুনের ঠোঁট বেঁকে ওঠে, কেন ওঠে আমি বুঝে পাই না।

কাপড় না পালটে সে ঘর ছাড়ে। তার পেছন পেছন গিয়ে দেখি শাশুড়ির বিছানায় সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে।

কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে।

হারুন বলে, লাগছে।

শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। হারুনের শরীর খারাপ লাগছে, দোলনকে ডেকে কাছে বসতে বলেন। রাণুকে বলেন লেবুর শরবত নিয়ে আসতে, আমাকে বলেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।

সে বলে দিল কিছুর দরকার নেই, মাথায় হাত বুলোনো সে চায় না, শরবত সে খাবে না, তার কাছে কারও বসতে হবে না, একা একা সে শুয়ে থাকবে, কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকলে তার ভাল লাগবে, কেউ যেন তাকে কোনও বিরক্ত না করে।

আমি ধীরে, কাঞ্চিপুরম পরা, মুখে রং মাখা, বেরিয়ে যাই শাশুড়ির ঘর থেকে, আমার ঠাঁই ওই একটি জায়গায়, জানালায়, যেখানে দাঁড়িয়ে এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে মনের সব কথা বলতে পারি। কিন্তু আকাশও সম্ভবত বোঝে না, হারুনের কী হয়েছে, সে কি কারও প্রেমে পড়েছে হঠাৎ, ওই লিপি নামের মেয়েটিকে কি হঠাৎ হারুনের আবার ভাল লাগতে শুরু করেছে!

আমার বুকের ভেতর চিনচিন করে ব্যথা হতে থাকে। এত বদলে যায় কেন মানুষ। হারুন নিজেই বলেছে, লিপিকে সে আর ভালবাসে না। হতেও তো পারে, পুরনো প্রেমের শিকড় আবার লকলক করে বেড়ে ওঠে, ডাল পাতা গজিয়ে ওঠে। আরজু ছোটবেলায় এক মেয়েকে ভালবাসত, বড় হয়ে সেই মেয়েটিকে সে ভুলেই গিয়েছিল, নতুন এক মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম টেম হল, তারপর হঠাৎ একদিন রাস্তায় ছোটবেলার সেই মেয়েটিকে দেখে তার জীবন ওলট পালট হয়ে গেল, নতুন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে তার অনিয়ম হতে লাগল, আরজু ব্যস্ত ছোটবেলায় প্রেমে পড়া সেই মেয়েটির খোঁজ করতে, ওর জন্য বুকের গভীরে এখনও যে ভালবাসা তার আছে, তা বলতে। এমন যে হয় না, তা নয়, হয়। আমার কষ্ট হতে থাকে, জানালায় একা দাঁড়িয়ে নিজের কষ্টগুলো আমি নিজে অনুভব করতে থাকি, কষ্টগুলো স্পর্শ করা হারুনের হয়ে ওঠে না। হারুন হঠাৎ করে যেন বড় দূরে সরে গেছে। বড় একা লাগে আমার। আমি আমার স্বামীর ঘরে, কিন্তু যেন ঘরটিতে আমি জন্ম জন্ম ধরে একা।

হঠাৎ হারুনের চিৎকারে আমি দ্রুত জানালা থেকে সরে যাই, দেখি শাশুড়ির বিছানায় তখনও সে শুয়ে, দোলন পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চাইছিল, ধমকে সে দূরে সরিয়েছে দোলনকে। শাশুড়ি আমাকে দেখে বললেন, বৌমা, ওর কি অসুবিধে হচ্ছে তুমি দেখবে না? কোথায় গিয়ে বসে আছ?

হারুন সাফ সাফ বলে দিল, কিছু হয়নি তার, এমনিতেই সে শুয়ে আছে, আমার কিছু দেখার দরকার নেই। আমি এ ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোনও কাজ

করলে সে স্বস্তি পাবে।

অন্য কী কাজ? রাতের রান্না সব সারা, ঘর দোর ধোয়া মোছা সারা। কোনও কাজ বাকি নেই, রসুনি আর সখিনাও হাসানের ঘরের বারান্দায় বসে গল্প করছে।

—চা টা কিছু খাবে? দেব?

—না।

শাশুড়ি বলেন, জিজ্ঞেস করো কেন, চা করে নিয়ে এসো।

আমি চা করতে রান্নাঘরে যাই। শাশুড়ি, শ্বশুর, দোলন, আনিস আর হারুনের জন্য ট্রে তে করে চা নিয়ে যখন শাশুড়ির ঘরে ঢুকছি, হারুন বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, চা সে খাবে না।

—কী বলেছ তুমি ওকে বউমা?

ট্রে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, দু হাত আমার ট্রেতে, মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়ে, কোনও হাতে অবসর নেই যে ঘোমটা তুলব মাথায়। বলি, কিছু তো বলিনি!

—কিছু নিশ্চয় বলেছ, তা না হলে ওর মন খারাপ কেন।

—আপিসে কোনও কিছু ঘটল কি না। মিনমিন করি।

শাশুড়ি মুখ মলিন করে বললেন, আপিসে কিছু হয়নি, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—তাহলে হয়েছে কী? তোমার সঙ্গে কথা বলছে না, নিশ্চয়ই তুমি কারণ।

আমি কারণ হারুনের মন খারাপের এ ব্যাপারে শাশুড়ি যেমন নিশ্চিত, দোলনও। ট্রেটি টেবিলে নামিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে শাশুড়িকে আর দোলনকে চা দিয়ে, শ্বশুর বসেছিলেন বৈঠক ঘরে, তাঁকে দিয়ে, আনিস ছিল বারান্দায়, দিয়ে বাকি কাপটি হারুনের জন্য নিই। আমাদের শোবার ঘরের বিছানায় সে শুয়েছে, চা নিয়ে পাশে বসি। কোমল একটি হাত রাখি তার পিঠে। পিঠ বেঁকে ওঠে ধনুকের মতো, যেন স্পর্শটি আমার নয়, যেন অচেনা কেউ তাকে বিরক্ত করছে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। কিন্তু এই সন্ধেয় হারুনের তো ঘুমোনোর কথা নয়। সাধারণত এ সময় ফিরে সে বাড়ির সবার সঙ্গে গল্প করে নয়তো টেলিভিশন দেখে। এ সময় চা সাধারণত হারুন খায় না, দিতে চাইলে একদিন বলেছিল, আপিসে প্রচুর চা খাওয়া হয়, এত চা খাওয়া ঠিক নয়, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, ঘরে চায়ের চেয়ে চুমুই ওর পছন্দ। না চা, না চুমু কিছুর জন্যই হারুন এখন আগ্রহী নয়। আমি তার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলি, কি ব্যাপার, চা খাবে না?

—না।

তার না খাওয়া চায়ে আমি দুটো চুমুক দিয়ে বলি, চা টা কিন্তু খারাপ বানাইনি!

চা যে আমি ভাল বানাই, তা নিয়েও হারুনের কোনও উৎসাহ নেই।

এবার চায়ের কাপটি টেবিলে রেখে আমি বলি, দেখ, আমার ভাল লাগছে না তোমার এমন ব্যবহার। কী ঘটেছে তা বল! কেন এমন করছ আমার সঙ্গে তুমি! কার কথা তোমার মনে পড়ছে, কার জন্য আমাকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি! এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আমরা তো সুখী হওয়ার জন্য বিয়ে করেছি। হঠাৎ সবকিছু

এলোমেলো হচ্ছে কেন তোমার, আমাকে বলো। লুকিয়ে কতদিন রাখবে?

হারুন কোনও উত্তর দেয় না। চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

এ ঘরে ভাল যে শাশুড়ি বা দোলনের নাক গলানো নেই। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যেমন ইচ্ছে কথা বলব, কেউ আমাদের কথার মধ্যে বলে বসার নেই, বউমা বা ভাবী, স্বামীর জন্য এই কর, ওই কর। স্বামীর জন্য কি করতে হবে, তা আমি করব। বিয়ের আগে আমরা বেশ সুখী ছিলাম পরস্পরকে নিয়ে। কোনও তৃতীয় মানুষ আমাদের বলে দেয়নি, মন পেতে হলে কী কী করা দরকার। আমরা কারও সাহায্য ছাড়াই, একে অপরকে হৃদয় বিনিময় করেছিলাম খুব সহজে, স্বচ্ছন্দে, নির্বিঘ্নে।

ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে আমি মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে ফেলি। মনে মনে হারুনকে বলি, তাকাও আমার দিকে, দেখ এই সেই শাড়ি যে শাড়িটি তুমি আমাকে ভালবেসে দিয়েছিল। দেখ ঠিক তেমন করে খোঁপা বেঁধেছি, যেমন করে বাঁধলে তোমার মনে হয় আমাকে বউ বউ লাগছে, দেখ ঠিক সেই রঙের টিপ পরেছি, যেটি তোমার পছন্দ, দেখো সেই লিপস্টিকটি পরেছি, যেটি পরলে তুমি বল যে চুমু খাবার জন্য উতলা হয়ে ওঠো। দেখ সেই আমি, তোমার ভালবাসার আমি। ধীরে ধীরে আমার চোখ ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে গলা ছুঁয়ে বুক ছুঁয়ে তুমি নিচে নেমে এসো, দেখ আমাদের সুন্দর একটু পুতুল পুতুল সোনামণি ওখানে ঘুমোচ্ছে, খুব আলতো করে স্পর্শ করো আমাকে, আলতো করে, তা না হলে সোনামণির ঘুম ভেঙে যাবে। দেখতে ও কার মতো হচ্ছে, আমার নাকি হারুনের? ছেলে হলে হারুনের মতো ওর চোখদুটি হবে, কপাল হবে, নাক হবে, বাহ। আমি স্বপ্নের সাগরে সাঁতার কাটি একা একা। বাড়ির কাউকে আমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবরটি দিইনি, লজ্জায় চোখ মুখ নুয়ে আসে, চাই হারুনই বলুক সবাইকে।

হারুন আমার দিকে তাকায় না। কাঁধে তার ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, বলো তো কার মতো ও দেখতে হবে?

রা করে না হারুন।

—আমি কিন্তু এখনও কাউকে বলিনি। ওয়ারিতেও কাউকে জানাইনি। কী যে লজ্জা লাগে!

হারুন ধীরে চোখ মেলে। তার চোখের ভাষা আমি পড়তে পারি না। ঠোঁটের কোণে লজ্জারাঙা হাসি আমার লেগেই আছে, এই বল না কার মতো দেখতে হবে, ফিসফিস করে বলি।

ঠোঁট ফুলিয়ে বলি, আমি জানি, তুমি ছেলে চাও, মেয়ে হলে কিন্তু মন্দ হয় না। মেয়ে হলে নাম রাখব ভালবাসা। তুমি রাজি?

হারুনের চোখে সেই না বোঝা ভাষা।

—দেখ, তুমি কিন্তু একটুও আনন্দ করছ না। আমি কি একা একা আনন্দ করতে পারি? এখনও কেউ জানে না, তুমি কি বড় কোনও অনুষ্ঠান করে জানাতে চাও, নাকি? ধুম করে বলে ফেলো না! অন্তত তোমার মাকে বলো।

হারুনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসি আমি, একটু চুমুর আশায়। ঘরে তো

হারুনের চা নয়, চুমুই পছন্দ।

হারুনের ঠোঁট আমার ঠোঁটের দিকে এগোয় না। চোখ তার স্থির হয়ে থাকে, যেন চোখ নয়, দুটো পাথর। হারুন এবার মুখ খোলে। বলে, কার মতো দেখতে হবে বলে তোমার মনে হয়?

—তোমার মতো, আমি তার কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে হেসে বলি, ঠিক এরকম চোখ, কপাল, নাক, ঠোঁট। আমার একটি আঙুল ওর কপাল ছুঁয়ে নাক ছুঁয়ে ঠোঁটে নামে।

আমার সে আঙুলকে সরিয়ে দিয়ে হারুন বলে, কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।

—ডাক্তারের কাছে, কেন?

—গিয়েই দেখবে, কেন।

—কোন ডাক্তার? সেই সোফিয়া? ডাক্তার তো বলল, তিন মাস পরে যেতে। কালই কেন?

হারুন হঠাৎ উঠে বসে। বলে, বাচ্চা নষ্ট করতে হবে।

—মানে?

—মানে কিছু না। বাচ্চা নষ্ট করতে হবে।

—এ আবার কেমন কথা বলছ তুমি?

—কেমন কথা নয়। যা বলছি ঠিক বলছি।

—কেন বাচ্চা নষ্ট করতে হবে।

আমার গা কাঁপে। হাত পা শিথিল হয়ে আসে। হঠাৎ চোখের সামনে দুলে ওঠে পুরো ঘর, বসে দুহাতে বিছানার তোশক আঁকড়ে ধরি। ভেতরে তাণ্ডব কিছু হচ্ছিল, কেঁদে উঠি হু হু করে, আমার কান্নার দিকে হারুন ফিরে তাকায় না। আমাকে সে স্পর্শ করে না। বলে না, লক্ষ্মীটি কেঁদো না। চোখের জল দু হাতে মুছে আমি হারুনের দু বাহু চেপে বলি, আমাদের প্রথম বাচ্চা তুমি নষ্ট করতে চাচ্ছ? কী হয়েছে তোমার, বল। কী ঘটেছে হঠাৎ? হঠাৎ এত অন্যরকম হয়ে উঠছ কেন? কে তোমাকে এসব বুদ্ধি দিচ্ছে? কার দেখা পেয়েছ তুমি, কাকে দেখে তুমি আমাদের প্রথম বাচ্চার খবর শুনে মোটে তো আনন্দ করোনি, এখন বলছ, বাচ্চা নষ্ট করবে?

হারুন আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বলে, দেড়মাসে আবার বাচ্চা হয় নাকি?

—তার মানে?

—মানে যা, তাই।

—বুঝতে পারছি না কী বলছ তুমি।

—বুঝতে ঠিকই পারছ।

—ডাক্তার তো বললই পেটে বাচ্চা। অন্য কিছু তো বলেনি। ডাক্তারের কথা তুমি বিশ্বাস করছ না?

—তা বিশ্বাস করছি।

—তবে কেন বলছ, দেড়মাসে বাচ্চা পেটে আসে নাকি?

—আসে না বলেই বলছি।

—তা হলে কী এসব। ডাক্তার ভুল বলেছে?

—ডাক্তার ভুল বলেনি। তোমার পেটে বাচ্চাই।

—তবে?

—তবে?

—তবে আর কি? ওই বাচ্চাটি নষ্ট করতে হবে।

—কেন?

—কারণটিও নিশ্চয়ই তুমি জানো।

—কী কারণ?

—এত অবুঝের ভান করছ কেন? তুমি জানো না কি কারণ? এ বাচ্চা দেখতে কার মতো হবে বলছিলে না? তুমি ভাল করেই জানো, এ বাচ্চা দেখতে মোটে আমার মতো দেখতে হবে না।

—কেন হবে না?

—হবে না কারণ এটি আমার বাচ্চা নয়।

—তবে এ কার বাচ্চা? এ বাচ্চা কোত্থেকে এল?

—কোত্থেকে এল, সে তুমিই ভাল জানো।

—আমি জানি, তুমি জানো না?

—আমি জানব কেন? আমি জানব কেন কার বাচ্চা তুমি পেটে নিয়ে আমার বাড়ি এসেছ, বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি করেছ? বিয়ের জন্য এত তাড়াহুড়ো ছিল তোমার, তা কি আমি আগে বুঝেছি, কেন! এখন তো সব স্পষ্ট হয়েছে।

বিছানা থেকে ধীরে আমার শরীর গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। কাঞ্চিপুরম শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে খসে পড়ে। হারুন আমাকে সন্দেহ করছে। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করেছি, বিয়ের দেড়মাস পর বলেছি আমার পেটে বাচ্চা, এতে হারুনের সন্দেহ হচ্ছে আমি বাচ্চা পেটে নিয়েই তাকে বিয়ে করেছি। আমার দুটো হাত দু পাশে অবশমতো পড়ে থাকে, গায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই উঠে দাঁড়াবার। বুকের মধ্যে হু-হু করে মরুর হাওয়া উড়ছে। খাঁ খাঁ করছে ভেতরের সব। যেন হঠাৎ এক ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার বসত বাড়ি, আমার স্বপ্নের দালানকোঠা। কিছু নেই এখন, ধু ধু বালুর ওপর একা পড়ে আছি আমি, একা, জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও।

চব্বিশ বছর বয়সী অক্ষতযোনি প্রথম আমি স্বামীর সঙ্গে শুয়েছি। কিন্তু হারুনের মনে ঘন হয়ে একটি মেঘ উড়ছে—বিয়ের সেই রাত থেকেই, বিছানার চাদর সে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী দেখছ?

কপাল কুঁচকে বলেছিল, রক্ত পড়ল না কেন?

রক্ত কেন পড়েনি আমাদের প্রথম মিলনে সে আমি নিজেও জানি না, তবে আমার যৌনাঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। যন্ত্রণায় আমি কুঁকড়ে ছিলাম, বারবার স্নানঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে যন্ত্রণা কমাতে চেষ্টা করছিলাম।

—সেদিন তুমি মিথ্যে বলেছিলে যে তোমার যন্ত্রণা হচ্ছিল, মিছিমিছি ব্যথা কমাবার ওষুধ খেয়েছ। হারুনের অবিশ্বাসী চোখে আমাকে দেখি, দেখে আমারও খুব অবচেতনে নিজের ওপর সন্দেহ জাগে। সে কার কথা ভাবছে, সে তো আমার বন্ধুদের মধ্যে চিনত ওই সুভাষ, আরজু, চন্দনা আর নাদিরাকে। আর চিনত শিপ্রাকে। হারুন আমার বন্ধুদের নিয়ে যথেষ্ট হই-হল্লা করেছে বিয়ের আগে। বন্ধুদের নিয়ে যখন তখন তার আপিসে গেছি, হারুন গাড়িতে করে সবাইকে নিয়ে চলে গেছে দূরে, যেতে যেতে গারো পাহাড়ে। হারুন এত আমুদে মানুষ ছিল যে সুভাষ আর আরজু হারুনকে বেশ পছন্দ করেছিল। আমাকে বারবারই বলেছে ওরা, ঝুমুর তুই একটা জাত ভদ্রলোক পেয়েছিস।

ভদ্রলোক আমার দরকার নেই, আমি ভালবাসা পেলেই সুখী।

আমি যে হারুনকে নিয়ে সুখী হব, হারুন আমাকে বিষম ভালবাসে এ কথা এক বাক্যে বন্ধুরা সবাই স্বীকার করেছে। ঝুমুরের ভাগ্যটা ভাল, নাদিরা বলেছে, আমার কপালে হারুনের মতো কেউ জুটলে এক্ষুনি ঝুলে পড়তাম। এসব কথা হারুনের আড়ালে কেবল নয়, সামনেও বলেছে। যেহেতু চন্দনা আর নাদিরা দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার কোনও যুক্তি নেই, হারুন নিশ্চয় ভাবছে সুভাষ বা আরজুর কথা, আর কার কথাই বা ভাবতে পারে, এ দুটো ছেলেকেই সে দেখেছে আমার সঙ্গে। হারুনের অবিশ্বাসী চোখ আবার আমাকে দেখে, দেখে সুভাষ বা আরজুর সঙ্গে কোনও নির্জন নিরালায়, কেউ দেখছে না, সঙ্গমে লিপ্ত আমি, আমার জরায়ু উপচে পড়ছে সুভাষ বা আরজুর বীর্যে। আর আমি অসতর্ক মেয়ে গর্ভবতী হয়েই প্রেমিক হারুনকে কায়দা করে বিয়ের কথা বলছি। আমাকে বিয়ে করতে তাকে বাধ্য করছি।

হারুন ঠিক এভাবেই ভাবছে, এ চোখেই আমাকে দেখছে। ওই দুটো পাথর চোখ, যে চোখ দুটো এখন জ্বলন্ত আগুনের মতো, আমার দিকে, চোখ দুটো দেখছে আমাকে আমার গর্ভের ভেতর সুভাষ বা আরজুর বীর্য থেকে গড়ে ওঠা ভ্রূণ, দেখছে ভ্রূণ একটু একটু করে বড় হচ্ছে, হাত পা মেলে বড় হচ্ছে, চোখ ফুটছে, দিব্যি আরজুর চোখের মতো পিট পিট করা চোখ, সুভাষের নাকের মতো ভোঁতা নাক। হারুনের চোখে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমি এক চতুর স্বৈরিণী, নিজের ওপর ঘৃণা হতে থাকে আমার। হারুন নিশ্চয়ই এক স্বৈরিণীকে করুণা করে বিয়ে করে নিজের উদারতা আর মহানুভবতায় নিজেই মুগ্ধ হচ্ছে। হারুনের চোখে নিজেকে দেখতে দেখতে এখন এমন মনে হচ্ছে আমার যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে সুভাষ বা আরজুর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক আমার হয়নি। আমার মিথ্যে মনে হয় যে হারুনের সঙ্গে শরীরের গভীর গোপন খেলা প্রথম খেলেছি আমি।

মেঝে থেকে উঠে স্নানঘরে যাই, ছিটকিনি এঁটে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াই। আমার ভয় হতে থাকে, ভয় হতে থাকে আমি বিয়ের আগে সুভাষের সঙ্গে শুয়েছি বলে, ভয় হতে থাকে আরজুর সামনে আমি কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়েছি বলে। হারুনকে লুকিয়ে এসব নোংরা কাজ করায় আমার ভয় হতে থাকে, হাতে নাতে

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। হারুনের কাছ থেকে মুখ লুকোতেই স্নানঘরে দৌড়ে আসা আমার। অধম আমি, পাপী আমি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি, এই আমি, আমি ঝুমুর, গর্ভবতী হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা ঝুমুর, স্বামী ঠকানো স্ত্রী আমি, হারুনের জন্য হতে থাকে মায়া, আর নিজের ওপর হতে থাকে প্রচণ্ড ঘৃণা, রাগ হতে থাকে সুভাষের ওপর, আরজুর ওপর। ওদের আমার গোপন প্রেমিক বলে মনে হতে থাকে, আমার বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে আজ রাতে সুভাষ পাঁচিল টপকে এ বাড়িতে আসবে, ওর সঙ্গে এই বিছানাতেই আমার মিলন হবে, বিশ্বাস হতে থাকে যে আজ রাতে আরজুর সঙ্গে অন্ধকার বারান্দায় আমার দেখা হবে, আরজু ওই বারান্দায় আমাকে শুইয়ে আমার জরায়ুতে ওর বীজ পুতে যাবে। কেউ জানবে না।

ওদের নাম উচ্চারণ করা দূরে থাক, ওদের কথা ভাবলেই এখন গা শিউরে ওঠে আমার ভয়ে। লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে। আমার রঙিন হয়ে ওঠা হারুন লক্ষ করে। হারুনের চোখে চোখ রেখে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না, যদিও আমি হারুনকে ভালবাসি, এক হারুনকেই ভালবাসি। আমাদের বিয়ের রাতে বিছানায় রক্ত খুঁজে না পেলেও তার সঙ্গেই শরীরের গভীর গোপন খেলা শিখেছি। সময়ের আগে তাকে হুট করে বিয়ে হয়তো করেছি, এর পেছনে কাজ করেছে বাবার সঙ্গে আমার অলিখিত একটি বাজি, আর কিছু নয়, আর কোনও গোপন অভিসন্ধি ছিল না আমার, কোনও অবৈধ ভ্রূণকে বৈধ করার বাসনা আমার ছিল না, ছিল না জানি, তারপরও মনে হয়, ছিল। নিশ্চয়ই ছিল।

হারুন কি জানে তাকে আমি ভালবাসি! হারুন কি জানে তাকে ভালবাসি বলে তাকে আমি হারুন বলে ডাকা ছেড়েছি! হারুনকে ভালবাসি বলে প্রতিদিন ভোরবেলা ইচ্ছে না করলেও আমি বিছানা ছাড়ি, ইচ্ছে না করলেও বাড়ির সবার জন্য রান্না করি, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে ঘোমটা মাথায় নিরুচ্চার নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকি, ইচ্ছে না হলেও হাসান হাবিব দোলন রানু এদের সঙ্গে গল্প করি, সবকিছুর উদ্দেশ্য হারুন যেন আমাকে ভালবাসে, সে যেন তৃপ্ত হয় আমার আচরণে। হারুনের সঙ্গে সুখের একটি সংসার করার প্রচণ্ড আগ্রহ আমার, কারণ হারুন আমার জগত জীবন যা কিছু। বিয়ের আগে একবার হারুন তার এক সহকর্মীর বাড়ি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, সহকর্মীটি বউ নিয়ে দুদিনের জন্য ঢাকার বাইরে গিয়েছিল, চাবি ছিল হারুনের কাছে। সেই খালি বাড়িতে ঢোকার পর হারুন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এ বাড়িতে কোনও উপদ্রব নেই। কেবল আমরা দুজন।

—তো?

—আজ খুব আদর করব তোমাকে।

—কি রকম আদর?

—সবটুকু আদর।

বলেছিলাম, সবটুকু মানে?

—সবটুকু মানে সবটুকু।

আমি ছিটকে গিয়ে বলেছিলাম, আমার খুব কাজ আছে বাড়িতে। এক্ষুনি যাব।

হারুন সম্ভবত বুঝেছিল, তার আমন্ত্রণে আমার কোনও সায় নেই। বুদ্ধিমান ছেলে, বলেছিল, আরে বস, তুমি কি ভেবেছ সত্যি সত্যি কিছু করব নাকি? যা হবে, সব বিয়ের পর হবে। বলেই সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে রহস্যের হাসি হেসেছে। হারুনের দিকে সেদিনও তাকাতে আমার বড় লজ্জা হচ্ছিল। আমি যখন লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিলাম জড়সড়, হারুন আমার কাছে এসে পিঠে হাত ঝুলিয়ে বলেছিল, হেসে, তোমাকে পরীক্ষা করলাম।

শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত হল আমার। আমাকে হারুন পরীক্ষা করেছে, ব্যাপারটির মাথা মুণ্ডু কিছুই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি।

—পরীক্ষা করছ মানে?

হারুনের ঠোঁটে তখন আর রহস্যের হাসিটি নেই, তৃপ্তির হাসি।

তুমি যে খুব ভাল মেয়ে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। হারুন বলেছে, ওই তৃপ্তির হাসিটি ঠোঁটে নিয়ে।

হারুন সেদিন আমাকে বারবারই ভাল মেয়ে, সতী নারী ইত্যাদি বলে ডেকেছে। শুনে বড় অস্বস্তি হয়েছে আমার। কারও সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক হলেই সে মেয়ে খারাপ, আর না হলেই ভাল, এই বিচার মানতে আমার মন সায় দেয়নি। শিপ্রার সঙ্গে দীপুর শরীরের সম্পর্ক ছিল বিয়ের আগে থেকেই, শিপ্রা নিজে সে কথা আমাকে বলেছে, সম্পর্ক ছিল বলে কি শিপ্রা খারাপ? শিপ্রা যদি খারাপ হয়, তবে দীপুও খারাপ। আমি কিন্তু ও দুজনের কাউকে খারাপ বলতে মোটেও রাজি নই। বরং আমার চেনা দুজন সৎ এবং ভাল মানুষের উদাহরণ যদি চাওয়া হয়, আমি শিপ্রা আর দীপুর কথা প্রথম বলব।

সেদিন, যেদিন সহকর্মী-বন্ধুর খালি বাড়িতে হারুন আমাকে চুমু খাচ্ছিল, আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আমার শরীর গোপনে গোপনে ভিজে উঠছিল। বড় ইচ্ছে করেছে হারুনের ওই হাতটি আমার পিঠ থেকে উঠে এসে আমার কাঁধে, বুকে সারা শরীরে হেঁটে বেড়াক। যদি সেদিন বাড়ি যাবার তাড়া আমার না থাকত, আমি হারুনের প্রস্তাবে সাড়া দিতাম। কেন নয়, তার স্পর্শে যদি আমার এই সোমত্ত শরীরে জোয়ার ওঠে, কোনও এক নিরালায় সবটুকু আদর করার প্রস্তাব যদি সে করেই বসে, আমি যদি শরীর ভরে তার সেই আদর গ্রহণ করি, তবে আমি কেন খারাপ মেয়ে হব! কী কারণ, আমি তো সেই আমিই। একই আমি।

বন্ধুর বাড়িতে হারুন অনেকক্ষণ আমাকে বসিয়ে রেখেছিল। কীসের এত তাড়া? বারবারই জিজ্ঞেস করেছিল।

—সুভাষের বাড়ি যেতে হবে, ওর মা আমাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবেন।

—এ কোনও কথা হল? হাসপাতালে তো আর কাউকে নিয়ে গেলেই হয়।

—হয়, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

চেয়েছেন বলেই কি আমার দৌড়তে হবে, না বলে দিলেই তো হয়। ব্যস্ত বলে দিলেই তো হয়।

হয়। তা হয়। হারুন ভুল বলেনি। আমি যাব না বলে দিলে কাকিমা অন্য

কারুকে যোগাড় করে নয়তো একাই হাসপাতালে যাবেন, যদি না পারেন, যাবেন না। না গেলে কাকিমা মরে যাবেন না। কাকিমা বেঁচে থাকার মানুষ। দুঃখ কষ্ট অসুখ বিসুখ সব ধারণ করার মানুষ। ছোটবেলা থেকেই কাকিমাকে দেখে আসছি, আমার নিজের মায়ের চেয়ে কাকিমা আমাকে কম স্নেহ করেননি। কাকিমারা, আমি যখন ইস্কুলে পড়ি, সুভাষও ইস্কুলে, থেকেছিলেন আমাদের বাড়িতে দুমাস। সেই সময়ই সুভাষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সুভাষ বয়সে আমার চেয়ে ষোলদিনের বড়, অনেকটা যমজ ভাই বোনের মতো আমরা বড় হয়েছি। নিতুন কাকা যখন ওয়ারি ছেড়ে কলকাতা চলে যেতে চেয়েছিলেন, বাড়ি বিক্রি করার জন্য হন্যে হয়ে লোক খুঁজছিলেন, বাবাকেও বলেছিলেন, তুমিই বাড়িটা নিয়ে নাও, অল্প দামেই দিচ্ছি, বাবা নিতুন কাকার বাড়ি কেনেননি, বরং কাকাকে উলটো টাকা পয়সা দিতে চেয়েছিলেন, দরকার হলে। নিতুন কাকা বাবার ছোটবেলার বন্ধু, এক ইস্কুলে এক ক্লাসে লেখাপড়া করেছেন, লেখাপড়া করে দুজনই মাস্টার হয়েছেন ওয়ারির ইস্কুলের। চোখের সামনে বন্ধুটি নিজের বসতভিটা ফেলে চলে যাবেন, এ বাবার সয়নি। কিন্তু নিতুন কাকা জলের দরে অন্য এক লোকের কাছে বাড়ি বিক্রি করে যখন যশোর যাবার বাসে উঠলেন, ওই বাসেই বুকে ব্যথা শুরু হয় কাকার, যাত্রা ভঙ্গ করে তিনি বিশ্রাম নিতে আমাদের বাড়িই উঠলেন, ব্যথা কমলে তিনি পরদিন রওনা দেবেন, এমন ইচ্ছে। পরদিন এল, কিন্তু পরদিন বাসে ওঠার শক্তি কেন, বিছানা থেকে ওঠার শক্তিই আর ছিল না। নিতুন কাকার অমন আকস্মিক প্রস্থানের পর কাকিমা তার দুই ছেলে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই দুমাস কাটালেন। বাবা বলেছিলেন, নিজের বাড়ি সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ, এখন তো ওই টাকার দ্বিগুণ দিলেও বাড়িটি ফেরত পাবে না। কলকাতা যাওয়া নিয়ে বাবা প্রায়ই বলতেন, ঢাকায় কষ্ট আছে, কলকাতায় নেই? আছে। ওখানে তোমাদের আত্মীয় স্বজন আছে জানি, এখানে আমাদেরই না হয় আত্মীয় ভেবো। কাকিমা দুমাস পর আমাদের বাড়ির কাছেই একটি বাড়ি ভাড়া করে নিলেন, তিনি আর যেতে চাননি কলকাতা, নিতুন কাকার স্মৃতি নিয়ে ওয়ারিতেই বাকি জীবন কাটাবেন স্থির করলেন। সেই থেকে বাবাই অনেকটা নিতুন কাকার স্ত্রী পুত্রের অভিভাবকের মতো। শেকড় উপড়ে চলে যেতে চাওয়া সংসারটিকে বাবাই স্নেহমায়া দিয়ে আগলে রেখেছেন। সুভাষের বাড়ির সবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক পাড়া-পড়শির নয়, অন্যরকম। আমাদের নিকটাত্মীয়ের অনেকের সঙ্গে এমন সম্পর্ক আমাদের নেই। এখনও কাকিমার যে কোনও প্রয়োজনে আমরাই পাশে দাঁড়াই। কাকিমা নিজে ঘরে বসে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। ছোট ছেলে সুজিতকে ভাল একটা ইস্কুলে দিয়েছেন। অনটনের সংসার যদিও, কাকিমা হাল ছাড়েননি। সুভাষ কলেজে না ভর্তি হয়ে চাকরিতে ঢুকতে চেয়েছিল, বাবাই কলেজ পড়ার টাকা দিয়েছেন ওকে।

কলেজ পাশ করে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে, এম এ পাশ করে বেরিয়েছে। এই সুভাষ যদি আমাদের ঘরের ছেলের মতো না হয়, হবে কে? আরজুর সঙ্গে সুভাষেরই আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম কলেজে ওঠার পর। সেই আরজুর

সঙ্গে সুভাষের বন্ধুত্ব এখন আমার চেয়ে কম ভাল নয়। উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয় না, এ কথা মিথ্যে প্রমাণ করেছে আরজু আর সুভাষ। আপাদমস্তক ভদ্র ছেলে আরজু, লাজুকও বটে। গোপনে সে সুভাষের হাতে টাকা দিতে চেয়েছে, সুভাষ নেয়নি। কিন্তু আরজুর গুলশানের বাড়িতে হানা দিয়ে দুপুরের খাবার সাবাড় করা আমাদের অনেকটা নিয়মেই দাঁড়িয়েছিল। আরজুর পিঠ চাপড়ে কথা বলা, ওর চুল টেনে দেওয়া, ওর বাচুবানকা দোস্ত নিয়ে মজা করেছি কম নয়। আরজুকে কখনও পুরুষমানুষ বলে আমার আলাদা করে মনে হয়নি। ওর হাতে হাত রাখলে আমার ভেতর ঘরে জল পতনের শব্দ কখনও শুনিনি, সুভাষের সঙ্গে যেমন শুনি না। চন্দনা আর নাদিরার চেয়ে পৃথক কিছু বলে ওদের আমার মনে হয়নি।

বন্ধুত্বের সম্পর্কটিই তো এরকম, লিঙ্গোর্ধ্ব সম্পর্ক। দলবল নিয়ে হইচই করা মেয়ে আমি। সেই আমি হঠাৎ এক ব্যবসায়ীর প্রেমে পড়লাম। অবশ্য এই প্রেমে পড়া এই ভাবনা থেকে নয় যে আমি কোনও বিত্তবান স্বামী চাই। হারুনের বিত্তের খবর মোটেও আমার জানা ছিল না যখন তার কণ্ঠস্বর আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তার কথা বলার কৌশল, এখনও মনে হলে, শিহরিত হই। কৌশলই তো, কৌশলই মনে হয়। এখন হারুন সেরকম কথা বলে না আর, সে রকম ভেজা কণ্ঠে, সেরকম আবেগ আর ভালবাসার জলে ভেজা।

এলোমেলো লাগছে সব। মাথা ঝিমঝিম করছে। ভাবনাগুলোও ছিটকে পড়ছে এদিক থেকে ওদিকে। জীবন কি এরকমই হঠাৎ কোনও এক তুমুল ঝড়ের মধ্যে পড়ে! এত করে সাজানো জীবনও, না চাইতেই!

৬

হারুন আমাকে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে যাচ্ছে ধানমণ্ডির ক্লিনিকে। বাড়িতে জানে, আমাকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে সে। যাবার আগে আমি বলেছি হারুনকে, এ আমাদের প্রথম সন্তান, এ কাজটি তুমি কোরো না। বারবার বলেছি, তুমি ভুল করছ, তোমার নিজের ভ্রূণকে তুমি নিজে সন্দেহ করছ। অযথাই একটি ভুল বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছ তুমি। আমাকে চরম অপমান করছ তুমি হারুন। আমার কোনও আকুতি তাকে স্পর্শ করেনি। যখন তার দুটো হাত আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে বলছিলাম, আর যাই কর, এ কাজটি তুমি কোরো না—হাত দুটো এক ঝটকায় সে সরিয়ে নিয়েছে। আমাকে ঠেলে পাঠিয়েছে আলমারির সামনে শাড়ি পালটাতে, ক্লিনিকে যাবার জন্য তৈরি হতে।

আলমারির দরজা ধরে হু হু করে কেঁদে উঠেছিলাম, হারুন আমার পরনের শাড়ি টেনে খুলে কর্কশ কণ্ঠে বলেছিল, শাড়ি পরে নাও শিগগির, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি হারুনের একটি হাত টেনে আমার পেটের ওপর রেখে বলেছি, এ

তোমার বাচ্চা, আর কারও নয়। বিশ্বাস কর। নিজের বাচ্চাকে তুমি মেরে ফেলতে চাইছ!

—হ্যাঁ চাইছি। হারুন কঠিন গলায় বলেছে।

—এ তো আমারও বাচ্চা। আমার কি কোনও অধিকার নেই? আমি কিছুতেই যাব না অ্যাবরশন করাতে। হারুনের কথা, যেতে হবে, যেতে হবেই। আমি তার স্ত্রী, সে যা আদেশ করবে, তা আমার পালন করতে হবে। করতে হবেই।

শেষে শায়া ব্লাউজ পরা আমি যখন হারুনের পায়ের ওপর কেঁদে পড়লাম, বললাম না তুমি আমাদের বাচ্চাকে নষ্ট করতে পারো না। এত বড় অন্যায় কাজ তুমি কোরো না। হারুন আমার দুহাত থেকে নিজের পা দুটো সরিয়ে নিয়ে বলেছে, হয়েছে হয়েছে, নাটক কোরো না।

শুরু থেকে শেষ অবধি আমার সঙ্গে হারুনের সম্পর্ককে হারুন নাটকই ভেবেছে।

এরপর চোখে যত জল ছিল মুছেছি। নিঃশব্দে শাড়ি পরেছি। নিঃশব্দে হারুনের পেছন পেছন ক্লিনিকে গিয়েছি। অপারেশন থিয়েটারে নেবার আগে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাচ্চা কেন নষ্ট করতে চাইছেন?

আমি উত্তর না দিয়ে হারুনের দিকে তাকিয়েছি। তার কাছে সমস্ত উত্তর কি না।

হারুন ডাক্তারকে বলেছে, আমাদের একটু অসুবিধে আছে ঠিক এ মুহূর্তে বাচ্চাটি নিতে।

—কেন?

—আছে।

—প্রথম বাচ্চা কেউ কি খামোকা ফেলে দেয়?

—দেয় না। কিন্তু আমাদের আর কোনও উপায় নেই।

হারুণ মুখ করুণ করে ডাক্তারের দিকে তাকায়।

ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ও তো আপনার স্ত্রী, নাকি স্ত্রী নয়!

—হ্যাঁ স্ত্রী।

আমি যে হারুনের স্ত্রী এতে কোনও ভুল নেই। তবে, ডাক্তারের জিজ্ঞাসা, স্ত্রী হওয়ার পরও কেন আমার বাচ্চা নষ্ট করতে হচ্ছে!

হারুন হাসে, রহস্যের সেই হাসিটি। আমার ভয় হয়, এই বুঝি সে বলবে, এই বাচ্চা তার নয়।

নিঃশব্দে একটি ভয় আমি পুষে রাখি।

নিঃশব্দে একটি ঘৃণা।

নৈঃশব্দ্য আমাকে কালো চাদরে ঢেকে রাখে। মাথা থেকে পা অবধি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে কীসে যেন। যেন আমার ত্বকের এই আবরণটির ভেতরে আমি বলে কেউ নেই। আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি। আমি বেরিয়ে গেছি আমার ত্বকের খোলস থেকে, বহুদূরে কারও নাগালের বাইরে আমি। আমি কোথায় আমি জানি না।

অবশ করা হয়নি আমাকে। জরায়ু খুঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে আসা হয়েছে ভেতরে যা

কিছু ছিল, একটি ফুটফুটে শিশুর মুখ জমাট রক্ত হয়ে বেরিয়ে এল, একটি অবুঝ শিশুর হাত পা তীব্র লাল স্রোতের সঙ্গে বেরিয়ে এল, আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম রক্তের দলার দিকে। হৃদয় খুঁড়লে সম্ভবত এমনই রক্তের দলা বেরোবে।

অ্যাবরশন হয়ে যাওয়ার পর, ডাক্তার যখন নিশ্চিত করে বললেন আমার জরায়ু এখন ফাঁকা, কিছু নেই ওতে, ভ্রূণের এক কণা অবশিষ্ট নেই, হারুণ হেসে, ডাক্তারের টাকা মিটিয়ে বিছানায় আমার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ঘণ্টা দুই পর প্রায় কোলে করে তুলে গাড়িতে ওঠাল। বাড়িতে এনে বিছানায় শুইয়ে ফলের রস তুলে দিল মুখে। বাড়িতে শাশুড়ি আর দোলনকে বলল আমার অসুখ, আমাকে যেন নিয়মিত ফলের রস, গরম দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। অসুখের কথা শুনে এক এক করে সবাই পাশে এসে বসেছে। হারুন ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তেমন কিছু না, পেটে ব্যথা, ওষুধ খেলে সেরে যাবে। আপিসে যাবার সময় আমার ঠোঁটে আলতো করে একটু চুমু খায়।

অনেকদিন তার এই আদর আমি পাইনি। অনেকদিন বুঝিনি, হারুন আমাকে ভালবাসে। হারুন নিশ্চয়ই জানে আমার ভেতরে সামান্য হলেও সততা আছে, তা না থাকলে সে আমাকে ভালবাসবে কেন! সততা যদি থাকেই, তবে হারুন কেন এ কথা ভাবে যে, আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি, আমি অন্যের ভ্রূণ গর্ভে নিয়ে হারুনের বলে চালিয়ে দিয়েছি। তবে তো আমি জোচ্চোর, চালিয়াত, ধুরন্ধর এক মেয়ে, বেশ তো তাই যদি আমি, কেন সে বলছে না বেরিয়ে যেতে তার বাড়ি থেকে, কেন সে ঘাড় ধরে আমাকে রাস্তার আবর্জনায় ছুঁড়ে দিচ্ছে না, কেন সে উচ্চারণ করছে না তালাক তালাক তালাক। তালাকের ব্যবস্থা না করে হারুন বরং ওষুধের ব্যবস্থা করেছে। দিনে চার বেলা কী কী ওষুধ খেতে হবে আমার, তা ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দেখে কিনে বিছানার পাশের ছোট টেবিলটিতে সাজিয়ে রেখেছে। পই পই করে আমাকে বলেছে, যেন ভুলে না যাই কখন কোন ওষুধ আমাকে খেতে হবে। হারুন কি আমাকে এমন সেবা করে বোঝাতে চাইছে আমার সকল পাপ সে ক্ষমা করেছে। খুব গভীর করে লক্ষ করে দেখেছি, হারুনের ঠোঁটের কোণে রহস্যের সেই হাসিটি আর নেই, একধরনের অহং এসে বসেছে ঠোঁটে। এরকম অহং আমি এর আগে দেখেছিলাম, যখন সাভারে তার কারখানার এক শ্রমিক গোপনে কিছু যন্ত্রপাতি বিক্রি করে ধরা পড়ার পর হারুন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল।

আমার পেটে অসুখ বলে বাড়ির সবাই জানল। দোলন মুখ মলিন করে বলল, ভাবী, বিয়ের পর পর এত অসুখ বিসুখ হওয়া ভাল নয়, স্বামীদের মন উঠে যায়।

দোলন কাগজের মতো শাদা এক মেয়ে। হাসলে ওর গোলাপি মাড়ি বেরিয়ে থাকে। আমার অসুখের কারণে যদি হারুনের মন ওঠে, দোলনের তাতে কী! নাকি দোলন চায় অসুখ বিসুখে না ভুগে আমি যেন আগের মতো কোমরে আঁচল বেঁধে সংসার যেমন সামলাচ্ছিলাম, তেমন সামলে যাই। তেমন সামলে গেলে তার আরাম হয়। বাড়ির সকলেরই আরাম হয়। রসুনির অসুখ করলে শাশুড়িকে দেখেছি বিরক্ত হতে। মনিব বিরক্ত হলে রসুনিকে যে কোনও সময় বিদেয় করে

দেবেন, রসুনির ছিল এই দুশ্চিন্তা। আমার কোনও দুশ্চিন্তা হয় না। দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে একরকম। এখন আর দুশ্চিন্তার লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করার কোনও কারণ নেই। কোথাও কোনও প্রাণ নেই যে গলা টিপে হত্যা করবে কেউ।

রাণুও অসুখ দেখতে এসেছে। বিছানায় আমার পায়ের কাছে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, পেটে ব্যথা কি আমারও কম হয়েছিল। কই, কেউ তো এত যত্ন করেনি!

শাশুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি, তবু দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে রেখেছেন। এত ঘন ঘন অসুখ করে কেন আমার, সে নিয়েই ভাবছেন। সম্ভবত তিনি ভাবছেন আমার অসুখ করার কারণে তার পুত্রধনের শারীরিক তৃষ্ণা মিটছে না।

রসুনি মেঝেয় পাছা পেতে বসে বলে আমার পেটে যদি একটি কাঁঠাল পাতা বুলিয়ে পাতাটিকে পুড়িয়ে ফেলা যায়, তাহলে সব আবার আগের মতো হবে। সব কষ্ট সেরে যাবে আমার।

বিড়বিড় করি, কিছুই আর আগের মতো হবে না রসুনি। যা গেছে, তা গেছেই। কেবল কষ্ট রয়ে গেছে, এ যাবে না।

৭

এই বাড়িটি হারুনের কেনা। দোতলা বাড়ি। বাগানসহ বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি না বলে বরং আমার বলা উচিত স্বামীর বাড়ি। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি দেবর ননদ সঙ্গে থাকলে শ্বশুরবাড়িই বলতে হয়। তা বলিও। তা বলায় হারুন অখুশি হয় না। সবচেয়ে বেশি খুশি হন শাশুড়ি, তিনি নিখুঁত বর্ণনা করেন শ্বশুরের কী প্রতাপ ছিল এককালে।

—প্রতাপ যা ছিল নোয়াখালিতে ছিল, রাণু বলে। বড় প্রতাপশালী কেরানি ছিলেন কি না।

—তবে যে শাশুড়ি বললেন বড় অফিসার!

ঠোঁট ওলটায় রাণু, বল যে মন্ত্রি ছিল।

দোলন গা এলিয়ে আমার অসুস্থ শরীরের পাশে বসে সুমাইয়ার গল্প করে। দোলনের শ্বশুর শাশুড়ি সুমাইয়া বলতে পাগল। ওকে ওঁরা একটুও কাছছাড়া করতে চান না। একদিন সুমাইয়া বাড়ির বাইরে কাটাল, তো শ্বশুর শাশুড়ির ঘুম নষ্ট।

তাহলে কি এই দেড়মাস ধরে ঘুমোচ্ছেন না দোলনের শ্বশুর শাশুড়ি! আমি ভাবি। দোলন মুখ মলিন করে বলে, হারুনের বিয়ে ইত্যাদির কারণে ওকে এ বাড়ি এসে সংসারে সাহায্য করতে হচ্ছে, হারুনই ওকে অনুরোধ করে শ্বশুরবাড়ি থেকে এনেছে, নতুন বউকে সংসারের সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ও ফিরবে শ্বশুরবাড়ি। মন পড়ে আছে ও বাড়িতে, কিন্তু ভাই এর ব্যাপারটাও তো তাকে দেখতে হবে।

দোলন ঘর ছাড়তেই রাণু বলে,

—মন পড়ে আছে না ছাই, খবর নিয়ে দেখ গিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ওকে।

—আরে যাহ্, তা কেন হবে!

—তা না হলে এ বাড়িতে পড়ে আছে কেন!

রাণু এত খবর কী করে রাখে আমি বুঝে পাই না। ঘরের এক কোণে বসে সারাদিন কুরশি বোনে যখন, দেখে মনে হবে সংসারের সাতে-পাঁচে নেই। অথচ কোথায় কী ঘটছে, কার মনে কী, সব ওর কাছে জলের মতো পরিষ্কার। রাণুর মতো খুঁটিনাটি আমার জানতে ইচ্ছে করে না। হারুনের ভালবাসা পেলেই খুশি আমি। রাণুর না হয় ইচ্ছে হয় এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও নিরালায় সংসার পাততে। আমারও ইচ্ছে ছিল অমন। কিন্তু ধীরে ধীরে টের পেয়েছি যৌথ পরিবারের বাইরে হারুন কোনও পরিবারের কথা ভাবে না। না ভাবুক, ভালবাসা থাকলে বাঘের অরণ্যেও বাস করা যায়, না থাকলে ভূস্বর্গেও নয়।

ক্লিনিক থেকে আসার পর গা পুড়ে যাওয়া জ্বর হল আমার। হারুন এই জ্বরো আমাকে বুকে জড়িয়ে রাখে, মুখে ওষুধ তুলে দেয়, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, গালে চুমু খায়, বলতে থাকে লক্ষ্মী সোনা আমার, শিগগিরি সেরে ওঠো। সেরে উঠলে তোমাকে আমি সীতাকুণ্ড পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেরে উঠলে তোমাকে আমি...

—আমাকে তুমি কী?

—দেখই না, কত কী! জীবন তো কেবল শুরু হল আমাদের...

—তাই বুঝি!

ওষুধে কতটা জানি না, হারুণের আদরেই যেন আমি সেরে উঠি, হারুনের স্পর্শ আমাকে একটু একটু করে সুস্থ করে তোলে।

এ বাড়ির কেউ জানে না যে আমার আর হারুনের সন্তানকে সম্প্রতি খুন করা হয়েছে। একটি মৃত্যু ঘটে গেছে অলক্ষে। একটি মৃত্যু আমার ভেতরে গুমরে কাঁদে প্রতিদিন। কেউ শোনে না, টের পায় না। এমনকি হারুনও যখন আমার পাশে ঘনিষ্ঠ শুয়ে থাকে বা মিলনে মগ্ন হয়, ডাক্তার যদিও পনেরো দিন মিলন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, হারুন, চতুর্থ দিন থেকেই মিলন ঘটাচ্ছে, এত যে সে গভীরে যায় তবু টের পায় না। আমি স্বামীকে বাঁধা দিই না মিলন থেকে, অর্থবান চরিত্রবান স্বামীকে সম্ভোগে বাধা দেবে এমন স্পর্ধা কোনও স্বৈরিণীর থাকে না। আমার স্বামী জরায়ু থেকে নিংড়ে বের করে নিয়েছে সন্দেহের বিষ, আমাকে শুদ্ধ করেছে। শুদ্ধ এক নারী ধবল বিছানা থেকে উঠে ঘরময় ধীরে হাঁটে। রান্নাঘরে, সেই পুরনো রান্নাঘরে রসুনের আর রসুনির গন্ধ ম-ম করে যেই ঘর, সেই ঘরে বসে স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের সবার জন্য নাস্তার আয়োজন, তারপর বাড়ি ভর্তি মানুষের জন্য নানা স্বাদের রকমারি খাবার রান্না করে রাতে শুতে যায় শুদ্ধ নারী, শুদ্ধ নারীর শুদ্ধ শরীর নিয়ে শুদ্ধ স্বামী মেতে ওঠে অমল আনন্দে।

আটার গোলার মতো দেখতে হারুনের আনন্দরস ভেতরে কোনও জোয়ার ঘটায় না। ডাক্তার তিন মাসের জন্মনিরোধক দিয়েছেন, প্রতিদিন খাচ্ছি তা।

দোলন দেখে অবাক হয়ে বলেছিল, এসব করছ কী, বয়স তো কম হল না। এখন আবার বাচ্চা হওয়া বন্ধ করছ কেন?

জন্মনিরোধক যত দ্রুত সম্ভব দোলনের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়েছি আমি।

—তুমি কি বাচ্চা চাও না?

—জানি না।

—এখনও জানো না তুমি বাচ্চা চাও কি না! তোমার বয়সে মেয়েদের তিন চারটে বাচ্চা হয়ে যায়, তা জানো!

আমি নখ খুঁটি মন দিয়ে।

মাতৃত্বেই নারীজন্মের সার্থকতা ভাবী। ভাইয়া কি জানে যে তুমি জন্মনিরোধক খাচ্ছ?

—জানে।

—অবাক কাণ্ড! দোলন বলে।

সুমাইয়াকে মুখে তুলে খাওয়াতে খাওয়াতে দোলন বলে, হারুনের বড় শখ একটি বাচ্চার। সুমাইয়ার যেদিন জন্ম হল, সেদিন সে ছোট বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আনন্দে এমন চিৎকার করেছে যে ডাক্তার আর নার্সরা ধরেই নিয়েছিল, হারুনই সুমাইয়ার বাবা, আনিস নয়।

দোলন আমার জন্মনিরোধক খাওয়া আবিষ্কার করার পর শাশুড়িকে দুঃসংবাদটি দিয়েছে। সেই থেকে শাশুড়ি আমাকে বা হারুনকে সামনে পেলেই বলেন, একটা বাচ্চা না হলে চলবে কেন? বিয়ে হয়েছে তো কম দিন নয়। আমাকে নাতির মুখ না দেখে যেন মরতে না হয়।

হারুন চুপ করে শোনে, আর মিষ্টি মিষ্টি হাসে আমার দিকে তাকিয়ে।

চোখের সামনে চাপ চাপ রক্ত, রক্তের দলা কুণ্ডলী পাকিয়ে ধেয়ে আসতে থাকে আমার দিকে, যেন আমাকে এক্ষুনি ঢেকে ফেলবে, আমি লজ্জায় লাল হই না, লাল হই রক্তে। আমাকে ঢেকে ফেলা রক্তে। গর্ভপাতের পর জরায়ুর অসুখে সাতদিন ভুগে যখন বিছানা ছেড়েছি, ইচ্ছে করেছে ওয়ারি যেতে। বাবা মাকে দেখতে, হারুনকে আমার ইচ্ছের কথা বলেছিলাম, যে ওয়ারিতে কদিন থেকে আসি। হারুন আপত্তি করেছে। বলেছে, আমি কোথায় যাব না যাব তা এ বাড়ি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এ বাড়িই এখন আমার বাড়ি, আপন এখন এরাই আমার, হারুন আর হারুনের আত্মীয়রা, এরা যত আমার ভাল চায়, তত আর কেউ চায় না। আমার ভবিষ্যত ওয়ারির কারও সঙ্গে আর জড়িত নয়, জড়িত হারুন এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে। আমি এখন যত না আমার বাবার কন্যা, তার চেয়ে বেশি আমার শ্বশুরের ছেলে-বউ।

আমি ঠিক বুঝে পাই না, হঠাৎ করে আপন কী করে পর হয়, আর পর কী করে আপন! বিয়ে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটি ঘটনা, এটি সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন দিতে পারে, কিন্তু মনেও কি! আমি অবশ্য এর মধ্যে হারুনের আত্মীয়দের আপন বলে ভাবতে শুরু করেছি, কিন্তু কিছুতে মন থেকে ওয়ারির কোনও স্মৃতিই মুছে

ফেলতে পারি না। আমার নিজের বাবা মা বা নূপুর কাউকে আমার পর বলে মনে হয় না। তবু ওয়ারি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। মা একদিন বিকেলবেলা আমার জন্য নারকেলের তকতি, আমের আচার আর এক ঠোঙা আঙুর নিয়ে এলেন এ বাড়িতে। শাশুড়ি রসুনিকে বললেন, বৈঠকঘরে অতিথির জন্য চা-বিস্কুট দিতে। রসুনি ট্রে-তে করে চা বিস্কুট এনে দিল, মা যতক্ষণ ছিলেন, দোলন সুমাইয়ার কথা বলেছে, সুমাইয়া কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন আবার ঘুমোয়, কী খেতে ভালবাসে, কোন খাবার মোটে মুখে দেয় না, কী খেলা খেলতে পছন্দ করে, টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠানটি তার প্রিয় ইত্যাদি। দোলন সুমাইয়াকে বারবার গুঁতিয়েছে মাকে একটি ছড়া শোনানোর জন্য। এসবে সময় গেছে, মাকে জড়িয়ে ধরে আমার কোনও গল্প করা হয়নি, এ বাড়িতে আমি আছি কেমন, আমার সুখগুলো, দুঃখগুলো। মাকে বলা হয়নি গর্ভপাতের কথা, মা জানেন আমার জ্বর হয়েছিল, এটুকুই।

মা চলে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়েছিলাম করিডোরে। বৈঠকঘরের ধার ঘেঁষে এই করিডোরটিতে দাঁড়ালে সামনের চারটে বাড়ির পেছনের দেয়াল চোখে পড়ে, দেয়ালের কিনার ঘেঁষে দুটো সুপুরি গাছ, আর কিছু নয়। দুপুরের খাবার পর বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে, রসুনিও গড়াচ্ছে রান্নাঘরে। বাড়ির যে মানুষটির সঙ্গে আমার সবচেয়ে কম কথা হয়, সেই আনিস এসে করিডোরে একটি চেয়ারে বসে। আমি সরে যেতে নিলে, আনিস বলে, ভাবী বসুন।

আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

দোলন কি ঘুমোচ্ছে, সুমাইয়াও?

জানি ওরা ঘুমোচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস করলাম। আনিসের সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু কিছু না বলাটা অশোভন, সামনে থেকে চলে যাওয়াও অভদ্রতা, কারণ এ বাড়িতে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ও, আনিসের জন্য শ্বশুর শাশুড়ি তো আছেনই, হারুনও বেশ ভাবে।

আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়—আপনার নতুন ব্যবসাপাতির কিছু হল? কোনও এক কোরিয়ান কোম্পানিতে কিছু হওয়ার কথা ছিল, তাই না!

—সে তো বাতিল হয়ে গেছে। এখন চট্টগ্রামে একটি ব্যবসা পাওয়ার সুযোগ আছে, তা আপনার স্বামী জানেন। কবে তিনি কী করবেন।

আনিস, আমার ধারণা হয়, আমার কাছে জানতে চাইছে কবে হারুন ওকে টাকা পয়সা দেবে। আমি ইতস্তত করি, আমি যে জানি না হারুন কবে ওর সমস্যার সমাধান করবে, তা জানাতে ইচ্ছে করে না। স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে সব না জানায় যা সে করছে, করতে চাইছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে লোকের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আনিসকে কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে আমি মৌন থাকি, যেন এই মৌনতার ও অনুবাদ করে নেয় যে শিগগিরই সমস্যার সমাধান হচ্ছে। কিন্তু আমার এই মৌনতার দিকে ঢিল ছুঁড়ে আনিস একেবারে অন্য প্রসঙ্গ টানে—কেন এত উদাস থাকেন আপনি ঝুমুর ভাবী?

আমাকে এ বাড়িতে ভাবী বলেই ডাকে আমার দেবর ননদেরা, কেউ ঝুমুর ভাবী বলে না। আনিসের ঝুনুর ভাবী ডাকটি শুনে আমার চেতনা হয় যে আমার নিজের একটি নাম আছে। আনিস কেবল আমার নামটিই মনে করিয়ে দেয় না, আমি যে অনেক দূর লেখাপড়া করেছি, তাও মনে করায়।

তাকাই আনিসের দিকে। লম্বা চওড়া বিশাল পুরুষ আনিস। ফর্সা গোল মুখে কালো চিকন মোচ মানিয়ে যায়, কিন্তু দাড়ি গজাচ্ছে গালে, সেটিই কেবল বেমানান। বুকের কালো লোমে হাত বুলোতে বুলোতে বলে ও, চাকরি-বাকরি করছেন না কেন?

এরও কোনও উত্তর দিই না আমি।

আনিস বলে, লেখাপড়া করে তাহলে লাভ কী হল বলুন। ঘরে বসে রান্না করার জন্য এম এ, বি এ পাশ করতে হয় নাকি? ঠোঁটে ওর ঈদের চাঁদের মতো চিকন বক্র হাসি।

এর উত্তর আনিস আমার কাছ থেকে কি আশা করছে আমি জানি না। বলা যেত, রান্না করতে হলে রসুনির মতো কিছু পাশ না করলেই হয়, কিন্তু রসুনিকে হারুন কি কখনও বিয়ে করত? করত না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েছি বলে হারুন আমাকে বিয়ে করেছে। এম এ বি এ পাশ করে মেয়েদের অন্তত এই লাভটি হয়, ভাল স্বামী জোটে। শব্দগুলো আমার মাথার ভেতর গোল্লাছুট খেলে। কিছুই বলা হয় না। বরং দীর্ঘশ্বাস বেরোয় নিজের অজান্তে। নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজে চমকে উঠি।

—কক্সবাজার গিয়েছেন?

—না।

—সমুদ্র দেখে আসুন দুজনে মিলে, মন ভাল হবে।

—আমার মন ভাল নেই কে বলল?

—কেন আপনি বুঝি জানেন না আপনার যে মন ভাল নেই!

—আমি বেশ ভাল আছি। বেশ...

—আপনি বিষণ্ণতায় ভুগছেন ঝুমুর ভাবী।

—না মোটেও না...

—আমি কিন্তু আপনাকে খুব লক্ষ করি...। আনিস বলে।

লজ্জায় পড়ি আমি। আনিস কখন কোন দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখে কে জানে।

—ছবি-টবি দেখতে তো পারেন। গান শুনতে পারেন...অথবা থেকে আসুন না আপনার মা বাবার কাছে কিছুদিন!

শুনে হাসি আমি। হেসেই বোধহয় অক্ষমতা আড়াল করতে হয়।

আনিসের সামনে আমি বড় অস্বস্তিতে পড়ি। ও সম্ভবত বোঝে, আমি যখন দ্রুত চলে আসি সামনে থেকে, আমাকে বাধা দেয় না। আনিস কি টের পেয়েছে আমি যে কী রকম স্বপ্নহীন দিন যাপন করি আজকাল! সেই ভ্রূণটি বেঁচে থাকলে আমাকে নানারকম স্বপ্ন দিত নিশ্চয়ই, এখন কোনও স্বপ্ন নেই আমার। হারুনের

শারীরিক সুখের জন্য রাখা এক দ্বিপদী প্রাণী বিশেষ আমি। আমি আর কিছু নই, আমি কেউ নই আর।

নিজের কষ্টগুলো, আমি লক্ষ করি, প্রাণপণে আড়াল করতে চাই। কষ্টের ভাগ আমি কাউকে দিতে চাই না। এমনকি হারুনকেও নয়।

আজকাল প্রায় রাতেই হারুন রাতে আমার শাড়ি খুলতে খুলতে বলে, এবার আমাদের একটা বাচ্চা দরকার।

মনে মনে বলি, হ্যাঁ, তাই। এবার আমাদের দরকার। সেবার আমাদের ছিল না।

হারুন নিশ্চিত সেবার বাচ্চাটি আমাদের ছিল না, দেড়মাসে কোনও মেয়ে গর্ভবতী হতে পারে কি না এ কথা হারুন কোনও ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করেনি, সবই অনুমান। গর্ভবতী হওয়ার জন্য একদিনই যথেষ্ট, পরের মাসে মাসিক বন্ধ হতেই পারে, এ কোনও অসম্ভব কথা নয়। যুক্তি দেখালে হারুন হেরে যাবে, কিন্তু তার সন্দেহ কী মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায়নি, যে বাচ্চাটি আমাদের।

হারুন এখন আমাদের বাচ্চা চাইছে, আমাদের বাচ্চার জন্য তার আবেগ এতই প্রচণ্ড এখন, যে সে রাতে আমাকে বেশ ক'বার ঘুম ভাঙিয়ে শরীর নিয়ে মেতে ওঠে। এ যত না যৌনউত্তেজনায়, তার চেয়ে বেশি আমাকে বাচ্চা দেওয়ার উৎসাহে, আমাদের বাচ্চা।

আমি লক্ষ করি, হারুনের সঙ্গে শারীরিক এই মিলনে আমি কোনও শীর্ষসুখ পাই না। গর্ভপাতের পর থেকেই এমন হচ্ছে। মাঝে মাঝে সে জিজ্ঞেস করে, হয়েছে তোমার? পেয়েছ?

আমি হ্যাঁ বলি। হ্যাঁ বলি কারণ আমার ভয় হয় শীর্ষসুখ না পাওয়াকে আমাকে শারীরিক কোনও রোগ বলে ভাবা হয় যদি।

গর্ভপাতের পর আমি জানি না শরীরে আমার কোনও ত্রুটি হয়েছে কি না, কোনও স্নায়ুর ওপর ছুরি পড়েছে কি না, কে জানে। না কি মনের ওপর! মন আর হারুনকে আগের মতো ভালবাসে না, খুব গোপনে গোপনে এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর মানুষটিকে সে ঘৃণা করে।

আনিসের ব্যবসার জন্য হারুন কতটুকু কি করেছে তা জানতে চাইলে বলে সে, তুমি এসব জটিল জিনিস বুঝবে না।

—কেন বুঝব না? আনিস বলল, তুমি তাকে চট্টগ্রামে কি এক ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছ। সবাইকেই তো বলছ কী করছ, আমাকে নয় কেন? মানুষ তো বউদেরই আগে বলে।

হারুন আবার বলে, এসব জেনে কী দরকার তোমার?

—কেন, আমি কি খুব বোকা নাকি যে তুমি কিছু বলতে চাও না?

হারুন চোখ নাচিয়ে বলে, তুমি আবার বোকা কোথায়?

খুশি হই শুনে, বলি, বোকা নই?

—তুমি তো সাংঘাতিক চালাক। চালাক না হলে কি এই অবস্থা করেছ?

—কী অবস্থা করেছি?

—কী আবার, সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করেছ।

—কেন, তোমার কি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না?

—ছিল। কিন্তু তখন ছিল না। এ তো ভালই জান।

—তখন আমার বিয়ে করার দরকার ছিল।

—হ্যাঁ তা তো ছিলই।

—তোমাকে ভালবাসার ব্যাপারটি তো ছিলই। তোমাকে আরও কাছে পাওয়ার, তারপর...

—রাখো, রাখো, এগুলো তো চালাকি, যেন আমি ভালবাসা ভাবি...

—আসলে কি?

—আসলে হচ্ছে আমি কেবল তোমাকে ভালবাসি। আমি। আমি তোমার জন্য যা করেছি, পৃথিবীর আর কোনও পুরুষ এত করবে না। দয়া করে আমাকে আর ঠকাতে চেও না।

আমি যেন হারুনকে ঠকাতে না পারি, তাই আমার বাবার বাড়ি যাওয়া বন্ধ। এবাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ। এক বন্ধ খাঁচায় হারুন আমাকে পুরছে। আনিস আমাকে কক্সবাজারে ঘুরে আসতে বলেছে। বলেছে ওয়ারি যেতে আনিস বুঝতে পারে, আমার ভেতরে খুব অস্থির লাগে, একটি ছক বাঁধা জীবনে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার আকাশ দেখতে হয় এ বাড়ির এক চিলতে বারান্দা থেকে, গাড়ির জানালা থেকে উঁকি দিয়ে। যে মানুষ খোলা আকাশ দেখে না, প্রকৃতির কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ হাসে না, তার মনে জং ধরে যায় না কি!

৮

এ বাড়ির নীচতলায় এক দম্পতি ভাড়া থাকে। বউ ডাক্তার। ডাক্তার বউটি ওপর তলায় বেশ কবার আমার অসুখ দেখতে এসেছিল। ওকেও আমি বলিনি যে গর্ভপাত ঘটানোর পর জ্বর হয়েছে। ওষুধে সেরে ওঠার পর সেবতি আমাকে কিছু ভিটামিন দিয়ে গেছে। ভিটামিন যেদিন দিতে এসেছে, ওর অবসর ছিল, বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছে আমার সঙ্গে। গল্পগুলো ঠিক স্বামী সংসারের নয়, অন্যরকম।

সুন্দরবনে একবার বাঘ দেখতে গিয়েছিল, দেখেওছে ও বাঘ, সেই বাঘের গল্প। বাঘেরা খুব একা হয়, সিংহের মতো সামাজিক জীবন বাঘের নেই। শুনে, বাঘেদের জন্য আমার মায়া হতে থাকে। কী অসম্ভব একাকিত্বে ভোগে বাঘেরা। মিলনের ঋতু এলে বাঘ আর বাঘিনী একসঙ্গে থাকা শুরু করে, বাঘিনী বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর বাঘকে তাড়িয়ে দেয় যদি বাঘ আবার নিজের বাচ্চা খেয়ে ফেলে!

সেবতির স্বামী আনোয়ার একটি এন জি ও চালান, সেবতি ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার। যেদিন সেবতির রাতে ডিউটি, সারাদিন বাড়িতে বসে খামোকা সময়

কাটানোর চেয়ে ওপর তলায় আমার সঙ্গে গল্প করতে চলে আসে। সেবতির সঙ্গে এভাবে একটু একটু করে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বাড়ির কেউ এতে আপত্তি করে না। সেবতিকে এ বাড়ির সবাই বেশ পছন্দ করে। ও এলে শাশুড়িও বেশ খুশি হন, ওকে ডেকে নিজের গা ম্যাজম্যাজ, শ্বশুরের বাতের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা সবই বর্ণনা করেন। সেবতি ওষুধ লিখে দেয়। মাগনা ডাক্তার দেখানোর ইচ্ছে কার না হয়! সেবতির জন্য শাশুড়ি নিজের হাতে সেমাই রান্না করেন, চা করেন। সেবতি এ বাড়িতে বৈঠকঘরের অতিথি নয়, ও আমার শোবার ঘরে যে কোনও সময় অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

—তুমি বাচ্চা নিচ্ছ না কেন ঝুমুর? সেবতি বলে।

—নেব। হারুন তো খুব চাইছে বাচ্চা।

সেবতি কণ্ঠ চেপে বলে, প্রতিদিন সম্পর্ক হয় তো তোমাদের, নাকি!

লজ্জায় আমি রঙিন হয়ে উঠি। মুখ লুকিয়ে হাসি।

সেবতির লজ্জা শরম বলে কিছু নেই। চেয়ার ছেড়ে বিছানায় এসে বসে ফিসফিস করে বলে, —তোমার মাসিক ঠিক মতো হয় তো?

—তা হয়।

—আমারও হয়। বেশ তো, চলো, দেখি কার আগে বাচ্চা পেটে ধরে। শোন, বাদ গেলে দাও যে কোনও দিন। তেরো নম্বর দিনটি কোনও ভাবেই বাদ দিও না।

সেবতির মুখে লাগাম নেই। বলে, মাসিকের পর দশ থেকে ষোলোতম দিনগুলোয় আনোয়ার আপিস থেকে ছুটি নিয়ে ওকে সকাল বিকাল নাস্তানাবুদ করে।

—ওই সাতদিনে সত্তরবার মিলন ঘটিয়ে বাকি দিনগুলোয় বিশ্রাম নিই।

হাসতে হাসতে সেবতি গড়িয়ে পড়ে।

এভাবেই দিন যেতে থাকে আমার।

বাড়িতে একদিন নোয়াখালির গ্রাম থেকে এক ঝাঁক লোক আসে। শাশুড়ি বলেন, এরা তোমার কাকাশ্বশুর হন, কাকি শাশুড়ি হন। মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে ওঁদের নোংরা পা ছুঁয়ে আমাকে সালাম করতে হয়। শাশুড়ি জানালার আলোর সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে অতিথিদের আমার গায়ের রং দেখান, ওঁরা মাথা নাড়েন, রং মন্দ নয়। ঘোমটা তুলে আমার দীঘল চুল ওদের চোখের সামনে মেলে ধরেন, দেখে ওরা ভারী সন্তুষ্ট হন। ভাল বউ পেয়েছে হারুন, ওঁরা মন্তব্য করেন। শাশুড়ি এরপর আমার রান্নার বর্ণনা করেন, রান্নায় বেশ পাকা হাত আমার, বলেন। বাড়ির সবার জন্য আমি নিজের হাতে রান্না করি বলেন। আমি এ বাড়িতে আসার পর শাশুড়ি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, বলেন। এখন তিনি সংসারের দায়িত্ব ছেলে বউ-এর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন, বলেন।

—বউমা, পানের বাটাটা নিয়ে আসো তো দেখি।

পানের বাটা এগিয়ে দেওয়ার পর শাশুড়ি অতিথিদের নিয়ে পান খেতে থাকেন আর বলতে থাকেন ওর বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় প্রফেসর। শিক্ষিত ঘরের মেয়ে। বাপের মেলা টাকা। এই ঢাকা শহরে নিজেদের বাড়ি, কম কথা নাকি। মেয়েও

লেখাপড়া জানে।

বাইরের কেউ এলেই শাশুড়ি আমার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেন। তিনি কিন্তু আমি যখন তাঁর মাথার পাকা চুল এনে দিই, একা ঘরে, আমাকে বলেন, তুমি তো বউমা এ বাড়িতে খালি হাতে এসেছ। হারুনের সঙ্গে যে এক ব্রিগেডিয়ারের মেয়ের বিয়ের কথা চলছিল, ও এলে এ বাড়ির সব নতুন আসবাব আসত, ফ্রিজ, টেলিভিশন, সোনাদানা সব। বারো ভরি সোনা দেওয়ার কথা ছিল।

—তো হয়নি কেন সে বিয়ে।

—হারুন বেঁকে বসল, বলল তোমাকে বিয়ে করবে। ছেলেকে বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দিন এভাবেই যাচ্ছিল।

কিছুটা সত্যিতে, বাকিটা মিথ্যেতে। বাড়িতে যখন সেবতি আসে, তখনই আজকাল এমন হয়েছে যে মনে হয় একজন মানুষ পেলাম কথা বলার, একজন মানুষ পেলাম, যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা যায়, হাসা যায়, যার কাছ থেকে বাইরের পৃথিবীর গল্প শোনা যায়। নিজের এই ছোট্ট জগতের কথা বলা যায়। আমি ইদানীং প্রায় ভুলতে বসেছি আমার শৈশব কৈশোর কেটেছিল সভ্য শিক্ষিত পরিবেশে। বাবা মা দুজনেই আমাকে লেখাপড়া করে মানুষ হওয়ার আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলতেন। ছোটবেলায় বাবার ওই মানুষ হওয়ার আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথায় আমি হাসতাম। মনে হত আমি তো মানুষই, জন্তু নই, আর নিজের দুটি পায়ের ওপর ভর করেই তো দাঁড়িয়ে আছি, এখন বুঝি আসলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ব্যাপারটির মানে অন্য। ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব পেরিয়ে এসেও আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো হয়নি। নিজের বলে কিছু নেই আমার, এখন পরের ভালোয় আমার ভাল, পরের সুখে আমার সুখ। পরের কষ্টে আমার কষ্ট। হ্যাঁ, তাই, ব্যবসায় হারুনের দশ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে বাড়িতে খবর এল, সবার মন খারাপ, আমাকেও দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে থাকতে হল।

হারুন ঘরে এলে তাকে খাবার বেড়ে দিয়ে পাশে বসে বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে হল, খুব ক্ষতি হয়েছে, না গো?

হারুন মুখ ভার করে রাখে।

তার পাতে দুটো মাংসের টুকরো তুলে দিয়ে বলি, কী করে এত টাকা নষ্ট হল, বল তো।

এসব বুঝবে না তুমি। হারুন কঠিন স্বরে বলে।

এভাবেই দিন যাচ্ছে আমার, না বুঝে।

হারুন বাড়ি ফিরলে দোলন মিহি সুরে কাঁদতে থাকে পাশের ঘরে বসে। অবাক হই, ঠিক এই সময়টায় কাঁদে কেন দোলন। শাশুড়ি হাতে একটি তসবিহ ঝুলিয়ে হারুনের মাথার কাছে বসেন, মাথায় ফুঁ দেন, রাণুকে ডেকে শরবত দিতে বলেন। এই শরবত দেওয়ার আদেশ আমাকে করলেই হয়, তিনি আমাকে না করে রাণুকে করেন। হারুন বাড়ি না থাকলে কিন্তু বাড়ির সবাইকে শরবত করে খাওয়ানো

দায়িত্ব আমার। হারুনকে শরবত খাইয়ে শাশুড়ি খুব নরম কণ্ঠে বলেন, হারুনের এই ক্ষতিতে বাড়িতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে দোলন। আনিস সেই যে টাকা নিয়ে গেল, এখনও কোনও খবর দিচ্ছে না কী হচ্ছে ওখানে। খবর তো হারুনেরই নিতে হবে। দোলন যে হারুনের একটিই বোন, মায়ের পেটের বোন, তা হারুনের স্মরণ থাকলেও তিনি স্মরণ করান।

বড় লোকসানটি ঘটে যাওয়ার পর শাশুড়ি বেশ নামাজ পড়ছেন, ফরজ তো আছেই, সুন্নতও, এমনকি নফলও। আমি যথারীতি সংসার ধর্ম পালন করছি, তিনি বাড়তি একটি ধর্ম দিলেন আমাকে, নিয়মিত আমি যেন নামাজ পড়ে হারুনের জন্য দোয়া করি।

আমি ঘাড় চুলকে জিভে কামড় দিয়েছি, নামাজ তো আমি ঠিক...

আমার সম্পূর্ণ হয়নি বলা নামাজ তো আমি পড়তে পারি না। তার আগেই শাশুড়ি বললেন, মেয়ে হয়ে নামাজ পড় না, এ কেমন কথা। হারুন নিজে দেখেছে আমার অস্বস্তিকর অবস্থা। তার চোখেও অসহায় চোখে তাকিয়েছি, ভেবেছিলাম সে আমাকে উদ্ধার করতে এগোবে, বলবে যে ঝুমুরকে নামাজ পড়ার জন্য তাগাদা দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু হারুন বলেনি কিছুই। পরদিন বিকেলেই আপিসের পিওনের হাতে আমার জন্য একটি নামাজ শিক্ষা বই পাঠিয়েছে সে। সেই থেকে শুরু, সেদিন থেকেই আমাকে সুরা মুখস্ত করে শাশুড়ির সঙ্গে পাঁচ বেলা নামাজে দাঁড়াতে হয়। মোনাজাতের আগে শাশুড়ি বলেন, হারুনের জন্য দোয়া কর। দোয়া কর যেন ওর শরীর স্বাস্থ্য ব্যবসাপাতি ভাল থাকে। ওর যেন বেহেস্তবাস হয়।

আল্লাহর কাছে এমন করে কিছু চাওয়ার অভ্যেস আমার ছিল না। কিন্তু প্রতিদিন হারুনের সুখ স্বাস্থ্য বিত্ত বৈভবের জন্য প্রার্থনা করতে করতে আমার এখন অভ্যেসই হয়ে গেছে অন্যের মঙ্গল কামনা করার, নিজের নয়।

দিন যায়।

৯

বারান্দায় দাঁড়ালে আজকাল ওকে দেখি আমি। ঘাড় অবধি চুল, উদাস চোখ। বাগানে বসে সিগার ফোঁকে, নয়তো আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে ঘাসে, কখনও দেখি ছবি আঁকছে, রং তুলি হাতে। ছবি আঁকে এ কে? তন্ময় তাকিয়ে থাকি যুবকের দিকে, যুবকটির হঠাৎ হঠাৎ চোখ পড়ে আমার ওপর, উদাস দুটো চোখ আমাকে দেখে।

বিকেল হলেই আমাকে কে যেন বারান্দায় দাঁড় করায়। কে যেন ওই সুদর্শন যুবকটিকে এনেও দাঁড় করায়। কে যেন ওর চোখ দুটো ফেরায় আমার দিকে। কে যেন আমার সারা শরীরে শিরশির করা এক ধরনের আনন্দ দেয়। কে যেন

আমাকে আটকে রাখে বারান্দায়। শাশুড়ি বউমা বউমা বলে ডাকেন, দোলন ভাবী কোথায় গেলে, ও ভাবী,—কারও ডাক আমার কানে পৌঁছে না। আমি নিজেকে ওই উদাস দু চোখে হারিয়ে ফেলি। এ কে?

এ কে, তা অবশ্য ক'দিন পর আমার জানা হয়। এ যুবক সেবতির দেবর। আফজাল।

সেবতি বলে, আফজালের নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই। ছবি নিয়ে রাত দিন পড়ে থাকে। ব্যাঙ্গালোরে পড়তে গিয়েছিল, সব ফেলে ছবি আঁকা শিখেছে, এখন এসব নিয়েই আছে।

আমি মগ্ন হয়ে শুনি আফজালের কথা।

বিকেল হলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে আফজালের উদাস দু চোখ দেখে আমার তৃষ্ণা মেটে না। ইচ্ছে করে আরও কাছে যাই। আরও কাছ থেকে দেখি তাকে। এক বিকেলে রান্নাঘরের কাজ সেরে শাশুড়ির কাছ থেকে অনুমতি চাই নীচের বাগানে হাঁটতে যাওয়ার।

শাশুড়ি অনুমতি দেন বটে, তবে একা নয়, দোলনকে সঙ্গে নিতে হবে।

দোলনকে বললে দোলন সুমাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে বাগানে।

বাগানটি আসলে কোনও বাগান ছিল না, ছিল এক চিলতে মাঠ, মাঠে সেবতি আসাতক কিছু গোলাপ গাছ লাগিয়েছে, কিছু গাঁদা। আমি আর দোলন যখন হাঁটছিলাম, বাগানে আফজাল ছিল না। ছিল না বলে বাগানে অনেকক্ষণ কাটানোর সুযোগ হয়। এদিক ওদিক তাকাই, সেবতির বাড়ির বন্ধ দরজার দিকে। হু-হু করে ওঠে বুক। আমি কি আফজালের প্রেমে পড়েছি। তা না হলে বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখার, এবং আরও কাছ থেকে দেখার জন্য কৌশলে বাগানে হাওয়া খেতে আসার কী কারণ আমার! এর নাম যদি প্রেম হয়, সর্বনাশ।

বাগানে হাঁটতে হাঁটতে দোলন যখন আনিসের ব্যবসার কথা বলছিল, চট্টগ্রামে ছ-লাখ টাকায় ভাল ব্যবসা ও শুরু করেছে, শিগগির দোলন চট্টগ্রামে স্বামীর কাছে চলে যাবে, এ বাড়িতে ওর ভাইয়ের দুরবস্থার সময় ওর যে থাকার কথা, এই থাকা সম্ভবত ওর হয়ে উঠছে না—এসব... আমি ভাবছিলাম উদাস দুটো চোখের কথা। সেই চোখদুটো কাছ থেকে দেখা আমার কি এ জীবনে হয়ে উঠবে না! তখন ভারী এক কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠি, জানলায় সেই উদাস চোখ, বলছে, এই বাচ্চা মেয়ে, ফুল ছিঁড়ো না।

সুমাইয়া ফুল ছিঁড়ে কুটি কুটি করছিল দু হাতে।

চোখদুটো আমার দিকে, চোখ সরিয়ে নিই দ্রুত। দোলন সুমাইয়াকে সরিয়ে নেয় ফুল ছেঁড়া থেকে, বলে চল চল।

—এক্ষুনি? আরও একটু থাকো দোলন। আরও একটু।

—সন্ধে হচ্ছে, চুল খোলা রেখে এরকম হাঁটলে আবার কী না কী অঘটন ঘটে। চল চল।

চল চল, এ হল পর পুরুষ। পর পুরুষ তোমাকে দেখছে ভাবী, এ ঠিক নয়। দোলন নিজের ভাইয়ের সতী-সাধ্বী বউকে সরিয়ে আনে পর পুরুষের দৃষ্টির তির

থেকে। দোলন জানে না, ওই তির আমার হৃদয়ে বিঁধেছে। আমি বুঝি না, শরীর আর মনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকে। আমি তো হারুনকেই জানি, তাকেই আমি ভালবাসি, হারুন ছাড়া আরও পুরুষ আমি চোখের সামনে দেখেছি, কারও জন্য এমন অনুভব আমি সঞ্চারিত হতে দেখিনি আমার স্নায়ুতে। এ কি সত্যিই কোনও ভালবাসার বোধ নাকি শেকল পরা পায়ের নিয়মই এই যে সে অস্থির হয় খাঁচার বাইরে যাওয়ার, খোলা মাঠের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র হয়, খোলা মাঠের মানুষের প্রতিও। নাকি প্রিয়জন থেকে আঘাত পেলে মানুষের নিয়মই অন্য মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়া, কিছুটা হলেও আশ্রয় খোঁজা। বাবা বলতেন, নিজেই নিজের আশ্রয় হও। এর চেয়ে নিরাপত্তা আর কোথাও নেই। বাবা বোধহয় তাঁর আদর্শে এখন আর বিশ্বাসী নন। যে মেয়েটিকে পুত্র বলে লালন করেছেন, সে এখন এক বাড়ির শিক্ষিত গৃহবধূ মাত্র। সে এখন পরাশ্রয়ী লতা। বাবাও এ নিয়ে এখন আর প্রতিবাদ করেন না, সম্ভবত ভাবছেন সমাজের এমনই নিয়ম। মেয়েরা পুরুষের আশ্রয়ে থাকলে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-পাড়া-পড়শি সকলে সন্তুষ্ট হয়।

দোলনের তাড়ায় আমাকে বাগান ছেড়ে উঠে আসতে হয় দোতলায়। খাঁচায়।

হারুন এর মধ্যে আরজুর দুটো চিঠি দিয়েছে আমাকে। দুটো চিঠিরই খাম খোলা। এর মানে হারুন চিঠিদুটো পড়েছে। হারুন আমার চিঠি কেন পড়েছে এ নিয়ে প্রশ্ন করি না আমি। হারুনও কোনও কৈফিয়ত দেয় না, যেন এ খুব স্বাভাবিক যে আমার কাছে আসা যে কোনও চিঠিই হারুন, যেহেতু সে আমার স্বামী, আগে খুলবে, আগে পড়বে, তারপর ইচ্ছে হলে আমাকে পড়তে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না। আরজু লিখেছে, একই চিঠি, একটি এ বাড়ির ঠিকানায়, আরেকটি হারুনের আপিসের ঠিকানায়। এ বাড়িতে সাধারণত আমার কোনও চিঠি আসে না। মাঝে মধ্যে বাবা মা আর নূপুর ফোনে কথা বলে, এটুকুই। আমার বন্ধুরা কে কেমন আছে, তার খবর আমি কখনও ওদের জিজ্ঞাসা করি না, করি না, ভেতরে একটি ভয় কাজ করে বলে। ভয় এইজন্য যে আমার মন বলে ফোনে যার সঙ্গেই আমি কথা বলি, হারুন শুনছে। আরজুর চিঠিটি মূলত আমার খবর নিতে, আমি কেমন আছি, ভাল আছি কিনা, আমি কি কারণে বন্ধুদের ভুলে আছি এসব। আরও একটি খবর জানিয়েছে, সুভাষের ভাই সুজিত মারা গেছে। কেন মারা গেছে, কি হয়েছিল, এসব লেখেনি কিছু। চন্দনা আর নাদিরা ভাল আছে, সবাই আমাকে স্মরণ করে। আমাকে ছাড়া ওদের আড্ডা আর আগের মতো জমছে না। আমি হঠাৎ দূরে চলে যাওয়াতে ওর এবং বন্ধুদের কারও ভাল লাগছে না, এসব। ওর বাবার আপিসে ওর একটি চাকরি হয়েছে সে খবরও দিয়েছে। সুভাষ হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, লিখেছে। আমার মার সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি আমার জন্য খুব দুঃখ করছিলেন, এটুকুই। কেন দুঃখ করছিলেন মা, তা কিছু লেখা নেই। লেখা, ইচ্ছে করলে তোমার শ্বশুরবাড়ি যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন বলো, তুমি তো কোনওদিন যেতে বলোনি। হারুনভাইও যেতে বলেনি। তোমরা দুজনই আমাদের ভুলে গেছ। তোমার শ্বশুরবাড়িতে ফোন করলে অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। চিঠিটি আমি দুবার পড়ি, দেখি কোথাও কোনও রকম ইঙ্গিত আছে কি না যে

আরজুর সঙ্গে আমার গোপন কোনও প্রেম ছিল, শোয়াশোয়ি ছিল। চিঠিটি যখন পড়ছিলাম, হারুন পাশে দাঁড়িয়েছিল। পাশে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখছিল আমার মুখের কোনও পেশিতে কোনও রকম পরিবর্তন হয় কি না, চোখে জল করে কি না, ঠোঁটে হাসি ফোটে কি না। আমি যথাসম্ভব নির্বিকার থেকে চিঠি পড়েছি।

আমাকে ছাড়া ওদের আড্ডা আগের মতো জমছে না, আমার জন্য মা খুব দুঃখ করেছেন এই বাক্যদুটো আমি অনুমান করি হারুনের পছন্দ হয়নি। চিঠিটি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে আমি বলি, আগেই পড়ে নিয়েছ এটি, তাই না?

—অসুবিধে আছে নাকি তোমার? হারুন চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করে।

—না, অসুবিধে থাকবে কেন? অসুবিধে নেই।

—তাহলে কী?

—চিঠিটি আমাকে দিয়েছ, এই তো আমার জন্য বেশি। নাও তো দিতে পারতে। নাও তো জানতে পারতাম সুজিত মারা গেছে।

—নাও তো জানতে পারতে যে তোমাকে ছাড়া আরজুর ভাল লাগছে না।

শুনে আমার গা কেঁপে ওঠে।

হারুনকে আমি এসব হুল ফোঁটানো কথার জন্য ক্ষমা করে দিতে পারি না। সে নিশ্চিত সুভাষ বা আরজুর সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্ক ছিল। তার এই বিশ্বাস দূর করার সাধ্য আমার নেই। এবং আমি ধীরে ধীরে বুঝতে থাকি তাকে ক্ষমা করার সাধ্যও আমার নেই।

আমি এ বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে পারি না, না আমার বাবার বাড়ি, না বোনের বাড়ি, না বন্ধুদের বাড়ি। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমি কোনও চাকরি করতে পারছি না। সবই আমি মেনে নিচ্ছি, কারণ আমার আশঙ্কা হয় যদি আমি এদিক-ওদিক কোথাও ঘুরে আসি, আমি গর্ভবতী হলে হারুন আবার আমার গর্ভপাত করাবে। বলবে আমার জরায়ুতে বীর্য ঢেলেছে অন্য কেউ, হারুন নয়। আমি আর অভিযুক্ত হতে চাই না। আমি আর আমার শরীরকে নিষ্ঠুর ধারালো যন্ত্রপাতির সামনে মেলে ধরতে চাই না। হারুন কি কখনও জানবে না যে আমাকে সে অযথা সন্দেহ করছে, কখনও জানবে না সে আমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে! সে আমার ভালবাসার, সততার, সে আমার সরলতার অপমান করেছে। আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করি তার চেতন ফেরার, কোনও দৈবশক্তি এসে তার ভুল শুধরে দেয় না। এ এমনই অবিশ্বাস, কোনও সাক্ষী বা দলিলপত্র নেই এটিকে মিথ্যে প্রমাণ করে। আমি অধম অক্ষম প্রাণী ক্ষোভে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে থাকি। হারুন আমার কষ্ট ছুঁয়ে দেখে না।

হারুন জানে না যে সে চলে যাচ্ছে, প্রতিদিন সে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। তার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে, তার এক শরীর অহংকার নিয়ে, আর এক হৃদয় গৌরব নিয়ে দূরে, বহু দূরে। তার চলে যাওয়া প্রতিদিন আমি বিস্ফারিত চোখে দেখি।

আমাকে অন্য কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অন্য এক সুন্দর। অন্য এক মন-কেমন-করা কেউ। আমার ঘাড়ের কাছে কদিন থেকে চিন চিন করে ব্যথা হচ্ছে, সেবতি আমাকে একবার দেখে দিলে মন্দ হয় না, মিনমিন করে বলি শাশুড়িকে। তিনিও মিহি গলায় বলেন, তা সেবতিকে খবর পাঠাও, ও আসুক। খবর কাকে দিয়ে পাঠাব, রসুনি মশলা বাটছে। আমিই না হয় নীচতলায় একবার দেখে আসি।

বারোটা সিঁড়ি নামলেই সেবতির বাড়ি। অথচ মনে হয় যোজন-যোজন দূরে। মনে হয় কারণ বারোটি সিঁড়ি পেরোবার অনুমতি চাইতে বারোদিন অপেক্ষা করতে হয়। বারোঘণ্টা চোখ কান খাড়া রেখে পরিস্থিতি বুঝতে হয়। আর যখন বারোটি সিঁড়ি পেরিয়ে বারো বছর বয়সের বালিকার মতো নেমে যাই নীচে, যেন বারো বছর অপেক্ষার পর পরাণের পুরুষের সঙ্গে চোখের মিলন হয়, এমন করে দুজন তাকিয়ে থাকি দুজনের চোখে। বারো মিনিট কেটে যায় মুহূর্তে, কেউ টের পাই না।

টের পাব আমিই প্রথম, আমিই প্রথম চোখ নামিয়ে দরজা ধরে জিজ্ঞেস করব, সেবতি নেই?

সেবতি নেই। এ কথা কি আমি মনে মনে জানি না! সেবতি আজকাল বিকেলে হাসপাতালে যায়, ফেরে পরদিন সকালে।

আমি দোতলার ঘোমটা পরা, গয়নাগাঁটি পরা, লক্ষ্মী বউ। শেকল পরা লক্ষ্মী বউ। মাথা নত করা লক্ষ্মী বউ। সঙ্গে আমার স্বামী নেই, শাশুড়ি নেই, দেবর নেই, ননদ নেই, আমি একা।

যুবকটির ঘাড় অবদি এলো চুল হাওয়ায় ওড়ে। শার্টের বোতাম খোলা, বেরিয়ে আছে চওড়া বুক, বুকের কালো লোম। কালো একটি পান্তলুন হাঁটু অবদি গোটানো।

—ও কখন আসবে?

—এক্ষুনি এসে পড়বে। আপনি বসুন। অপেক্ষা করুন। আফজাল দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। বসার ঘরে চারটে বেতের চেয়ার পাতা, একটি ছোট টেবিল, ব্যাস। আমি বসি সেবতির আসার অপেক্ষায়।

আফজাল কি আমার মতো জানে না যে সেবতি আজ রাতে ফিরবে না! নিশ্চয়ই জানে। এ নিশ্চিত যে আমরা ফাঁকি দিতে চাইছি পরস্পরকে!

মাথার ঘোমটা ধীরে ধীরে খসে পড়ে, ঘোমটাকে খসে পড়তে দিই।

আফজালকে মুখোমুখি বসতে দিই। তাকাতে দিই আমার কালো গভীর চোখ দুটোয়।

এত কাছ থেকে উদাস চোখ দুটো কোনওদিন দেখব ভাবিনি। চোখদুটো আজ হাসছে। আজ আফজালের ঠোঁটের কোণে টুকরো টুকরো খুশি রোদের কণার মতো ঝিলিক দিচ্ছে।

—আপনার নাম দিয়েছি আমি বিষণ্ণতা।

শুনে চমকে উঠি। বুকের মধ্যে এক পেয়ালা গরম চা ছলকে পড়ে। কান ঝাঁ

ঝাঁ করে, যেন ঝিঝিপোকা ঢুকেছে। শ্বাস নিতে হচ্ছে দ্রুত।

—আপনি খুব ফুল ভালবাসেন। প্রায়ই দেখি বাগানে হাঁটছেন। আমি বিষণ্ণতার প্রসঙ্গ কাটাতে বলি।

আফজাল হাসে। হাওয়ায় ওর চুল উড়ে চোখ ঢেকে দেয়, ঢেকে দেয় না কামানো গাল।

—কেবল কি আমিই ভালবাসি ফুল। আপনি বাসেন না?

আমি উত্তর দিই না। ফুল আবার কে না ভালবাসে। আফজালের সঙ্গে কোনও কথা বলার নেই বলেই কিছু একটা বলা। কথা না বললেও চলে, মনে হতে থাকে, কোনও কথা না বলেও আমি ওর সামনে কেবল বসেই দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী পার করে দিতে পারি। ধারণা কিংবা আশঙ্কা জন্মায়, হারুনের সামনে এমন মুগ্ধ বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্বামী স্বামীই, স্বামীর সঙ্গে অন্য কোনও পুরুষের তুলনা চলে না, জেনেও আমি অপরাধটি করি, হারুনের সঙ্গে আফজালকে মেলাই।

আফজালের গালে যে নতুন গজিয়ে ওঠা অরণ্যটি প্রকৃতির বড় কাছাকাছি, আর হারুনের নীল হয়ে থাকা কামানো গালটিতে ধারালো কৃত্রিমতা—মেলাই। হারুনের সুন্দর চোখ দুটো খুব ভাল করে দেখলে দেখি দুটো বাজপাখি বসে আছে ওত পেতে, আফজালের উদাস দুটো চোখে দুটো কবিতা।

ভারী গলায় আফজাল বলে, অপেক্ষা করতে গেলে আপনি কি মুখ বুজে থাকেন? কথা টথা বলুন। আমি হেসে উঠি। আফজালও। এরপর ও নিজেই বলে, কবে ও ভারত থেকে ঢাকা এল, খুব বেশিদিন নয়, এমনি এমনি ইচ্ছে হল তাই চলে এসেছে, ওখানে আর ভাল লাগছিল না, কী ওর ইচ্ছে, ইচ্ছে কিছুই নয়, পরিকল্পনা করে আফজাল ওর জীবন কখনও যাপন করেনি, জীবন ওর অনেকটা ভেসে যায়, ভাসতে ভাসতে কোনও কূলে হয়তো ভেড়ে, আবার সে কূল থেকে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে অন্য কূল, এমনই তো ভাল, ঘাটের মড়ার মতো এক ঘাটে সারাজীবন পচে মরার আর যার শখ হয় হোক, ওর সে শখ নেই। আনোয়ার চাইছে ওকে কোনও চাকরিতে ঢোকাতে, কিন্তু ও চাকরি করা পছন্দ করে না। কারণ পরের অধীনে ওর কাজ করা সম্ভব নয়।

—আপনার কোনও স্বপ্ন নেই? আমি জিজ্ঞেস করি।

—কী রকম স্বপ্ন?

—এই ধরুন, টাকা রোজগার করে বাড়ি বানানো, গাড়ি কেনা, বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করা এসব।

আফজাল শব্দ করে হাসে। এই হাসিটিও হারুনের হাসির মতো নয়। অন্যরকম। এ হাসিতে প্রাণ আছে, এ হাসিতে রোদও হাসে, হাওয়ারা বিষম সুখে চুল খুলে ওড়ে। হাসতে হাসতে বলে আফজাল, আমার স্বপ্ন ছবি আঁকার আর ঘুরে বেড়াবার। বেঁচে থাকতে চাই রাজার মতো। একসময় তো ভিখিরির মতো টুপ করে মরে যেতেই হবে। মরেই যখন যাব তখন আর বাড়ি গাড়ি করে কী লাভ, খামোকা এসবের পেছনে সময় নষ্ট।

—বিয়ে করলেও সময় নষ্ট?

—সে তো নিশ্চয়ই। আমাকে কে বিয়ে করবে? কেউ না। আফজাল ঠোঁট উল্টে বলে। ভেজা ঠোঁট। অভিমানে কাঁপা ঠোঁট। কাপড়ে ওর রং লেগে আছে। রং লেগে আছে নাকেও। ইচ্ছে করে শাড়ির আঁচলে নাকের রংটুকু মুছে দিই। ইচ্ছে করে ওর চোখের ওপর ওড়া চুলগুলোকে আলতো করে সরিয়ে দিই। ইচ্ছে করলেও ইচ্ছের লাগাম টেনে রেখে আমি বলি, আমার খুব ঘুরে বেড়াবার শখ।

—দেশের বাইরে কোথায় কোথায় গেছেন?

—কোথাও না।

—কেবল দেশেই ঘুরেছেন?

—ঢাকার বাইরেই কোথাও যাওয়া হয়নি। হেসে বলি।

আফজাল অবাক চোখে তাকায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আমার স্বামীর তো সময় হয় না...

আফজাল এবার হো-হো করে হাসে।

ওর হাসি আমাকে লজ্জায় ফেলে।

হাসতে হাসতে ও বলে, আপনার স্বামীর সময় হয় না বেশ তো, আমার সময় আছে চলুন আমার সঙ্গে। এক ভারত দেখলেই পৃথিবীর অর্ধেকটা দেখা হয়ে যাবে।

—কবে যাবেন বলুন!

আফজাল ওর চেয়ারটি আমার আরও কাছে নিয়ে আসে। আমার মুখ থেকে কাল বা পরশু যাব শোনার জন্য ও এত উদগ্রীব যে কাছে এগিয়ে এসেছে আরও।

—আমাকে নেবেন কেন? কী হই আমি আপনার?

—আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন? কিছু কি হই আমি আপনার?

হেসে বলি, আপনি আমার বান্ধবীর দেবর হন।

আফজাল সশব্দে হেসে উঠে বলে, ঠিক আছে, বান্ধবীর দেবরের সঙ্গেই ভারতভ্রমণে যাবেন।

—অত দূরে?

—কেন ভয় হচ্ছে, দূরে গেলে আমার প্রেমে পড়ে যাবেন?

আমি ঠোঁট কামড়ে শরম লুকোই। ওর হাসির দিকে আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি। এত প্রাণময় হারুনকে তো কখনও মনে হয় না! আমি, দুঃখ হয়, একটি প্রায়-মৃত পুরুষের সঙ্গে সংসার করছি। হারুন অবশ্য এরকম হাসত আগে, বিয়ের আগে। আর তাকে দেখে আমার গা জুড়ে অদ্ভুত এক আনন্দ হত। হয়তো আপিসে তার মুখোমুখি বসে আছি, আমার দিকে তন্ময় তাকিয়ে বলত, তুমি এতটা সুন্দর না হলেও পারতে ঝুমুর।

আমি লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলতাম, ধ্যুৎ কোথায় তুমি সুন্দর দেখলে, ছোট চোখ, বাঁকা দাঁত।

হারুন উঁচুস্বরে হেসে কোমল কণ্ঠে বলত, তোমার সৌন্দর্য তোমার চোখে পড়ে না, পড়ে আমার চোখে। আমিই জানি কি অসাধারণ সুন্দর তুমি!

সেই হারুন ভুলেও আর উচ্চারণ করে না অমন সব বাক্য আর। সেই হারুন, আমার বিশ্বাস হয় না, সেই এক হারুনের সঙ্গেই আমি বাস করছি।

ও কী ছবি আঁকে, কেমন সেসব ছবি তা দেখার আগ্রহ দেখালে আফজাল বসার ঘর থেকে করিডোর পার হয়ে ডানে একটি ছোট্ট ঘরে, যেটি ওর শোবার ঘর, আমাকে নিয়ে যায়। জানালার দিকে মুখ করা ওর ইজেল। ক্যানভাসে এক নগ্ন নারীমূর্তি। নারীমূর্তিটি জল থেকে উঠে আসা, গা ভেজা। এ দেখা শরীর, আমি স্পষ্ট বুঝি, এ আফজালের দেখা। কোনও নগ্ন নারীকে ও খুব কাছ থেকে দেখেছে। দেখা না হলে শরীর কারও তুলিতে এমন চমৎকার ফুটে ওঠে না। আফজালের চোখে আমি প্রবল এক তৃষ্ণা দেখি, যখন ও নগ্নিকার দিকে তাকায়, নগ্ন স্তনের দিকে, স্তনবৃন্তে পড়া দু ফোঁটা জলের দিকে। ছবির চেয়ে বেশি দেখি আমি আফজালকে। প্রচণ্ড এক পৌরুষ দেখি ওর সমস্ত কিছুতে। ওর হাতে, হাতের আঙুলে, চুলে, নাকের তিলে, দুচোখে, দুঠোঁটে, ওর দীর্ঘ সুঠাম দেহতে। আমার মনের খোলা মাঠে উড়তে থাকে প্রশ্রয়ের বীজ। উড়ে উড়ে বীজ ছড়াতে থাকে হাওয়ায়, জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো আফজালের চুল উড়ছে সেই হাওয়ায়। ইচ্ছে করে আফজালের দুচোখ আমার দিকে ফিরিয়ে দিই, ইচ্ছে করে ও আমার দিকে ঠিক ওভাবে তাকাক। নগ্ন নারীমূর্তিটি থেকে ওর চোখ যেন ফেরে, বলি, আপনার সঙ্গে কথা বলে কী যে ভাল লাগছে আমার!

কেন? ফেরে আফজাল।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় ওর। হবেই তো, আমার সঙ্গে কথা কতক্ষণই বা হল, এত ভাল লাগারই বা কী ঘটল এই সামান্য ক্ষণে! কিছু ঘটেনি, তবু আমার ভাল লাগছে।

আফজাল হাসে। সে হাসিতেও প্রশ্রয়। দুজনই যেন দুজনকে প্রশ্রয় দিচ্ছি লাগামছাড়া কথা বলার। আমার জীবনের অনেকটা বলে ফেলতে থাকি সে প্রশ্রয়ে, জানালায় হেলান দিয়ে আফজালের সুগন্ধ পাওয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে, আমার যে অনেক বন্ধু ছিল, এখন যোগাযোগ নেই কারও সঙ্গে, আমার যে খুব একলা লাগে, এ জীবনকে খুব অদ্ভুত অচেনা লাগে। বড় রাগ হয় জীবনের ওপর। বড় ঘেন্না হয়।

বিকেলে বারান্দায় দাঁড়ালে যাকে দেখি একা একা বাগানে হাঁটতে, তাকেও খুব একলা মনে হয়, তাকে হঠাৎ হঠাৎ খুব কাছের মানুষও মনে হয়। বলতে বলতে আমি লক্ষ করি আমার গলা কাঁপছে। একবার মনে হয়, ভয়ে, আরেকবার মনে হয় আবেগে। ভয়, হারুনের। আর আবেগ দূরের যুবককে হাত-ছোঁয়া নাগালে পাওয়ার এবং তাকে ভাল লাগার। দুটোই একই সঙ্গে আমাকে অধিকার করে নিচ্ছে। কথা বলতে গিয়ে গলা তো বটেই, নিজের হাতের দিকে তাকাতে দেখি হাতও কাঁপছে আমার, তিরতির করে হাতের আঙুলগুলো। ভাল এমন হঠাৎ করে সবাইকে লাগে না, হারুনকে ভাল না লাগলে আমাকে ওর কোনও কিছুই এমন কাঁপাত না। আমার জীবন এমন নয় যে ছেলেছোকরা কখনও দেখিনি, সুদর্শন যুবক দেখিনি এর আগে।

জানালার রোদ থেকে পিঠ বাঁচিয়ে বিছানায় বসি।

আফজাল আমার মুখোমুখি একটি দোল খাওয়া চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বলে যায় ওর দেখা ওর সেইসব পাহাড় পর্বত আর সমুদ্রের কথা। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝর্না ধারার কথা। একটি শান্ত একা নদী পাহাড়ের নিতম্ব বেয়ে অরণ্যের বুকের ওপর দিয়ে বিষণ্ণ চলে গেছে কোথাও, সেই নদীটির সঙ্গে সংগোপনে কথা হয়েছে আফজালের। প্রকৃতির গভীর নিকটে গিয়ে ও সমাজ সংসার সব ভুলে যায়, এমন কি ছবি আঁকাও।

শুনতে শুনতে আনমনা হই। মনে হতে থাকে ওসব জায়গায় আমি ছিলাম আফজালের সঙ্গে, আমি দেখেছি ওকে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দৌড়ে নেমে আসতে নীচের নীল সমুদ্রের দিকে, উত্তাল ঢেউ-এর দিকে, সবুজ তীর-জলের দিকে, দেখেছি উত্তাল উন্মাদ ঢেউ-এর অপূর্ব রূপোলি শরীর দেখতে দেখতে ওর উদাস হয়ে যাওয়া। দেখেছি বালুতীরে রং তুলি হাতে বসে আছে ও, সূর্যাস্তের ছবি আঁকছে, আঁকতে গিয়ে আঁকা রেখে মুগ্ধ চোখে পশ্চিম আকাশ জুড়ে রঙের খেলা দেখছে। রং তুলি কাগজ সব পড়ে আছে বালুতে। আফজালের যখন তন্ময়তা কাটে, তখন অন্ধকার, এত অন্ধকার যে ওর শাদা কাগজটিকে ও দেখতে পায় না।

আফজাল এবার ওর আঁকা ছবিগুলো দেখায়, নিঝুম নদীর ওপর সূর্যের অস্ত যাওয়া, ঝড়ো হাওয়ায় নৃত্য করছে সুপুরির বাগান, আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমোনো পাহাড়, মাঝ সমুদ্রে বিষণ্ণ পাহাড়ের হাঁটুজল দাঁড়িয়ে থাকা, বৃষ্টিতে গ্রামের আলপথে ভিজতে থাকা একা একটি মানুষের ছবি, ধূসর আকাশের এক কোণে রক্তিম আভা—নীচে চিকচিক সোনালি জল আর বাড়ি ফিরতে থাকা এক ঝাঁক পাখি।

জিজ্ঞেস করে, ছবি লেগেছে কেমন?

—ভাল।

মনে মনে বলি ছবি যে এঁকেছে তাকে আরও বেশি ভাল লেগেছে।

যদি আমি আসি এ বাড়িতে মাঝে মধ্যে গল্প করতে, নতুন আঁকা ছবি দেখতে, তবে? বলতে ইচ্ছে করে, বলি না। মনে মনে আফজাল হয়ে নিজেকে উত্তর দিই, বাহ, সে তো আমার সৌভাগ্য।

কেন আমার মতো মেয়ের কারণে তো কোনও সৌভাগ্য হওয়ার কথা নয়। আমি ওপরতলার বউ! পরের বউ কি কারও জীবনে সৌভাগ্য বয়ে আনে? আনে না।

মুখ ফুটে কিছুই বলা হয় না। আফজাল বলে ও আমার কথা ওর বউদির কাছে অনেক শুনেছে।

কি শুনেছে? শুনেছে, বউটি খুব ভাল, খুব লক্ষ্মী। আর? তেমন কিছু নয়। তেমন কিছু আসলে তো আমি নই।

—বউটি খুব ভাল! কেন? শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ও খুব যত্ন করে, রেঁধে খাওয়ায়!

আফজাল হো-হো শব্দে হাসে। ওর হাসি আমাকে সংক্রামিত করে। অনেকদিন পর হঠাৎ যেন আমি আগের জীবনে ফিরে গেছি। সেই

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। সেই হাসি আনন্দের জীবনে। আমর নিজের জীবনে। ঠিক এরকম প্রকৃতির কথা, শিল্প-সংস্কৃতির কথা, মানুষের কথা, মানুষের গভীর অনুভবের কথা হত তখন। সেবতির বাড়ির একটি ছোট ঘরে এক বিকেলে হঠাৎ করে আমার অতীত ফিরে আসে। আফজালকে মনে হতে থাকে দীর্ঘ বছর ধরে চেনা এক বন্ধু।

আফজালের পছন্দ র‍্যামব্র্যান্ট, ভ্যানগগ—দুই ওলন্দাজ শিল্পী। ক্লদ মনের ছবির প্রভাব, ও নিজেই স্বীকার করে ওর ছবিতে বড় বেশি, তবে মনের মতো এত ফুল পাতা ও আঁকতে চায় না, চায় একটি নারী-মুখের ওপর সকাল দুপুর আর বিকেলের রোদ পড়ার ছবি। আমি জিজ্ঞেস করি, তা আঁকছেন না কেন ওসব?

—কোন মেয়ে আমাকে সময় দেবে সারাদিন? মেয়ে পাব কোথায়?

ঘরের বেড়ালকে দেখিয়ে বলি, কেবল মেয়ের ছবিই বা আঁকতে হবে কেন? বেড়ালের ওপর আলো পড়ার ছবিও তো আঁকা যায়। আঁকা যায়, আফজাল জানে, কিন্তু বেড়াল পোষ মানবে কেন! বেড়াল দৌড়ে পালাবে তুলি হাতে নিলে বা ইঁদুরের শব্দ পেলে।

মেয়েরাই বা পোষ মানবে কেন, আমি জিজ্ঞেস করি। মেয়েরা বুঝি পোষ মানার জিনিস? আফজাল হা হা করে ওঠে, তা নয়, তা নয়। মেয়েরা হচ্ছে ভালবাসার জিনিস। ভাল না বাসলে মেয়েদের ওপর আলো পড়ল কি অন্ধকার পড়ল তাতে ওর কিছু যায় আসে না। ভালবাসলেই আলো দেখা যায়, শিল্পীর চোখ তো দুটি নয়, আরও চোখ আছে, সেই চোখে।

—বিয়ে করে নিন, তাহলে তো মেয়ের অভাব হবে না। আমি বলি।

আফজাল হেসে বলে, মেয়ে কোথায় বিয়ে করার? প্রেম না করে আয়োজনের বিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—এ তো বেশ সোজা তাহলে! প্রেম করুন।

—প্রেম করার মেয়ে কোথায়!

—ঢাকায় সেই কবে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কাউকে বুঝি খুঁজে পাননি!

—যাদের পেয়েছি, সব বিয়ে করে বসে আছে। সবই কারও বউ নয়তো কারও মা। ওদের দিকে হাত বাড়ালে সব্বনাশ।

—ওই মেয়েটি, ওই ছবির মেয়েটি, ভেজা মেয়েটি, ও কে?

আফজাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কোনও উত্তর দেয় না।

আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করি। আফজাল বোঝে আমি উত্তর চাইছি, এবং আমি অনুমান করছি যে ওই মেয়েটি কারও বউ নয় বা কারও মা নয়।

—চা টা কিছু খাবেন?

—না।

চা খেতে আমার ইচ্ছে করছে যদিও, না বলি। না বলি কারণ চা বানাতে আফজাল উঠে যাবে, আর আমাকে ওর না থাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বসে থেকে থেকে কষ্ট পেতে হবে। শ্বশুরবাড়ির চৌহদ্দি থেকে উঠে আসার মতো সুযোগ আমি হয়তো আর এ জীবনে পাব না, গ্যালন গ্যালন চা খাওয়া আমার জীবনে অনেক

হবে। দোতলার বন্দি জীবন থেকে পালিয়ে যতক্ষণ ফুসফুস পূর্ণ করে শ্বাস নিতে পারি, ততক্ষণই লাভ, ততটুকুই আমার জীবনীশক্তি অর্জন।

আফজাল হঠাৎ বলে, ও মেয়েটি স্বপ্ন, আর কিছু নয়।

তাই কি?

তাই।

আফজাল উদাস চোখে জানালায় তাকায়। আমার মনে হতে থাকে মেয়েটির কথা ও ভাবছে।

মেয়েটিকে কোথাও ও হারিয়েছে, কোনও পাহাড় বা অরণ্যের ধারে। সূর্যাস্তের রঙ যেমন এক সময় মিলিয়ে যায়, ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকারে, তেমন করে মেয়েটি মিলিয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েদের মতো দেখতে অনেকটা। এ মেয়ে কেবলই স্বপ্ন নয়।

আফজালের উদাস দুচোখ এবার আমার দু চোখে। আমার চোখ দুটোয় কি আফজাল ওই মেয়েটির চোখ দেখছে! নাকি আমি কেউ নই, দোতলার বউ ছাড়া। আমার আর কোনও পরিচয় নেই ওর কাছে! কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে ও বলে, আপনি তো ঝুমুর, তাই না?

হ্যাঁ তাই, আমি ঝুমুর।

নামটি আমি অনেকদিন শুনি না। অনেকদিন কেউ আমাকে শুধু ঝুমুর বলে ডাকে না। আনিস যখন ঝুমুর ভাবী বলে ডেকেছিল, চমকেছিলাম। হারুনও খুব একটা ঝুমুর বলে আমাকে ডাকে না। বিয়ের পর হারুন আমাকে কই শুনছ, গেলে কোথায়, শোনো এসব বলেই ডাকছে। ঝুমুর নামটি আমাকে দে-দোল দে-দোল বলে দোলায়। ছোটবেলায় নূপুর আর আমি পায়ে ঘুঙুর পরে নাচতাম, মন মোর মেঘের সঙ্গী, আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা...সেই দোল আমার শরীরে, হৃদয়ে।

দোতলার লক্ষ্মীবউ ছাড়াও আমার যে আরও একটি পরিচয় আছে, ঝুমুর নামের একটি মেয়ে আমি, আফজাল যেন আমার সেই আমিটিকে ডাক দিয়ে জাগাল। দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন লাগে, তেমন লাগছে আমার। ফুরফুরে, তাজা।

—এই দেখুন ঝুমুর, বিকেলের আলো পড়ে আপনার মুখটি কি অসাধারণ লাগছে। ইচ্ছে করছে আপনাকে আরও আরও সময় নিয়ে দেখি। এই আলোটুকু সরে যাবে, তারপর অন্যরকম এক আলো এসে বসবে আপনার মুখে। কেবল মুখেই নয়, সারা শরীরে।

আফজাল যখন বলে, ও যখন ঠিক এখানে, সেবতির ঘরে বসে কথাগুলো বলে না। বলে অনেক দূর থেকে। গহন কোনও অরণ্য থেকে। ওর বলা কথাগুলোর প্রতিধ্বনি হয়, আমি শুনি বার বার। নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, ধুত, কোথায় আবার কী রং দেখলেন। আমি লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিই।

আমার সরিয়ে নেওয়া মুখ, আমার আশরীর লজ্জার রঙে আফজাল মুগ্ধ হয় আরও। চোখে মুগ্ধতা নিয়েই ও বলে, ঝুমুর আপনার হাতটা দেখি, বলে আফজাল

উঠে আমার পায়ের কাছে বসে। হাতটি ও নিজের হাতের মুঠোয় নেয়। আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ও হাসে। আমি চোখ বুজে নিজের সর্বনাশের কথা ভাবি। দৃশ্যটি আমার মনে হতে থাকে হারুন দেখছে জানলা দরজার কোনও ফুটো দিয়ে। দৃশ্যটি আমি কেবল আমার জন্য তুলে রাখতে চাই। দৃশ্যটিকে পৃথিবীর অন্য কারও সঙ্গে আমি ভাগ করতে চাই না।

আফজাল আমার হাতটি হাতের রেখা দেখার জন্য নেয়নি। হাত ধরে আমাকে ওর ছবির এবং ছবির পেছনের ঘটনাগুলো, যেন আমি ওর অনেক কালের বন্ধু, বলতে থাকে। আমিও প্রায় ভুলে যেতে বসি, হারুন নামে আমার এক স্বামী আছে, শ্বশুরবাড়ি বলে আমার এক বাড়ি আছে, আর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও এক যুবকের জীবনের গল্প শোনা আমার কাজ নয়।

আমাকে উঠতে হয় হঠাৎ। আফজালের ঘর পেরিয়ে, করিডোর পেরিয়ে সোজা সদর দরজার দিকে, দরজা খুলতে হয়, পেছনে তাকাতে ইচ্ছে করলেও বারণ করতে হয় নিজেকে। ইচ্ছে না হলেও খসে পড়া ঘোমটা মাথায় টেনে দিতে হয় এবং সিঁড়ি পেরিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো দোতলায় উঠতে হয়।

সেবতির বাড়িতে আমার প্রথম যাওয়া, শাশুড়ি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন সেবতির সঙ্গে কী কথা হল, কী খেতে দিয়েছে সেবতির বাড়িতে, ইত্যাদি ইত্যাদি—আমি উত্তর সাজাচ্ছিলাম সেই ইত্যাদি ইত্যাদির কিন্তু কুমুদ আর সোহেলি ফুপুর কারণে এক রকম বেঁচে যাই। শাশুড়ির কৌতূহল সেবতি থেকে এখন কুমুদে, তারও চেয়ে বেশি সোহেলিতে। কুমুদ আর সোহেলি শাশুড়ির দুই ননদ। ননদ-ভাবীতে জোর গল্প চলছে, আমি উদয় হতেই শাশুড়ি বললেন ওদের জন্য চা-টা করো তো বউমা। সোহেলি ফুপু আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, চা-এ আদা দিও বেশি করে। সোহেলি ফুপুর আদা না হলে যে চা খাওয়া হয় না সে জানি, আগে একবার চা করে দিয়াছিলাম, বলেছিলেন আদাহীন চা বিষের মতো লাগে খেতে, আমি জোরে হেসে উঠতেই সোহেলি ফুপু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন হাসির কি হল?

—মনে হচ্ছে বিষ আগে খেয়ে দেখেছেন!

বিষ কি আর খেয়ে দেখতে হয়, বিষ যে খেতে খারাপ, বিষ যে বিস্বাদ, তেতো, এ তো আন্দাজ করা যায়।

সোহেলি ফুপুর কথার কোনও উত্তর আমি দিইনি। কিন্তু মনে মনে ভেবেছি, বিষ খেতে খুব বিস্বাদ নাও হতে পারে, খুব সুস্বাদুও হতে পারে বিষ। ওপিয়াম বেশি খেলে তো মানুষ মরে যায়, কিন্তু ওপিয়াম খেলে নাকি বিষম সুখ হয়। চিরতা খেতে তেতো, কিন্তু চিরতা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভাল। আবার কিছু কিছু অসুখে কিছু কিছু জিনিসও বিষের মতো, আমার মার ডায়বেটিস, বাবা বলেন মার জন্য চিনি হচ্ছে বিষ। এদিকে বাবার উচ্চ রক্ত চাপ, বাবার জন্য লবণ হচ্ছে বিষ, ধূমপান হচ্ছে বিষ। বিষের প্রতি আমি দেখেছি আমার বাবা আর মার দুজনেরই অসম্ভব এক টান। চা এর জলে আদা কুচি কুচি করে কেটে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি রান্নাঘরের জানালায়। এই জানালা থেকে পাশের বাড়ির নিতম্ব ছাড়া আর কিছু

দেখার উপায় নেই। নিতম্বের দড়িতে ঝুলে আছে রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়। লাল নীল হলুদ, বাহারি রং চারদিকে। আফজালের রঙের তুলি দেখে এসে আমার মনেও রং ধরেছে, পাশের বাড়ির দড়িতে মেলা কাপড়ের রং অন্যদিন হয়তো চোখে পড়ত না, এখন রং চোখে পড়ে। সোহেলি ফুপু একটি বেগুনি রঙের শাড়ি পরেছেন, কুমুদ ফুপু পরেছেন গাঢ় সবুজ রঙের। সঙ্গে কালো ব্লাউজ। কালো না পরে শাদা পরলে মানাত বেশি। কপালে সবুজ শাড়ির আঁচলের লাল বুটির সঙ্গে মিলিয়ে লাল একটি টিপ পরতে পারতেন। রং নিয়ে যখন একা একা রঙিন হচ্ছি, চায়ের রঙের দিকে মুগ্ধ তাকিয়ে আছি, শাশুড়ি ডাকলেন—কি বউমা তোমার চা করতে এত দেরি হচ্ছে কেন!

তাই তো আমার চা করতে দেরি হচ্ছে কেন!

এত দেরি আমার কখনও হয় না। আমি লক্ষ্মীবউ এ বাড়ির, একেবারে সময়মতো যার যা কিছু প্রয়োজন হাজির করি। সোহেলি ফুপু উঠে আসেন রান্নাঘরে। দ্রুত চা কাপে ঢেলে ট্রে হাতে নিতে ছলকে পড়ে যায় চা কাপগুলো থেকে।

সোহেলি ফুপু আমার হাত থেকে ট্রে নিয়ে ফিসফিস করেন, কি বাচ্চা পেটে নাকি!

নাহ। রক্তিম হয়ে উঠি মুহূর্তে!

ট্রেটি শাশুড়ি আর কুমুদ ফুপুর সামনে রেখে সোহেলি ফুপু নিজের কাপটি নিয়ে আমাকে ডেকে নিলেন করিডোরের এক কোণে, কোনও খবর টবর নেই কেন?

—কীসের খবর?

—বাহ বুঝতে পারছ না নাকি?

আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার ইচ্ছে করে চা খেতে। কিন্তু সোহেলি ফুপুর কথার মাঝখানে আমি আমার তেষ্টার কথা জানাতে পারি না। জানানো বেয়াদপি।

—শিগগির বাচ্চা নাও। মা না হলে মেয়েদের জীবনের কোনও মূল্য নেই।

আমাকে কখনও পায়ের নখে, কখনও সোহেলি ফুপুর মুখে, সুপুরি গাছের চুড়োয় তাকিয়ে মাতৃত্বের মাহাত্ম্য নিয়ে সোহেলি ফুপুর দীর্ঘ বক্তব্য শুনতে হয়। শুনতে হয় নিজে তিনি পাঁচবার মা হয়েছেন, এবং প্রতিবার মা হওয়ার সময় তাঁর অনুভূতি কেমন ছিল। নিঃসন্তান হওয়ার যে যন্ত্রণা তা তিনি কুমুদকে দেখে বুঝছেন, কুমুদ ফুপু এ অবদি দুটো মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছেন, ডাক্তার কবিরাজ কম দেখানো হচ্ছে না, তারপরও গর্ভবতী হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, এখন বয়সও আর নেই যে সন্তান পেটে ধরবে। কুমুদের জীবনের যে কোনও মূল্য নেই তা সোহেলি ফুপু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বলেন। যে কদিন আমি কুমুদ ফুপুকে দেখেছি, কখনও মনে হয়নি তাঁর জীবনের কোনও মানে নেই বা মূল্য নেই আর।

সোহেলির শৃঙ্খল থেকে বেরোবার জন্য ভেতরে ছটফট করি, আমাকে উদ্ধার করেন কুমুদ ফুপু। ঝুমুর এদিকে এসো তো বলে আমাকে টেনে আমার আর

হারুনের শোবার ঘরে ঢোকেন। বিছানায় পা তুলে আসন করে বসে বলেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও তো। বাড়িতে অতিরিক্ত মানুষ এখন, এত ভিড় আমার ভাল লাগে না।

কুমুদ ফুপুর আদেশ মতো আমি দরজা বন্ধ করি।

—কী বলল সোহেলি এতক্ষণ?

—বাচ্চা এখনও হচ্ছে না কেন, এসব।

—বাচ্চা কি আকাশ থেকে পড়বে নাকি? বল, বাচ্চা কি আকাশ থেকে পড়ে কখনও?

কুমুদ ফুপু গম্ভীর মুখে জানতে চাইছেন প্রশ্নটা। উত্তর দেবার বদলে আমি হেসে উঠি।

—হাসবে না ঝুমুর। তুমি কথায় কথায় হাসো। বুঝতে পারছ না আমি খামোকা কথা বলছি না।

হাসি চেপে একটি চেয়ারে বসি কুমুদ ফুপুর মুখোমুখি।

আমার চেয়ারে বসা তিনি পছন্দ করেননি, তাঁর পাশে বসতে ডাকেন। শোন এদিকে, কথা আছে। গলার স্বর এখন বেশ নিচু তাঁর। যেন কোনও ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে বা বড় কোনও বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে আজ বা কাল এমন আতঙ্ক-কণ্ঠে তিনি বলেন তোমার ফুপা কি ঘটিয়েছে জানো?

আমি পাশে বসে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, না তো, কী হয়েছে।

—কালও শুয়েছে ময়নার সঙ্গে।

ময়না কুমুদ ফুপুর বাড়ির কাজের মেয়ে। এর আগেও একদিন কুমুদ ফুপু তাঁর স্বামী যে কাজের মেয়ে ময়নার সঙ্গে সুযোগ পেলে শোয় তা বলেছেন।

আগের বারও এসব শুনে আমার লজ্জা হয়েছে, এবার লজ্জায় আমি মাথা নত করি। আঙুলের নখ খুঁটিয়ে দেখতে থাকি, করতলের রেখার গতি-প্রকৃতির দিকে মন দিই। এ ছাড়া আমার করারই বা কি আছে। এ মুহূর্তে ছি ছি করাটা সম্ভবত সঙ্গত, কিন্তু এ বাড়িতে মুরুব্বিদের সম্মান করার কঠোর এক নীতি আছে, যা মেনে চলার শিক্ষা শাশুড়ি আমাকে দিন রাত দিচ্ছেন, এর ফলে আমি সহজে মুখ খুলতে পারি না মুরুব্বিরা কোনও অঘটন ঘটালে। অভ্যেসের দাস মানুষ।

কুমুদ ফুপু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করেছ তো মরেছ। এরা কখনও পোষ মানে না, যত এদের আদর সোহাগ কর। আমি কি সারাজীবন কম করেছি!

—হারুন কি পানি টানি খেতে ওঠে রাতে?

—ওঠে হয়তো, খেয়াল করিনি।

ফুপু ফিসফিস করেন, রসুনি কোথায় ঘুমোয়?

—করিডোরে বিছানা পাতে, কখনও আবার দেখি রান্নাঘরেও।

উফ বলে কুমুদ ফুপু বিছানা থেকে উঠে যান, পায়চারি করেন ঘরময়।

ভাবীকে কত বলি কাজের মেয়েদের খোলা জায়গায় শুতে দেবেন না। কত বার বলেছি বারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সি মেয়েমানুষ কাজে রাখবেন না,

ভাবী শোনেন না মোটেও। অঘটন ঘটলে ঠিকই বুঝবেন। তখন ঠিকই মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলবেন কুমুদ ঠিকই বলেছিল। তখন কি লাভ বল, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে কোনও লাভ আছে, তুমি নিজেই বল ঝুমুর। তুমি তো লেখাপড়া জানা মেয়ে। তোমার তো না বোঝার কথা নয়।

কুমুদ ফুপু আমার উত্তর আশা করছেন। হ্যাঁ অথবা না। এ মুহূর্তে না বলে কুরুক্ষেত্র বাঁধাতে আমার মন চাইছে না। আমার মন পড়ে আছে আফজালে। কুমুদ ফুপু যখন ঘরময় হাঁটছেন, আমি লক্ষ করছি জানালা গলে ঢোকা রোদের আলো কখনও ফুপুকে ঢেকে দিচ্ছে, কখন আবার রোদ থেকে ছায়ায় আসছে তাঁর মুখ। ফুপুর গায়ে আমি আলো ছায়ার খেলা দেখি, খেলা দেখি আর বড় খেলতে ইচ্ছে করে আফজালের সঙ্গে এই খেলা। ইচ্ছে করে একদিন আফজালের রঙের তুলি নিজেই হাতে নিই, বড় ইচ্ছে করে নিজেই একদিন আকাশ থেকে সবগুলো রঙ পেড়ে নিজের গায়ে মাখি।

—আচ্ছা তোমার কি পাতলা ঘুম?

মাথা নাড়ি। না।

কুমুদ ফুপু চুক চুক করে দুঃখ করে বলেন যে তাঁরও এই অবস্থা। বোমার শব্দেও তাঁর ঘুম ভাঙে না। যে মেয়েদের ঘুম খুব গভীর, তাদের কপালে দুঃখ আছেই, তিনি ডান হাতের তর্জনী তুলে নিশ্চিত স্বরে বলেন। ঘুম পাতলা হলে স্বামীরা যখনই রাতে বিছানা ছাড়ে পেছন পেছন যাওয়া যায়, হাতে নাতে ধরে ফেলার সুযোগ থাকে।

কুমুদ ফুপুকে অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে আমি বলি, হারুন খুব ভাল ছেলে ফুপু। ও কাজের মেয়ের সঙ্গে শুতে যাবে না, আপনি ভাববেন না।

এবার তিনি গলা চড়ান। কি বিশ্বাস বল, কি বিশ্বাস। তোমার ফুপা কি খারাপ লোক, বল তিনি কি খারাপ লোক?

—না আমি তা বলছি না। বলছি আসলে কি হারুনের ব্যাপারটা অন্যরকম। ও আমাকে খুব ভালবাসে।

—ভালবাসে?

—হ্যাঁ বাসে।

—তুমি কি মনে কর তোমার ফুপা আমাকে ভালবাসে না?

—তা নিশ্চয়ই বাসেন তবে...

—তবে কি?

—তবে ওই যে বললেন ময়নার সঙ্গে শোন তিনি, ভালবাসলে নিশ্চয়ই তা করতেন না।

কুমুদ ফুপু চেপে ধরেছেন উত্তর শুনবেন বলে। তাই বাধ্য হয়ে যুক্তি দেখাতে মুখ খুলি।

কিন্তু আমার কথায় কুমুদ ফুপু অস্থির হলেন আরও, তিনি দ্রুত স্নানঘরে ঢুকে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে শুরু করলেন।

—কী হয়েছে, খারাপ লাগছে।

আমি স্নানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অপরাধী গলায় বলি।

তিনি কোনও উত্তর দেন না। মাথায় জল ঢেলে তিনি তোয়ালেয় মাথা পেঁচিয়ে আয়নায় নিজের মুখটি দেখতে দেখতে বললেন, তোমার ফুপা আমাকে ভালবাসবে না তো কাকে বাসবে। কোনও ছেলে মেয়ে নেই আমাদের, কত লোকে বলেছে আরেকটা বিয়ে করতে, কিন্তু তোমার ফুপা ওই কাজটি করেনি। বুঝলে?

—হ্যাঁ বুঝলাম।

—কী বুঝলে?

—বুঝলাম যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন। আবার বিয়ে করেননি। ওই কাজটি করেননি।

আমার বাক্য তখনও ফুরোয়নি। কুমুদ ফুপু ধমক দিয়ে উঠলেন—তুমি খুব বেশি কথা বল ঝুমুর। মুরুব্বিদের মুখের ওপর কথা বল।

খানিক থেমে দম নিয়ে কুমুদ ফুপু বলেন, তুমি কিছু বোঝোনি। বোঝোনি যে পুরুষ মানুষের ভালবাসা পাওয়া মানে তাদের শরীর পাওয়া নয়। পুরুষের যৌন কামনা মেটাতে ভালবাসার প্রয়োজন হয় না। যে কোনও মেয়েমানুষই এরা ভোগ করতে চায়। করে।

—যে কোনও?

—যে কোনও। ধরো রসুনির সঙ্গে যদি হারুন শোয়, এর মানে কিন্তু এই নয় যে সে রসুনিকে ভালবাসে।

যত চাই রসুনির সঙ্গে হারুনের রসালো সঙ্গম দৃশ্য কল্পনা করতে, পারি না।

ফুপু বললেন, হারুন শোবে, কারণ রসুনির শরীরে আরেক রকম মজা আছে। তোমার শরীর তাকে একরকম মজা দেবে, রসুনির শরীর দেবে আরেক রকম। হারুন দুটোই চায়। আর শোন, পুরুষেরা কেবল দু তিন রকম মজা চায় তা মনে করো না যেন, একশো দুশো রকম মজা পাওয়ার যদি সুযোগ হয়, গোগ্রাসে গিলবে সব।

বলতে বলতে কুমুদ ফুপুর চোখ বিস্ফারিত হচ্ছে। নিজের বর্ণনায় নিজেই তিনি শিউরে উঠছেন।

যদি সোহেলি ফুপু একবার এসে আমাকে উদ্ধার করতেন! দরজায় কোনও শব্দ হয় না, তবুও শব্দ হচ্ছে মনে করে আমি দরজা খুলতে নিলেই কুমুদ ফুপু হা হা করে তেড়ে আসেন।

—করছ কি করছ কি, কথা তো শেষ হয়নি।

—ফুপু আমি পানি খাব।

—পানি গোসলখানায় গিয়ে খাও।

ফুপুর আদেশে আমাকে স্নানঘরে ঢুকতে হয়, জল খাই বা নাই খাই। প্রাণ বাঁচে আমার দরজায় শব্দ শুনে, শাশুড়ি দরজা ধাক্কা দিচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন, কি বউমা কি করছ কি? দরজা বন্ধ কেন?

কুমুদ ফুপু দরজা খুলে বলেন, ভাবী একটু কি বউ-এর সঙ্গে কথা বলতে দিতে

চায় না! ঝুমুর লেখাপড়া জানলে কী হবে, বাস্তব জীবন সম্পর্কে ওর তো কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে তো উত্তরই দিতে পারে না। এ মেয়ের কপালে ভোগান্তি আছে ভাবী, বলে দিলাম।

শাশুড়ি টেনে নিয়ে গেলেন কুমুদ ফুপুকে।

রসুনিকে পাঠিয়ে আলাউদ্দিনের দোকান থেকে মিষ্টি এনেছেন। মিষ্টি খাবেন ফুপুরা, তারপর রাতের খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরবেন।

নির্জনতা সুযোগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগান দেখি, যদি আফজালের দেখা মেলে। এখনও আমার হাতে ওর স্পর্শ লেগে আছে। অন্ধকার একটু একটু করে জলের ফোঁটার মতো আমার গায়ে পড়তে থাকে আর মন চলে যায় নীচতলায়, আফজাল কার ছবি আঁকে। ওই নগ্ন নারীকে, যাকে ও বলেছে স্বপ্নের নারী, ভালবাসত কখনও? বৃষ্টিতে ওরা দুজনে ভিজেছিল কখনও। অবাক লাগে, আফজালের সঙ্গে আমার একদিনের আলাপ আর এর মধ্যেই আমি ঈর্ষা করতে শুরু করেছি ওর আঁকা ছবির মেয়েকে। ইচ্ছে করে, ভেতরে এই ইচ্ছেটি টুপ টুপ করে অন্ধকারে ফোঁটা পড়ার মতো আমার হৃদয়ে পড়ে, আমাকে নগ্ন করে আফজাল আমাকে দেখুক। ও কেন তাকিয়েছিল এক জলজ্যান্ত নারীকে সামনে রেখে ওই ছবির দিকে? ছবির মেয়েটির কী আছে যা আমার নেই? যদি পারতাম নিজেকে নগ্ন করে ছবিটির পাশ দাঁড় করাতে, দেখতাম আফজাল কাকে দেখে। শিল্পীর চোখ কোনও শরীরে তৃষ্ণার্ত তাকায় আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

অন্ধকারে একা ভিজতে থাকি। অন্ধকারে একা আমি ছবির মেয়েটির মতো ভিজি।

এরপর জানি না কে আমাকে স্নানঘরে নেয়, আমাকে সত্যিকার নগ্ন করায়। জলের তলে স্থির দাঁড় করিয়ে দেয়। কে যেন আমার চোখ আমার শরীরে ফেরায়, আনাচ কানাচের রুপোলি জলে হীরকখণ্ডের দ্যুতি, স্তনবৃন্তে দুফোঁটা জল ফেলে দেখায়, ছবির ওই মেয়েটির চেয়ে সুন্দর দেখতে লাগে কিনা দেখায়। আমি নই, অন্য কেউ আমাকে দেখায়। আমি নই, অন্য কেউ আমার ভেতরে টুপ টুপ করে জল পতনের মতো ঈর্ষার পতন ঘটায়। নিষ্প্রাণ একটি মেয়ের শরীরের সঙ্গে আমার এই রক্ত মাংসের শরীর এক অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে। এই অনুভূতিগুলোর আমি কোনও অনুবাদ জানি না।

১০

সেবতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় হয়। মনে হয় সেবতিকে আমি জন্ম থেকে চিনি, সেবতি আমার আত্মার আত্মীয় ছিল কোনও কালে। সেবতি কখন হাসপাতালে যাচ্ছে, কখন হাসপাতাল থেকে ফিরবে, কখন খাবে, কী খাবে, কখন ঘুমোবে, কখন বেড়াতে যাবে, প্রতিদিন আমি তার খবর রাখি। সেবতি মাছ রান্না করলে এক বাটি মাছ আমার জন্য নিয়ে আসে। আমিও যা কিছুই রান্না করি, এক

বাটি পাঠিয়ে দিই নীচতলায়। যেন পরস্পরের হাতের রান্না না খেলে আমাদের বদহজম হবে, এমন। আমাদের প্রতিদিন দেখা হওয়া চাই, প্রতিদিন আমাদের গল্প করা চাই যার যার জীবনের যত কিছু কথা আছে। দুজনের শৈশব কৈশোরের যত গল্প ছিল, সব বলা হয়ে যেতে থাকে। সব বলেও যেন ফুরোয় না। যেন চব্বিশ বছরের গল্প বলতে আরও চব্বিশটি বছর আমাদের প্রয়োজন। সেবতি বলে, আমি ছিলাম ঘরকুনো মেয়ে। ঘরে বসে কেবল ক্লাসের পড়া মুখস্ত করতাম, বিকেল হলেই মাঠে ছেলে-মেয়েরা খেলতে নামত, দেখতাম দূর থেকে, নিজে কখনও খেলায় নামিনি। আর এখন আমিই সারাদিনে ঘরমুখো হওয়ার সময় পাই না। তুমি ছিলে মাঠ ঘাট চষে বেড়ানো দস্যি মেয়ে, তুমিই এখন কুনো ব্যাঙের জীবন কাটাচ্ছ।

আমি ঠিক জানি না আমার এই কুনো ব্যাঙের জীবনটির জন্য সেবতির বড় মায়া হয় কি না। মায়া হয় বলেই কি ও আমাকে এমন করে বাইরের জগতের গল্প বলে! ওই জগত আমার কাছে খুব দূরের মনে হতে থাকে। যেন ওই জগৎটি আমার কখনও কোনওকালে চেনা ছিল না। যেন ওই জগৎটি এত দূরে যে কখনও আমি তার নাগাল পাব না। এই জীবনে না।

সেবতি আমাকে একসময় ভাবী বলত। ভাবী বলে ডাকে না আর, আপনি সম্বোধনটিও ঘুচিয়েছে। ঝুমুর। তুমি। আমিও সেবতি, তুমি। সেবতির কাছে হাসপাতালের রোগীর গল্প শুনতে শুনতে এমন হয়েছে আজকাল যে অনেক রোগীর কথা আমি নিজ থেকেই জিজ্ঞেস করি, আয়শার শরীর কেমন এখন, রুবিনার সেলাই কি শুকিয়েছে! যেন না দেখা আয়শা, রুবিনা, ফুলেরা, জ্যোৎস্না এরা আমার আত্মীয় কোনও। আয়শার একটি মেয়ে হয়েছিল, প্রথম মেয়ে, খবর শুনে আয়শার স্বামী মন খারাপ করে বাড়ি চলে গেছে, একবার মেয়ের মুখটি সে দেখতে ইচ্ছে করেনি। আয়শা মেয়ে কোলে নিয়ে দিনভর কাঁদে। রবিনার জরায়ুর নালীতে বেড়ে উঠছিল ভ্রূণ। ও নালী কেটে ফেলে দিতে হয়েছে, সেলাইয়ের পর ঘা হয়ে গিয়েছিল ত্বকে, সেলাই শুকোচ্ছিল না। ফুলেরার জরায়ু বেরিয়ে পড়েছে বাইরে, জ্যোৎস্নার এক্লামশিয়া, পেটের বাচ্চা মরে ভূত, জ্যোৎস্নাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সেবতি। এত রোগ আর রোগী নিয়ে সেবতি ভাবে, সেবতির ভাবনাগুলো আমার ভেতরেও সংক্রামিত হয়। আমার মনে হতে থাকে আমার পেটে বুঝি একটু একটু করে টিউমার বড় হচ্ছে। জরায়ুতে বুঝি ঘা হচ্ছে, বুঝি এটি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ছে বাইরে, জরায়ুর নালী বুঝি পেঁচিয়ে গেল—ভয় হতে থাকে আমার। ভয় যেমন নাছোড়বান্দার মতো আমার আঙিনা থেকে সরে না, কৌতূহলও আমাকে ছেড়ে নড়ে না। বিষম জানতে ইচ্ছে করে বিশ্রী বিশ্রী সব রোগগুলোকে কী করে সারায় সেবতি। কেবল রোগ আর চিকিৎসার কথা নয়, অসুখ হওয়ার, কন্যা জন্ম দেওয়ার, বাচ্চা না হওয়ার দোষের জন্য যে মেয়েগুলোকে স্বামীরা নির্দ্বিধায় তালাক দিচ্ছে, ওরা কেমন আছে?

ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেবতি তত ভাবে না যত ভাবে ওদের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে। আমার দুশ্চিন্তা হয় ওই দুর্ভাগা মেয়েদের জন্য। আমি অনুমান করি বাবার

বাড়ি ফেরত যাচ্ছে ওরা, ফিরে স্বস্তি পাচ্ছে না, পাচ্ছে না কারণ উঠতে বসতে ওদের শুনতে হচ্ছে গাল, পিঠে পড়ছে কিল চড়, ঘাড়ে পড়ছে ধাক্কা। ওয়ারিতে আমাদের পাশের বাড়িতে পারুলের জীবন দেখেছি, স্বামী তালাক দেবার পর বাপের বাড়িতে উঠল পারুল, দিন রাত গঞ্জনা সইতে হয় তার, আত্মীয় স্বজনরা বলতে শুরু করেছে পারুলেরই দোষ ছিল কোনও, তাই স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। অথচ পারুল নিজে আমাকে বলেছে, স্বামী অন্য এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে, সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে পারুলকে তাড়িয়েছে। পোড়াকপালি পারুল নিজের বাবার বাড়িতে বাড়ির কাজের লোকের মতো বেঁচে আছে। সংসারের কাজকর্মে পারুল খুব জোর করে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়, যেন সংসারে তার যে প্রয়োজন আছে, এ কথাটি অন্তত বাবা মা ভাই বোন স্বীকার করে। তালাক হওয়া মেয়েকে কোনও ভদ্রলোকই বিয়ে করতে রাজি হবে না, এ ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত পারুলের মা। বিয়ের আগে পারুলের জীবন, বিয়ের পর, আর তালাক হওয়ার পর—তিন রকম জীবন পারুল যাপন করেছে। তিন রকমের আচরণ সে মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে, একই পারুল।

এ অবদি যত মেয়ে দেখেছি আমি, এক সেবতি ছাড়া বাকি সবাই পুরুষের ওপর নির্ভর। এক সেবতির বাড়িতেই দেখেছি পুরুষমানুষ হয়ে সেবতির স্বামী রান্না করছে, ঘর গোছাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী দুজন বাইরে চাকরি করলেই যে স্বামী সংসারের কোনও কাজে হাত দেয়, তা নয়। নাদিরার বড় বোন আর তার স্বামী দুজনই ব্যাঙ্কে চাকরি করে, বিকেলে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে স্ত্রী যায় রান্নাঘরে, স্বামী সোফায় বসে টেলিভিশন দেখে। দুজনই সমান টাকা রোজগার করে, দুজনই সমান টাকা সংসারে খরচ করে। কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা সামলানো, ঘর দোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, পরিবেশন করা সব নাদিরার বোনকেই করতে হয়, তার ওপর করতে হয় চাকরি। এক সেবতির বাড়িতেই দেখি ব্যতিক্রম। এক দুপুরে ও বাড়িতে ঢুকে দেখি সেবতির স্বামী রান্না করে টেবিল গোছাচ্ছে, সেবতি ঘুমোচ্ছে। দেখে আমি প্রথম নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। সেবতি পরে বলেছিল, রাতের ডিউটি করে এসে ওর আর ইচ্ছে করে না রান্নাবান্না করতে, এই সংসারে আমিও যা, আনোয়ারও তা। তা হলে বল আমি কেন একা কাজ করব। সেবতির স্বামী আনোয়ার জার্মানিতে ছিল দু বছর, ওখানে নিজের রান্না নিজে করত, আনোয়ারের ভালও লাগে রান্না করতে। আমার ইচ্ছে করে হারুনের সঙ্গে আলাদা একটি সংসার করতে। হারুনের নিজের ব্যবসা আছে, আমি চাকরি করব, দুজনেই সংসারের কাজ করব, কেবল আমি একা নই। আমার কি সব সময় ভাল লাগে রান্নাবান্না করতে। মাঝে মাঝে আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় আমি যেভাবে রেঁধে বেড়ে হারুনকে খেতে ডাকি, হারুনও আমার জন্য রেঁধে বেড়ে আমাকে ডাকুক, আনোয়ার যেমন সেবতিকে ডাকে। হারুনকে বলেছিলাম আনোয়ারের রান্না করার কথা। শুনে সে বলেছে, ওই ব্যাটা একটা আস্ত মেয়েমানুষ। ওর পৌরুষ বলে কিছু নেই।

আমি ভাবছিলাম পৌরুষ থাকা মানেই কী রান্না না করা! রান্না করলে পৌরুষে

ঘাটতি পড়ে!

আনোয়ারকে হারুনের চেয়ে কম দীপ্ত মনে হয়নি আমার।

তোমার বান্ধবীর স্বামীকে বলো হাতে চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকতে। হারুন আনোয়ার প্রসঙ্গে আরও বলেছে।

আমি হেসেছি শুনে। অবশ্য ঠিক বুঝিনি হাতে চুড়ি পরার কথা ও মজা করে বলেছে, না কি সত্যি ও তাই মনে করে।

সেবতিকে আমার খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়। স্বামী নয়, শ্বশর শাশুড়ি নয়, দেবর ননদ নয়—আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে এক অনাত্মীয় পড়শি। হারুন এ কথা জানে না যে হারুনকে আজকাল আমি যা না বলি, বলি সেবতিকে। সেবতিকে সংসারে আমার যে ভীষণ একা লাগে, হারুনকেও বড় দুরের মনে হয়, তা বলি। সেবতি আমার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়েছে আমার সুখের দুখের সবকিছুর সঙ্গী হতে ও আছে। নিজের বাবা মা বোনকে আমি না চাইলেও বিয়ের পর দুরে সরাতে হয়েছে, দুরে সরাতে হয়েছে আরজু, সুভাষ, নাদিরা আর চন্দনার মতো চমৎকার বন্ধুদের। সেবতি যদি না ডাক্তার হত, সেবতি যদি না এ বাড়ির সবার অসুখে বিসুখে এমন না দাঁড়াত, তা হলে ওর সঙ্গে আমার মেলামেশাও হারুন পছন্দ করত না সম্ভবত। হাসানের দুর্ঘটনা ঘটার পর সেবতির প্রয়োজন এ বাড়ির সবাই হাড়ে-মজ্জায় অনুভব করেছে। এক বন্ধুর মোটর সাইকেল চালিয়ে সাভার যাচ্ছিল হাসান, পথে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে খাদে। পা ভেঙেছে, বুকের হাড়ও। সেবতিই হাসপাতালে ভর্তি করেছে হাসানকে। হাসপাতালে দেখাশুনা ও-ই করেছে। ডাক্তার বন্ধুদের দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। সেবা যত্ন চিকিৎসা কিছুরই এখন অভাব হচ্ছে না।

শাশুড়ির সঙ্গে গিয়ে আমি একদিন হাসানকে দেখে এসেছি হাসপাতালে। ওর মাথার কাছে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল রাণু। রাণুই বেশি সময় থাকে হাসানের কাছে। একবার ঘুরে আসার পর শাশুড়ি বলেছেন, তুমি বউমানুষ তোমার এত হাসাপাতালে দৌড়োদৌড়ি করে কাজ নেই। তুমি বরং বাড়িতে বসে নামাজ পড়ে কোরান পড়ে হাসানের জন্য দোয়া কর। হাসান সুস্থ হয়ে উঠুক এ আমি আর সবার মতো একই রকম কামনা করি। সে আমি কোরান পড়েও করি, কোরান না পড়েও।

প্রায় প্রতিদিন বিকেলে শাশুড়ি দোলনকে নিয়ে টিফিন বাক্সে খাবার নিয়ে ফ্লাস্কে গরম সুপ নিয়ে হাসপাতালে যান। রাণু হাসপাতালেই দিন রাত কাটায়। বিকেলে বিষম ফাঁকা লাগে পুরো বাড়ি। এর মধ্যে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে পাতালে নামার অভ্যেস রপ্ত করেছি। পাতালে সোনার কৌটোয় ভ্রমর লুকিয়ে আছে, কৌটো খুলে সেই প্রাণভ্রমরটি দেখি আমি। কেউ জানে না এ কথা। সেবতিও না। সেবতির সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ আড়চোখে আফজালকে দেখি, চোখে চোখে কথা হয় আমাদের। কোনও একদিন ও আমার

ছবি আঁকবে ভিন্ন ভিন্ন আলোয় সে কথা। কোনও একদিন—কবে সেই কোনও একদিন আসবে, সে আমি বা আফজাল কেউ যে জানি না। কিন্তু দিনটি একদিন আসবে, এরকম একটি আশায় দোলে দুচোখের তারা।

সেদিন সুনসান দুপুর। শ্বশুর গেছেন নোয়াখালি, শাশুড়ি, দোলন, দোলনের মেয়ে সুমাইয়া, রাণু, সব হাসপাতালে হাসানের কাছে। দোলনের স্বামী আনিস চট্টগ্রামে। হাবিব না বাড়িতে না হাসপাতালে, টই টই করছে কোথাও। হারুন আপিসে। বাড়িতে আমি আর রসুনি। রসুনি কাজ শেষে খাওয়া দাওয়া শেষে মেঝেয় লম্বা হয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখছিল। রসুনিকে বলি নীচতলায় যাচ্ছি সেবতির বাড়িতে। সেবতি বাড়ি নেই জেনেও আমি যাই। আমার প্রস্থান রসুনিকে বাড়ি জুড়ে একা রাজত্বের সম্ভাবনা দিয়ে যায়। রসুনি উত্তেজিত। ও এখন ইচ্ছে করলে কিছু কিছু নিষিদ্ধ কাজে অনায়াসে লিপ্ত হতে পারে, মেঝেয় শুয়ে টেলিভিশন দেখার পরিবর্তে সে দিব্যি সোফায় পা তুলে শুয়ে বা বসে দেখতে পারে। ও এখন বাড়ির সবচেয়ে নরম বিছানায় গড়াগড়ি খেতে পারে যতক্ষণ না দরজায় শব্দ হচ্ছে কারও আসার। রসুনিদের এতেই সুখ। গোপনে নরম গদির স্বাদ নেওয়া, খালি বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজেদের বিবিসাব ভাবা।

সেবতির বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না, দরজায় হাত ছোঁয়ালেই কিছুটা আমার হাতের, কিছুটা হাওয়ার স্পর্শে দরজা ধীরে সরে গেল। ভেতরে এক পা এক পা করে হেঁটে দেখি আফজাল খালি গা, পরনে একটি সাদা পাজামা বারান্দায় চেয়ারে বসে, রেলিং-এ পা তুলে দিয়ে বই পড়ছে। পেছনে আমি নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াই। আফজালের চোখ তখনও হিচাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সিতে। মনোযোগ নষ্ট করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকি পেছনে। কিন্তু হাওয়ায় আমার শাড়ির আঁচল উড়ে ওর বইয়ের ওপর পড়লে ও চকিতে ফিরে তাকায়।

—বাহ ওপরতলার বউ যে, কখন এলেন? বইটি হাতে নিয়ে আফজাল উঠে দাঁড়ায়।

—সেবতি নেই? সেবতির সঙ্গে একটু কথা ছিল।

—না সেবতির সঙ্গে আপনার কোনও কথা ছিল না।

—তা হলে এলাম কেন?

—এলেন সেবতি নেই বলে!

শরমে আমার চোখ নামিয়ে নখ খুঁটি, ফিরে দাঁড়াই যেতে।

পেছন থেকে আফজাল আমার হাত ধরে টানে ওর দিকে, আফজালের খোলা লোমঅলা বুকে চমৎকার ঘ্রাণ। আশ্চর্য, নিজেকে আমার সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। আমার হাত দুটো আফজাল দুহাতে তুলে ধরে।

—এত গয়না পরেন কেন?

—ওপরতলার ওরা পছন্দ করে বলে।

—ওরা যা পছন্দ করে, তাই বুঝি করেন?

—তাই তো করতে হয়।

দেখুন তো ওরা এটা পছন্দ করে কি না। বলে আফজাল আমাকে জড়িয়ে গাঢ় চুমু খেল ঠোঁটে।

আমার দুটো হাত আফজালকে ঠেলে সরাতে নেয়, আমার দুটো পা মাটি ছুঁতে চায়, শরীর আফজালের বেষ্টন হতে সজোরে মুক্ত হতে চায়। চুমুতে আমার অপ্রতিভ অবস্থা দেখার পরও আফজাল পাঁজাকোলা করে তুলে ওর নিজের ঘরে নিয়ে যায় আমাকে। দীপু ঠিক এরকম করে শিপ্রাকে তুলে আনন্দ করেছিল, যখন শিপ্রার বাচ্চা হবে খবর ও প্রথম শুনেছিল। আফজালের দু বাহুতে আমার শরীর শিথিল হতে থাকে। আমি না চাইলেও আমার দু হাত আফজালের গলা জড়িয়ে ধরে। ওকে ঠেলে দেবার, সরিয়ে দেবার কোনও শক্তি আমার আর তখন থাকে না। যেন এ আমি নই, আমি হারুনের বউ নই, আমি ঝুমুর নই, আমি শিপ্রা। আর আফজাল কোনও নীচতলার লোক নয়, সেবতির দেবর নয়, ও দীপু। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেয় আফজাল, আমার আঁচল খসে পড়েছে, চুলের বাঁধন খসেছে, আমি চোখ বুজে থাকি লজ্জায়। বাসরঘরের শিপ্রা চোখ খোলে না শরমে। দীপুর কাছেই তার শরম। দুটো বোজা চোখের পাতায় আফজাল চুমু খায়, চোখ ধীরে ধীরে গোলাপের কুড়ি যেমন ধীরে ফোটে, তেমন করে ফোটে। ফোটা চোখ দেখে সামনে ঝুলছে নগ্ন নারী, সেই স্তনবৃন্তে জল নারী। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে আফজালের মুখ, যেন আমাকে এই প্রথম দেখছে ও, আমার চুলে কপালে নাকে ঠোঁটে আঙুল—পালকের মতো আঙুল ছোঁয়াচ্ছে ও। এমন করে হারুন কখনও তো আমাকে ছোঁয় না।

—কী দেখছেন? আফজাল জিজ্ঞেস করে।

—মেয়েটি কে?

আফজাল আমার চোখে তাকিয়ে বলে, ওই ছবির মেয়েটি তো! ওর নাম সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনাকে বলেছিলাম ওইখানে যেও না। সুরঞ্জনা তবু চলে গেছে। চলে গিয়ে অন্য এক যুবকের সঙ্গে কথা বলেছে।

—তারপর?

—তারপর যুবক তাকে নগ্ন করেছে।

—তারপর?

—তারপর চুমু খেয়েছে এভাবে। বলে আফজাল আমার চিবুক তুলে ধরে আমাকে চুমু খায়।

—তারপর?

—তারপর সুরঞ্জনাকে নিয়ে যুবকটি অনেক দূরে পালিয়ে গেছে।

—কত দূরে?

—যত দূরে হলে আমি তার নাগাল পাব না কোনওদিন।

—কত দূরে সে দূর?

—সাত সমুদ্দুর তেরো নদী।

আমি যখন প্রশ্ন করছি আর আফজাল উত্তর দিচ্ছে, যেন ঠিক এই জগতে

দাঁড়িয়ে ও কথা বলছে না। আমরা অর্থহীন শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে, আসলে যেন গোলাপ ছুড়ছি। অথবা সমুদ্রে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ঢেউ-এর শরীর থেকে আঁজলা ভরে জল তুলে ছুড়ে দেওয়ার খেলা খেলছি। এ খেলায় কারও হার নেই, জিৎ নেই। এ খেলা অদ্ভুত এক আনন্দ দেয়। পালকের স্পর্শ আমার চিবুকে, চিবুক থেকে গলায়, বুকে।

এই দৃশ্যকে আমার মনে হয় না আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনও দৃশ্য। শিপ্রাকে নিশ্চয়ই ঠিক এভাবেই স্পর্শ করে দীপু। ঝুমুর বিলীন হয়ে যেতে থাকে শিপ্রায়। স্পর্শগুলো চোখ বুজে অনুভব করি, মনে হতে থাকে আমি এক সেতার, স্পর্শমাত্র বেজে উঠছি নানা সুরে। আমি ভেবে অবাক হই, আমি এক রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে, ততোধিক রক্ষণশীল ঘরের বউ, এ কি করে সম্ভব যে ঘরে সক্ষম স্বচ্ছল স্বামী থাকা সত্ত্বেও আমি অপর পুরুষের স্পর্শে আনন্দিত হই! কোথায় গেল এত কালের সংস্কার।! বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হই চই করে বিশ্ববিদ্যালয়ে একরকম বাঁধনছাড়া জীবন কেটেছে বটে, কিন্তু সংস্কার তো ছিলই, সংস্কার রক্তে মিশে ছিল বলে চব্বিশ বছর নিজেকে পুরুষসম্ভোগহীন রেখে যোগ্য করেছি যেন একটি আপন পুরুষ বাসরশয্যায় আমার এই অনাঘ্রাতা শরীর পেয়ে শরীরে ও মনে তৃপ্ত হয়। সংস্কার তো আমার ছিলই যে স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকানো অন্যায়। না এ আমি অন্যায় কিছুই করছি না, না, এ শুধুই মনের বিভ্রম, অথবা স্বপ্ন, অথবা রূপকথার গল্প পড়ছি—গভীর অরণ্যে কোনও এক রাজকুমার কোনও এক রাজকুমারীর দেখা পেয়েছে, দুজন হাতে হাত রাখছে, ভালবাসছে। এ ঘটছে না, আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছি, ঘুম থেকে জেগে উঠব শাশুড়ির ডাকে, বেলা তো হল বউমা, রান্নাবান্না কী করতে হবে করো শিগগিরি।

—কেন এসেছেন এখানে ঝুমুর?

ঝুমুর নামটি শুনে চমকে উঠি। এ আমি ঝুমুর, আমি শিপ্রা নই, আমি ওপরতলার বউ।

—জানি না। গলা কাঁপে আমার।

—সত্যি জানেন না?

বিছানা থেকে তড়িতে উঠে আমি ভাঙা স্বরে বলি, আমার ছবি আঁকবেন বলেছিলেন..., তাই।

—আমি তো নগ্ন মেয়ের ছবি আঁকি। আফজালের চোখে ফোঁটা ফোঁটা মাদকতা। কণ্ঠেও।

আমার মৌনতা আফজালকে সাহসী করে তোলে নাকি ও জন্ম থেকেই সাহসী আমার বোঝা হয় না। আমার কিছু বুঝতেও ইচ্ছে করে না। আফজাল আমার ঠোঁটে, চিবুকে, কণ্ঠদেশে, বুকে চুমু খেতে খেতে শাড়ির বাঁধন থেকে আমাকে মুক্ত করতে থাকে, আমার সংস্কারের বাঁধন থেকে। দ্রুত। আমার নির্জীব হাতদুটো ধীরে ধীরে উঠে আসে আফজালের পিঠে, খোলা পিঠে। পিঠ থেকে চুলে, আঙুলগুলো চুলের ভেতর হাঁটে, চুল থেকে কপাল নাক না-কামানো গাল ঠোঁট

চিবুক পেরিয়ে বুকের অরণ্যে হারিয়ে যায়। এ নির্ভুল প্রশ্রয়, এর অনুবাদ আফজাল চাইলে শুনতে পারে, তুমি যা করছ তা আমার ভাল লাগা উচিত নয়, কিন্তু ভাল লাগছে আমার। আরও ভাল লাগছে আফজাল একবারও ছবির ওই নগ্ন মেয়েটির দিকে তাকায়নি বলে। কি ঈর্ষাই না হয়েছিল, আর কি অকিঞ্চিৎকর পড়ে আছে ওই মেয়ে। আফজাল বিন্দু বিন্দু অমৃত ঝরাতে থাকে আমার গায়ে, গোপনে আমি ভিজে উঠতে থাকি। আমি বারবার নিজেকে বলতে থাকি—না, এ আমার শ্বশুর বাড়ির নীচতলায় কোনও অল্প চেনা পুরুষ নয়, এ আমার স্বপ্নের পুরুষ, এই পুরুষস্পর্শের জন্য আমি আজন্ম অপেক্ষা করেছি। গহন অরণ্যের আড়ালে এক স্বচ্ছ জলের নদী, সেই জলে আমাদের গভীর গোপন অবগাহন। আমরাই কেবল পৃথিবীর সন্তান, আর কেউ কোথাও নেই। কেউ আমাদের মগ্নতা ভাঙতে আসবে না, কেউ আমাদের অতল নিস্তব্ধতায় একফোঁটা জলপতনের শব্দও করবে না।

এক তুখোড় শিল্পী আমাকে আঁকে, হৃদয়ের সমস্ত রং দিয়ে আঁকে, শরীরের সহস্র তুলিতে আঁকে। ওর শরীরের আলো ভোরের সূর্যকিরণের মতো আমার শরীরে পড়ে, সেই আলোর খেলা ও আঁকে। শিল্পীর আঁকা নিজের ছবিটির দিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হই, এত রূপসী আমাকে কখনও দেখতে আগে লাগেনি।

ফোনের শব্দে চেতন ফেরে, আলুথালু শাড়ি, খোঁপা ভাঙা চুল অপ্রকৃতস্থের মতো সামলে সেবতির বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠি। রসুনি দরজা খুলে দেয়, কেউ ফেরেনি বাড়িতে।

একটি কথা না বলে সোজা স্নানঘরে ঢুকি, ঝরনা ছেড়ে দিয়ে ওই শাড়ি কাপড় পরেই ঠাণ্ডা জলের তলে দাঁড়িয়ে থাকি। ঝরনার জল আমার চোখের জল ধুয়ে দিতে থাকে। ধুয়ে দেয় সব রং, শিল্পী যত রঙে রাঙিয়ে ছিল আমাকে। স্নিগ্ধ শুদ্ধ হয়ে বেরোই স্নানঘর থেকে, কিন্তু টের পাই জলে সব রং ওঠে না, থেকে যায় কিছু, লেগে থাকে। এ কি হল আমার জীবনে! অপরাধী কে? আমি না আফজাল! না কি এ কারও অপরাধ নয়, নেহাতই দুর্ঘটনা! না কি অপ্রতিরোধ্য আবেগ, মোহ! না কি ভালবাসা! আমার কিছুই বুঝে ওঠা হয় না।

চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়।

রাতে হারুন ফিরলে খেয়ে দেয়ে যখন সবে শুয়েছে, আমি ম্লান কণ্ঠে বলি, কিছুদিনের জন্য আমি ওয়ারি যেতে চাই।

—কেন, ওয়ারিতে কী কাজ?

—কিছু কাজ নেই, এমনি।

হারুন উঠে বসে, কর্কশ স্বরে বলে, কাজ নেই তো খামোকা যাবে কেন? তোমার আক্কেল কবে হবে, শুনি! হাসান হাসপাতালে, বাড়ির কে আছে স্বস্তিতে বল! এ সময় তুমি ফুর্তি করতে ওয়ারি যেতে চাও, আমাদের এত অসুবিধেয় ফেলে? কেবল নিজের দিকটাই দেখছ! এ সংসারটাকে, আশ্চর্য, তুমি আপন ভাবতে পারছ না কিছুতেই!

জানালার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার অশ্রু-পতনের শব্দ হারুন

শোনে না। শুয়ে কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে ধমকে ওঠে চাপা স্বরে, কী ব্যাপার ওখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বিছানায় এলে হারুন আমার কাপড় চোপড় পরা শরীরের ওপরই চড়ে বসে, পরনের শায়াটি ওপরে তুলে দ্রুত সঙ্গম সারে। সেরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, একটি বাচ্চা আমার চাই, একটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা।

আমি ম্লান কণ্ঠে বলি, তোমার বাচ্চা চাই, প্রতিরাতে তাই আমাকে চাই তোমার, তাই বুঝি তুমি আমাকে যেতে দাও না!

হারুন দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ওয়ারি যাওয়ার নাম করে বন্ধু নামের একশো একটা ছেলের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে চাইছ তো। তা আমি হতে দেব না।

স্থবির পড়ে থাকি পাশ ফিরে। আফজালের সঙ্গে ওই সম্পর্কটুকু ঘটে যাওয়ার জন্য যে গ্লানিটুকু ছিল, যে অপরাধবোধ, তা লক্ষ করি, মেঘের মতো সরে যাচ্ছে দূরে।

১১

হাসানের দুর্ঘটনার পর হারুন আগের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হচ্ছে চিকিৎসায়। আপিসের পর সে হাসপাতালে ভাইকে দেখে পরে বাড়ি ফেরে। দুপুর বা বিকেলের দিকে বাড়ি খালিই থাকে। সেবতির বাড়িতে আফজাল ছাড়া আর কেউ থাকে না তখন। সেবতি হাসপাতাল থেকে ইদানীং রাতে ফেরে। ওদের কাজের লোক সকালে এসে ঘর দোর ঝেড়ে মুছে, মশলা বেটে, কাপড় ধুয়ে চলে যায়। আনোয়ারের ফিরতে দেরি হয়। নীচে আফজাল একা, ওপরে আমিও। অবশ্য বাড়ি ভর্তি লোক থাকলেও আমি একাই বোধ করি। আর একাকিত্ব ঘোচাতে আমি আফজালে আচ্ছন্ন হই। পরদিন। তার পরদিনও।

শ্বশুরবাড়ির একটি প্রাণীও ধারণা করতে পারে না কী ঘটে যাচ্ছে ওপরতলায় নীচতলায়। নীচতলায় আমি সেবতির কাছে মাঝে মধ্যে যাই, তা বাড়ির অন্যরা জানলেও হারুন জানে না। আমাকে ঘরবন্দি করে সে তৃপ্ত। তৃপ্ত তুষ্ট মন তার। আমার এই গোপন অভিসারের কথা হারুনের সাধ্য নেই অনুমান করে। ঘোমটা মাথায় পান থেকে চুন না খসানো এ বাড়ির সতী সাধ্বী বউ আমি। আমার জরায়ুতে অন্য পুরুষের বীর্যের ঘ্রাণ হারুন পায় না, যখন সে সতীত্বের খাঁচায় পুরে ঘ্রাণ নিচ্ছে মনে করে কেবল আমারই, কোনও সুভাষের নয়, কোনও আরজুর নয়। ঘ্রাণ নিতে নিতে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে রাতে, এর অর্থ আমাকে এখন তার প্রয়োজন, কারণ একটি সন্তানের সাধ তার। হারুনের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি বলি, ধুৎ।

—ধুৎ কেন?

—ভাল লাগছে না।

—কেন?

—ঘুম পাচ্ছে।

—পরে ঘুমিও। এত কি তাড়া!

—শরীর ভাল লাগছে না।

—হয়েছে কী?

—তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

—তাতে কী, আমি সাবধানে করব।

—না।

এই প্রথম আমি হারুনকে ফিরিয়ে দিই। ফিরিয়ে দিয়ে, হারুন যখন পাশ ফিরে শোয়, মনে মনে বলি, আমার সারা শরীরে এখন অন্য একজনের স্পর্শের দাগ। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। সেই স্পর্শের কোনও স্মৃতি তুমি মলিন কোরো না। তোমার বউ এখন সত্যি সত্যি দ্বিচারিণী হচ্ছে। যা তুমি অনুমান করতে, ঠিক তা। এখন যা অনুমান কর না, তা। হারুনকে সম্ভোগে বাধা দিয়ে আমার অদ্ভুত এক স্বস্তি হয়।

চারদিন একটানা আফজালের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর হঠাৎ এরকাশ আশঙ্কা ফণা তুলে আমাকে ছোবল দিতে আসে। বিবর্ণ হতে থাকি। ওর সঙ্গে মিলন আমাকে গর্ভবতী করে যদি!

তরকারিতে নুন দিতে ভুলে যাই, ভাত পুড়ে যায়। অস্থির মনকে প্রতিদিন স্থির করতে চেষ্টা করি। শান্ত করতে চেষ্টা করি, শীতল করতে। নিজের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন চলে। হারুনকে তুমি ভালবাস ঝুমুর। বাসো না কি? বাসি। হারুনকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে কি? চেয়েছিলাম।

কেন, ভালবাস বলে তো! হ্যাঁ ভালবাসি বলে। এখন কি হারুনকে আর ভালবাস না? ঠিক বুঝি না।

নাকি ভালবাস আফজালকে? বুঝি না। এর নাম ভালবাসা কি না ঠিক বুঝি না। আফজালের সঙ্গে গোপন ওই শরীরী সম্পর্কটুকুর কারণ ভালবাসা কি না বুঝতে না পারলেও টের পাই আফজালের জন্য আমার এক মোহ কাজ করে। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করি কাকে আমি ভালবাসি। উত্তর জানি না আমি। এই উত্তর না জানা আমাকে ভোগায়। ভালবাসলে কেন আমি হারুনকে ত্যাগ করে আফজালের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি না! আফজালকে আমার বিশ্বাস হয় না। অন্য যে কোনও নগ্ন নারী পেলে ও এমনই মগ্ন হবে, মন বলে। শিল্পী-মন কখনও পোষ মানে না, মন বলে। একটি অবৈধ সম্পর্কে যাওয়ার কী এত প্রয়োজন আমার! আমি কি ইচ্ছে করলেই হারুনকে নিয়ে, কেবল হারুনকে নিয়েই সুখী এবং তৃপ্ত হতে পারি না। পারি, মন বলে।

দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী এক অনিশ্চিত অস্থিরতায় আর যন্ত্রণায় ভুগে আমি বুঝি

যে আফজালকে নয়, আমি হারুনকেই ভালবাসি। বোঝার পর এক দুপুরে ঠাণ্ডা জলে গায়ের ঘাম বীর্য দূর করতে করতে সিদ্ধান্ত নিই যে আমি আফজালের বীর্য থেকে গর্ভবতী হব, হারুনের বীর্য থেকে নয়। ঋতুস্রাবের পর দশম থেকে ষোড়শ দিন গর্ভবতী হওয়ার দিন, সেবতি আমাকে বলেছে অনেক। সিদ্ধান্ত নিই দশম থেকে ষোড়শ—এই সাতটি দিন হারুন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব, বাকি দিনগুলো সে আমার শরীরে বীজ বপন করবে তার সন্তানের। না, হারুনকে আমি আমার উর্বর জমি দেব না। সে রাতভর উলুবনে তার মুক্তো ছড়াবে। তারপর বসে থাকবে আশায় আশায়, সন্তানের আশায়। সুভাষের নয়, আরজুর নয়, তার নিজের সন্তানের আশায়। এই সিদ্ধান্তের জন্য আমার ভেতর কোনও পাপবোধ জাগে না। বরং মনে হয় আমি হারুনকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তার প্রাপ্য। এর নাম প্রতারণা নয়, ব্যভিচার নয়। স্বামীর প্রাপ্য বলতে সে যা বোঝে, সংসারে দিনের পর দিন আত্মীয়হীন বন্ধুহীন জীবন কাটানো, স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের তুষ্ট রেখে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ প্রাণীতে পরিণত করা—আমি করেছি তা। সাধ করে না হয় তার জন্য আরও একটি প্রাপ্তি ঘটালাম।

সিদ্ধান্তটি নেওয়ার দুদিন পর মা আমাকে ফোনে অনুরোধ করেন ওয়ারি যেতে। নূপুরের মেয়ের জন্ম-উৎসব হবে, ও ওয়ারিতে এক সপ্তাহ থাকবে মেয়ে নিয়ে, এ সময় আমিও যেন পরিবারের সবার সঙ্গে কদিন কাটাই। আমি মাকে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছি, যাব না। কেন নয় মা প্রশ্ন করেছেন, বলেছি আমার ইচ্ছে হচ্ছে না যেতে, ব্যাস। কেন ইচ্ছে হচ্ছে না মা জানতে চেয়েছেন। আমি কোনও উত্তর দিইনি। মা সম্ভবত ভেবেছেন হারুনের কাছে আবদার করলে কাজ হবে। তিনি বাবাকে পরদিন পাঠিয়েছেন হারুনের আপিসে। হারুনের সঙ্গে বাবার কথা হওয়ার পর সেদিন সন্ধেয় ফিরে হারুন বলেছে, যদি যেতে চাও বল, সাতদিন তো সম্ভব নয়, জন্মদিনের দিন না হয় যাও। আমি না বলেছি হারুনকে।

—এত করে বলছে যখন, জন্মদিনটা না হয় করেই এসো। একা যাওয়ার কথা বলছি না, সঙ্গে আমি যাব।

—না। নূপুর গতবার তার মেয়ের জন্মদিনে তো বলেনি, হঠাৎ এ বছর আমাকে তলব করা কেন!

হারুন ভেবে নেয় নূপুরের ওপর রাগ করে আমি ওয়ারি যাচ্ছি না।

ভেতরে ভেতরে হারুন একধরনের স্বস্তি পায়, বুঝি। আমার বাবা মা বোনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিকে হোক, এ যে সে চায়, আমার চেয়ে বেশি কে বোঝে তা। পরদিন শাশুড়ি আমাকে কুমুদ ফুপুর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি যাব?

হারুন বলে, নিশ্চয় যাবে। মা নিয়ে যাবেন, যাবে না কেন?

ঘোমটা মাথার লক্ষ্মীবউ কুমুদ ফুপুর বাড়ি বেড়িয়ে আসে।

নূপুর মন খারাপ করে, বাবা মাও অসন্তুষ্ট আমি যাইনি বলে। ঝুমুর বদলে

গেছে, ঝুমুরের কাছে এখন শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই আপন, আমরা কিছু নই, কেউ নই বলে মা বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেছেন। বাবা নিজের ঘরে বিষণ্ণ বসে থেকেছেন। নূপুর মেয়ের জন্মদিনে মেয়ের গালে কষে এক চড় লাগিয়েছে, মন ভাল ছিল না তার। এ সব পারুল আমাকে ফোনে জানায়।

—তুমি এই ফোন নম্বর পেলে কোথায় পারুল আপা?

—নূপুরের কাছ থেকে নিয়েছি।

—ওরা কি বলেছে ওদের মন খারাপের কথা যেন তুমি আমাকে জানাও?

—না তা না। নূপুর আমাকে মোটে দিতে চাইছিল না নম্বর, আমি নিয়েছি নানা কথা বলে টলে।

—কী বলে নিলে?

—বললাম বেচারিকে কতদিন দেখি না, এই ঢাকাতেই আছে কিন্তু মনে হয় যেন দিল্লি বোম্বাই কোথাও চলে গেছে। গলার স্বরটা একদিন শুনলেও ভাল লাগত।

—বেচারি বলছ কেন আমাকে? তুমি কি মনে কর আমি ভাল নেই, সুখে নেই!

—না, তা মনে করব কেন! তোমরা পছন্দ করে বিয়ে করেছ। নিশ্চয়ই সুখে আছ।

—তা তো আছিই। স্বামীর সঙ্গে সুখের সংসার করছি আমি। হারুন আর আমি দুজনই এখন বাচ্চা চাইছি। এ সময় আমরা দুজনের কেউ চাই না দুজন থেকে দূরে থাকতে। আর বিয়ের পর বাপের বাড়িতে অত যাওয়া আসা করার দরকারটা কী বল!

—বাপের বাড়িতে একদিনের জন্য এলে কি তোমার বাচ্চা হবে না? পারুল হেসে ওঠে।

—হবে পারুল আপা। হবে নিশ্চয়ই। হবে না কেন? কিন্তু বাপের বাড়িতে গেলে মার মুখ দেখলে নিশ্চয়ই আমার মেয়ে হবে। মার তো ছেলে জন্ম দিয়ে অভ্যেস নেই। কাউকে বোলো না, এ সময় কোনও অপয়ার মুখ দেখা ঠিক নয়। জন্ম দিলে আমি ছেলে জন্ম দেব, মেয়ে নয়।

—বলছ কী ঝুমুর, তোমার মুখে এমন কথা শুনব আশা করিনি।

—আমি কী ভুল কিছু বললাম?

—তুমি নিজের মাকে অপয়া বলছ? এমন মা কোথায় পাবে তুমি? বাপের বাড়ির চেয়ে আপন আর কোনও বাড়ি আছে! পারুলের কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ছিটকে ওঠে।

—বাহ বাহ পারুল আপা। বেশ শোনালে। বাপের বাড়িতে তো আছ। কেমন আপন লোক ওরা তোমার, বলো তো! নিজের বাপের বাড়িতে গতর খেটে খাচ্ছ। এখনও বোঝো না কোন বাড়ি আপন? আর যাই বল, বাপের বাড়ির সুনাম করা তোমাকে মানায় না।

পারুল চুপ হয়ে যায়। ওদের বাড়িতে ফোন নেই, কোনও এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করেছিল আমাকে, ও-বাড়ি থেকে বেশিক্ষণ কথা বলার সুযোগ ছিল

না ওর। পারুলের চুপ হয়ে থাকার মধ্যে আমি শব্দ করে ফোন রেখে দিই। রেখে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ জল ছিটোই মুখে। যত প্রলেপ আছে, যত ঘাম, যত জল—দূর করতে।

আমি জানি পারুল আজই নূপুরকে জানাবে আমি যা যা বলেছি। যে যা বলুক, তবু আমি চাই না আমার কোনও আত্মীয় বন্ধু আমার খোঁজ নিক। চাই না কেউ এ বাড়িতে আসুক, কেউ চিঠি লিখুক আমাকে বা ফোন করুক। আমি সুযোগ দিতে চাই না কোনও বীর্যকে ফোনের রিসিভারের মধ্য দিয়ে, বা আমাকে দেখতে আসা কারও গা থেকে, বা আমাকে পাঠানো কোনও চিঠি থেকে উঠে আমার যৌনাঙ্গে প্রবেশ করার। ব্যাস। সাফ কথা, সোজা কথা। এতে কেউ আমার ওপর রেগে আগুন হোক, দুঃখে কাঁদুক, মেয়ের গাল চড়িয়ে রক্তাক্ত করুক—আমার কিছু যায় আসে না।

হাসানকে ঢাকা মেডিকেল থেকে নিয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুকের হাড় ঢুকে গেছে ফুসফুসে। আরও একটি অপারেশন দরকার। সেবতি নিজে ওকে পিজিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। ওখানে সার্জারির বড় প্রফেসরকে দিয়ে অপারেশন করাবে। শ্বশুর শাশুড়ি এমনকী হারুনও এখন সেবতির খোঁজ করছে দু বেলা। ওকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো, ওর জন্য ভাল একটি শাড়ি কেনা ইত্যাদি। সেবতির আদর দেখে আমার পুলক লাগে।

শাশুড়ি নিজে নীচতলায় গিয়ে সেবতিকে তুমি আমার নিজের মেয়ে মতো সেবতি বলে অনুরোধ করে এলেন যেন ও অপারেশনের দিন সারাদিন পিজিতেই কাটায়। সেবতি কথা দেয়, সে তার সাধ্য কেন সাধ্যের বাইরেও যা আছে করবে হাসানের জন্য।

শাশুড়ি যখন খুশিতে গদগদ, সেবতি বলে আমাকে যেন তিনি ওর কাছে পাঠিয়ে দেন, নতুন আসবাব কিনেছে ও, আমি যেন বাড়ি সাজাতে ওকে সাহায্য করি।

শাশুড়ি হাসিমুখে আমাকে খবর দিলেন, যাও বউমা তোমার বান্ধবী তোমাকে ডাকছে।

আমি বেশ গটগট করে নীচে নেমে এলাম। ইতিউতি তাকাতে হয়নি, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অন্যদিন যেমন বুক খানিকটা হলেও কাঁপে, কী জানি কী হয় ভেবে, সেদিন আমি দিব্যি ফুরফুরে। হারুন ফোনে আমার খবর নিতে চাইলে শাশুড়ি বলে দেবেন, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন নীচতলায় সেবতির কাছে। সেবতি এখন যদি বলে আজ সারাদিন ঝুমুর আমার সঙ্গে থাকুক, তারা রাজি হবে। এমনকী এও যদি বলে আজ রাতটা ঝুমুর এ বাড়িতেই থেকে যাক, কেউ না বলবে না। হারুনের চৌদ্দগোষ্ঠীতে কেউ ডাক্তার নেই, যে সব বন্ধুরা ডাক্তার তাদের কেউই ঢাকার কোনও হাসপাতালে নেই। সুতরাং সেবতিই ভরসা। সেবতিই মা বাপ।

ওর বাড়িতে একগাদা আসবাবপত্র জড়ো করা। আনোয়ার এন জি ও-র শাখা

খুলছে কুমিল্লায়, সুতরাং ওখানে ব্যস্ত। আফজাল ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদেশি দূতাবাসগুলোয় বৃত্তি পাওয়ার কোনও সুযোগ আছে কি না, দেখতে।

সেবতি বলে, আমার এই দেবরটাকে নিয়ে পারি না বুঝলে। সারাদিন ন্যাংটো মেয়ের ছবি আঁকে। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে লজ্জায় পড়ি।

ও দ্রুত আড়াল করতে থাকে বারান্দায় পড়ে থাকা আফজালের আঁকা ছবি। নতুন নগ্ন নারী, কে এ?

পিঠে এলিয়ে পড়া কালো দীঘল চুল, দিঘির জলের মতো দুটো কালো চোখ, সুগোল স্তন—লাজ রাঙা মুখটি কার? আমার নয় তো! উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুকোয়।

সেবতির সঙ্গে ঘর সাজানোর কাজে হাত দিই। কোথায় ছোট টেবিল, কোথায় বড়, কোথায় ফুলদানি, বারান্দায় বেতের চেয়ার নাকি অন্য কোথাও, ফুলের টবগুলোই বা কোথায় রাখলে ভাল দেখাবে, এসব। এসব করতে করতে কথা হয় আমাদের। সেবতি ওর গভীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে গিয়ে বলে, আনোয়ার ওকে কোনও যৌন আনন্দ দিতে পারে না। বিয়ে করেছে ভালবেসে, বাবা মার অমতে অনেকটা। বাবা মা চেয়েছিলেন সেবতি ওর মতো ডাক্তার কোনও ছেলেকে বিয়ে করুক। ও ভালবাসার মূল্য দিয়েছে। আনোয়ার সুপুরুষ, সুদর্শন, অমায়িক ভদ্রলোক। ডাক্তার যে টাকা রোজগার করে, আনোয়ার তার চেয়ে কম করে না। তবে আনোয়ারকে ফিরিয়ে দেওয়া কেন? কিন্তু বিয়ের পর প্রথম রাত থেকে ও দেখছে আনোয়ার যৌনঅক্ষম এক যুবক। স্বামীকে যৌনরোগের ডাক্তার দেখিয়েছে, এমনকী মানসিক রোগের ডাক্তারও। কিছুতে কোনও ফল পাচ্ছে না ও।

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে রাতে আনোয়ারের পাশ থেকে উঠে আফজালের বিছানায় গিয়ে ঘুমোই।

সেবতি বলে।

আমি চমকে উঠি।

সেবতি বলে যায়, কী কী সব উলঙ্গ মেয়ের ছবি আঁকে ও। দেখে কেমন যেন লাগে। ইচ্ছে করে ওর সামনে উলঙ্গ হই, ও আমাকে দেখুক। আমাকে সুখ দিক।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিই সেবতি থেকে।

কোনও শব্দ পাই না কিছু বলার।

চোখের সামনে ঝলমলে উজ্জ্বল সেবতি আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে।

আমার সাহস হয় না একটি হাত ওর পিঠে রাখতে। একটি স্নেহের সান্ত্বনার হাত।

সেবতি ফুঁপিয়ে বলতে থাকে, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমি খুব খারাপ মেয়ে। নিজের দেবরের সঙ্গে শুতে চাইছি।

আমার বলতে ইচ্ছে করে, না সেবতি আমি মোটেও ভাবছি না তুমি খারাপ মেয়ে। বলা হয় না।

ও ধরা গলায় বলে, তোমাকে আমি সবচেয়ে আপন ভাবি, বড় কাছের এক বন্ধু

ভাবি। তাই তোমার কাছেই বলতে পারছি পুষে রাখা কষ্টগুলো।

সেবতি তখন চোখ মুছে ফুলের টবের মাটি নাড়তে থাকে। অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই কোনও। আমি বলি, তা হলে আনোয়ারকে ছেড়ে তুমি কেন আফজালকে বিয়ে করছ না!

—আফজালের মনে কে আছে, কি আছে, কে জানে। আমি চাইলেই ও আমাকে বিয়ে করবে কেন! মনে হয় ও কাউকে ভালবাসে।

—কাকে?

—সে জানি না, সেবতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আনোয়ার প্রায় রাতে বড় দেরি করে ফেরে। আমি বেশ কদিন পাতলা জামা পরে আফজলের ঘরে গিয়ে বসেছি, গল্প করেছি। কিন্তুও চোখ তুলে তাকায় না আমার দিকে। কাছে বসলেই ও বলে, ভাবী ঘুমোও গিয়ে অনেক রাত হল।

আমার দম বন্ধ হয়ে থাকে। জানি না সেবতিকে কি উপদেশ দেব এ মূহূর্তে।

সেবতি বলে আনোয়ারের যন্ত্রণার কথা। দেখে ওর মায়া হয়। কিন্তু কী করবে ও! দুজন বন্ধুর মতো, অথবা ভাই বোনের মতো প্রতিরাতে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। এভাবে হয় না। সেবতি বারবারই বলে, এভাবে হয় না।

সেবতি সেদিন নিজের বিছানা আলাদা করে আলাদা ঘরে নিল। এর মানে, ও বলল, আনোয়ারের সঙ্গে তার কোনো ঝগড়া হয়েছে তা নয়। স্বামীকে সে ভালবাসে। তবে ঘুমের ওষুধ খেয়ে সেবতি ঘুমোতে চায়, ঘুমোতে চায় একা।

১২

আফজালের সঙ্গে মাসের সাতদিন আমার সম্পর্ক হয়েছে। সে দিনগুলোয় হারুনকে বলেছি আমার শরীর ভাল লাগছে না, পেট ব্যথা হচ্ছে, মাথা বনবন করছে, ঘুম পাচ্ছে এসব। সাতদিন আমি হারুনকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দিই না। সাতদিন পার হলে মরার মতো শুয়ে থাকি, হারুন আমাকে এক রাতে যত ইচ্ছে গ্রহণ করে, একেবারে তুষ্ট না হলে দুবার, দুবারে না হলে তিন চার পাঁচ—যতবার খুশি। হারুন প্রাণপণে আমার শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করতে থাকে। বীর্যের প্লাবন বয়ে যায়। আমাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয় না সে, স্নানঘরে যেতেও না।—ধুয়ো না কিছু, এভাবেই শুয়ে থাকো। তার ভয় আমি গা ধুলে কিছু না আবার জলের সঙ্গে চলে যায়। মনে মনে হাসি আমি।

—ঠিক আছে, শুয়ে থাকছি।

—এ মাসে নিশ্চয়ই কোনও খবর পাব, কী বল!

হারুন মিষ্টি হাসে। আমাকে চুমু খেয়ে বলে, আমার লক্ষ্মী বউ, সোনা বউ। নিশ্চয়ই হবে। আমাদের বাচ্চা এবার নিশ্চয়ই হবে।

আমাদের শব্দটি বেশ জোর দিয়ে বলে সে।

আমি বলি, দেখতে ঠিক তোমার মতো হবে, তাই না?

হারুন বাঁ বাহুতে আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে স্বপ্নালু চোখে তাকায় আমার দিকে।

বিকেলে বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখি আফজাল দাঁড়িয়ে আছে চুলে চোখে কপালে চিবুকে বুকে এক বোঝা ছটফট নিয়ে। ঠোঁটে আমার চিকন হাসি ঝিলিক দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। ও ইঙ্গিত করে নীচে নামার। আমি অস্পষ্ট না বোধক মাথা নেড়ে সরে যাই বারান্দা থেকে। আমার ইচ্ছে করে না আফজালের কাছে গিয়ে সোহাগে সিক্ত হতে, মৈথুনের উন্মাদনায় মত্ত হতে। রসুনি গেছে তেজগাঁয় ওর এক খালার কাছে, শ্বশুর নোয়াখালি থেকে ফিরেছেন, কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে আছেন, বলেছেন রাত দশটার আগে যেন তাঁকে না ডাকি। বেশ ক-রাত তিনি ভাল ঘুমোননি বলে এই আয়োজন। আমি নির্বিঘ্নে নীচতলায় যেতে পারি এখন। নীচতলায় আফজাল একা, আমার মিথুনশিল্পী অপেক্ষায় কাতর হচ্ছে, অথচ এই শরীর মন নিশ্চল, বরং গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আমি একটি বই হাতে, দুবার পড়া বই, গা এলিয়ে দিই বিছানায়। এ বাড়িতে কারও পড়ার অভ্যেস নেই। বইটি হাবিবের, কোনও এক বন্ধুর কাছ থেকে আনা, সাইফুল নামটি লেখা প্রথম পাতায়। বইটিতে চোখ বুলোতে বুলোতে ঝিমোতে শুরু করেছি, বুজে এসেছে চোখ দুটো। ফোনের শব্দে ধড়ফড়িয়ে উঠি। আমি হ্যালো বলার পর ওপাশে কোনও হ্যালো নেই। একটি দীর্ঘশ্বাস কেবল। বুঝি এ কে। রিসিভার নামিয়ে রাখি। ধুকপুক শব্দ শুনি বুকের। আফজাল এসব করে আমার সব্বনাশ করবে না তো!

অপ্রস্তুত আমি হঠাৎ উদ্বেগে ফোন করি হারুনকে, হারুন অবাক ফোন পেয়ে, কী হয়েছে?

—না কিছু হয়নি। এমনি। কখন ফিরছ?

—কেন? কোনও দরকার?

—না কোনও দরকার নেই। তোমার কথা ভাবছিলাম। এত কম পাই তোমাকে কাছে!

হারুন চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কী জানি কী ভাবে। জল খাওয়ার শব্দ শুনি, ঢকঢক।

—বাড়িতে সব ঠিকঠাক আছে তো!

—ঠিক আছে সব। আব্বা ঘুমোচ্ছেন, রাত দশটায় উঠে কালোজিরা চালের ভাত আর শিং মাছের ঝোল খাবেন বলেছেন, রেঁধে রেখেছি।

—দোলন কি সুমাইয়াকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বলেছিলাম তো রেখে যেতে তোমার কাছে।

—আমিও বলেছিলাম, দোলন বলল ওর হাসান মামাকে দেখতে ও গোঁ ধরেছে। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নাকি সুমাইয়ার দেখতে ভাল লাগে।

—বড় হলে ও দেখো ডাক্তার হবে।

—তুমি কি হাসপাতাল হয়ে ফিরবে?

—হ্যাঁ। তোমার কিছু লাগলে আগে থেকেই বল। স্যানটারি ন্যাপকিন আশা করছি আর লাগবে না। কি বল! হারুন হি হি হাসে।

আমিও হেসে বলি, আমিও আশা করছি লাগবে না।

শেষ করার আগে সে বলে, এই তুমি তো বেশ কোরান পড়ছ আজকাল।

—হ্যাঁ পড়ছি। হাসানের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য দোয়া করছি।

—নিজেরটির জন্য কিছু কর।

—মানে?

নিজের সন্তান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বল।

—বলার অপেক্ষা রাখে! প্রতিরাতে যে হারে দিচ্ছ তুমি—

—প্রতিরাতে কি আর দিতে পারছি! এই শোন, আজ রাতে কিন্তু চারবার।

—চারবার?

—তুমি রাজি হলে পাঁচবার।

আমাদের মধুর বাক্যালাপ শেষ হয় রিসিভারের গায়ে চকাশ করে চুমু খেয়ে।

ফোন রেখে মনে মনে বলি, দিয়ো আমাকে তোমার যত নির্যাস আছে আজ রাতে। তোমার লক্ষ লক্ষ শুক্রানু আমার জরায়ু জুড়ে গোল্লাছুট খেলবে, উন্মাদের মতো খুঁজবে এদিক ওদিক কিন্তু দেখা পাবে না কোনও ডিম্বানুর। দেখা যে পাবে না, সে তুমি জানবে না হারুন। কোনওদিন জানবে না।

হাসানের চিকিৎসার জন্য মোট কত খরচ হয়েছে হারুনের জানি না। শ্বশুর শাশুড়ি দুজনের হাতেই কদিন পর পরই টাকা দেয় সে সংসার খরচের। বাড়িতে কত টাকা খরচা হয়, কোথায় কত টাকা ঢালছে হারুন, ব্যবসায় লাভ ক্ষতি এসব নিয়ে হারুন কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না। সেবতিকে বলা আছে প্রতিমাসে ভাড়ার টাকা শাশুড়ির হাতে দিয়ে যেতে। হারুন যে টাকা-পয়সার ব্যাপারটি আমার আড়াল করে রাখে, এর কারণ সম্ভবত যোগ্য সে আমাকে মনে করে না। বিয়ের আগে অবশ্য মনে করত। আমাকে আপিসে বসিয়ে ফাইল খুলে দিত সামনে, পাতা উলটে উলটে আঙুল রাখত বিভিন্ন সংখ্যায়, এ হচ্ছে গত মাসের উপার্জন, ছ লাখ। বাড়ছে বুঝলে বাড়ছে, এর আগে ছিল তিন। দ্বিগুণ বেড়েছে এক মাসে। এ হচ্ছে ব্যাঙ্ক লোন, এ হল মোট খরচ, এ হল লাভ। বিয়ের পর আমার যেন মাথার ঘিলু সেরখানিক কমে গেছে, হারুন যে গল্পই করুক টাকা-পয়সার গল্প আমার সঙ্গে করে না। ব্যাপারটির প্রতি আমার যে মোহ আছে, তা নয়। টাকা-পয়সাকে জীবনের মূল্যবান জিনিস বলে কোনওদিন ভাবিনি, তবে শ্বশুরবাড়ি আসার পর থেকে টাকা পয়সার মূল্য ঠিক কী, তা হাড়ে কেন মজ্জায় টের পাচ্ছি। এ বাড়িতে একটি মানুষের হাতেই কোনও টাকা পয়সা থাকে না, সে আমি। সকলে জানে আমার টাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার যখন যা প্রয়োজন, তা আমার স্বামী আছে, দেবে। তা দেবে, জানি দেবে। ঘরে পরার আরও দুটি শাড়ি লাগবে আমার, মুখের নিভিয়া ক্রিম শেষ হয়ে গেছে, সাবান,

স্যানিটারি ন্যাপকিন—বলতে হয় হারুনকে। হারুন বলে আজ দোলন যাচ্ছে বাজারে, ওকে টাকা দিয়ে যাব, নিয়ে আসবে। অথবা আমি আপিস থেকে ফেরার পথে কিনে আনব, অথবা হাবিবকে বলে দিচ্ছি ও নিয়ে আসুক। হারুন আমাকে সবই দিচ্ছে, আবার কিছু দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার যা ছিল সব কেড়ে নিচ্ছে হারুন।

এর মধ্যে একদিন হারুন আপিসে যায় না। বাড়িতে মিলাদ পড়ানোর আয়োজন করে মৌলবি ডেকে। হারুন সকাল থেকে ব্যস্ত, তিনজন মৌলবিকে দিয়ে কোরান খতম দেওয়ানো হচ্ছে। বাড়িময় আতর লোবানের গন্ধ, মনে হয় কেউ যেন মারা গেছে এ বাড়িতে। গন্ধটির সঙ্গে মৃত্যুর বড় সম্পর্ক আছে। সন্ধেয় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন শুরু হবে। হারুন আর হাবিব মিলে দুশো প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে এল আলাউদ্দিনের দোকান থেকে। শ্বশুরমশাই পাজামা পাঞ্জাবি টুপি পরে ঘরময় হাঁটছেন, আর মৌলবিদের কখন কী লাগবে, চা বিস্কুট সেমাই হাঁক দিচ্ছেন দিতে। রসুনি ব্যস্ত, সখিনাও। শাশুড়ি গা ম্যাজম্যাজের শরীর নিয়ে বউমা এটা করো, ওটা আনো, মাদুর বিছিয়ে দাও, বিছনার চাদর বিছিয়ে দাও, বালিশ সাজিয়ে দাও, গোলাপদানিতে গোলাপজল ভরে দাও, মিষ্টি করে শরবত বানাও বলছেন। আমিও ছুটোছুটিতে ঘেমে নেয়ে গেছি, দুহাতে নয় দশহাতে কাজ করছি। আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শি অনেকেই আসবে। দুরকম লেবুর শরবত বানাতে হল, এক চিনি দিয়ে আরেক চিনি ছাড়া। হারুন তার সংসারে ঘোমটা মাথার লক্ষ্মী বউ-এর সাংসারিক ব্যস্ততা দেখে মুগ্ধ, তার খুশি খুশি ঠোঁট দেখে আমি টের পাই।

—নীচতলায় কাকে কাকে বলতে হবে বল তো।

লেবু চিপছিলাম ঠাণ্ডা জলে। শুনে লেবু হাত থেকে পড়ে যায় জলে।

—উফ কী কাণ্ড! আমি চামচে লেবুর টুকরোটিকে উঠোতে যাই।

—ও কিছু না। ছেঁকেই তো নেবে।

—তা ঠিক।

চামচ রেখে কপালের ঘাম মুছে বলি, কী জানি কাকে বলতে চাও। সেবতি তো নেই। ও বলেছে হাসপাতাল থেকে ও রাত নটায় ফিরবে, তখন এখানে আসবে। ওর জন্য এক প্যাকেট মিষ্টি রেখে দিতে হবে।

হারুন বলে, ওর স্বামীও তো মনে হয় এখন বাড়ি নেই।

—তা দেখ গিয়ে নীচে।

সেবতি কি ওর স্বামীকে বলেছ মিলাদে আসতে?

—তা তো জানি না।

শরবত ছাঁকার ছাকনি খুঁজতে খুঁজতে বলি।

—আচ্ছা ওর এক দেবর থাকে শুনেছিলাম। ওকেও তো বলা দরকার।

—ওর দেবর!

—হ্যাঁ ওর আপন দেবর। আপন না হলে কথা ছিল।

—ও হ্যাঁ তাই তো। সেবতি একবার বলেছিল যে ওর এক দেবর নাকি বেড়াতে এসেছে। কিন্তু ও তো বলেছিল দেবর নাকি বিদেশে চলে গেছে।

আমি শরবতে মন দিয়ে দেবরের প্রসঙ্গ তুচ্ছ করি। কারও দেবর নিয়ে যে আমি মোটেও ভাবি না, কারও কোনও দেবরে যে আমার কিছু যায় আসে না, সে কথা হারুনকে আমি আমার নিরাসক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

লক্ষ করি হারুন হাবিবকে পাঠাচ্ছে নীচতলায়। এও লক্ষ করি হাবিব নীচতলা থেকে এসে হারুনকে জানিয়ে দেয় দরজায় তালা লাগানো, বাড়িতে কেউ নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

বিকেলে বাড়ি ভরে যায় লোকে। আল্লাহুম্মা সাল্লিআলার গমগম শব্দে বাড়িতে কাঁপন শুরু হয়। এবং আমার শরীরেও, স্রাবের। হারুন দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মিলাদে বৈঠকঘরে আর বারান্দায় পুরুষ লোকেরা সব দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের দাঁড়ানোর নিয়ম নেই মিলাদে। মেয়েরা শাশুড়ির ঘরে গিজগিজ করে দাঁড়িয়েছে। সবার মাথায় আঁচল, ওড়না। বিড়বিড় করছে আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা।

কেবল আমিই এখন সবকিছুর বাইরে। আমার কোরান পড়া চলবে না, আমার মিলাদ পড়া চলবে না। কারণ নাপাক শরীরে পাক জিনিস ছুঁতে হয় না। পাক কর্ম করতে হয় না।

বাড়ির ভিড় কমতে কমতে আত্মীয় স্বজন যেতে যেতে রাত দশটা বাজে। শুতে এসে হারুন আমার ঋতু মানে না। কোথায় সে শুনেছে ঋতুর সময়ও বাচ্চা পেটে আসতে পারে। সুতরাং এই চেষ্টাও সে করে যেতে চায়, যাবে। আমি বাধা দিই না। যত হোক স্বামী। আমার শরীরের ওপর তার যত অধিকার, তত তো আমারও নেই।

১৩

হাসান বাড়ি ফেরে। পায়ে তার তখনও প্লাস্টার লাগান। রাণু এখন আর শিয়রের কাছে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে না। দোলন আর সুমাইয়াকে নিয়ে হাবিব গেছে চট্টগ্রাম, আনিসের কাছে। সেবতি প্রায় প্রতিদিনই হাসানকে দেখতে আসে। নতুন ওষুধ লিখে দেয়। কিছু ক্ষত যেগুলো শুকোচ্ছে না, ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়। শাশুড়ির গা ম্যাজম্যাজ আজকাল আগের চেয়ে বেড়েছে। সেবতির খোঁজ পড়ে শাশুড়ির বেলাতেও। সেবতি গা ম্যাজম্যাজ বন্ধ হওয়ার ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। কেবল ওষুধের নাম লিখে দেওয়া নয়, নিজেও ওষুধ কোম্পানি থেকে মাগনা যে সব ওষুধ পায়, সেগুলো অকাতরে উদারহস্তে দিয়ে যায়। সেবতি ওপরতলায় এলেই শাশুড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কী খেতে দেবেন সেবতিকে—সেবতি এটা খাও, ওটা খাও। আদর দেখাবার এই একটি পথ বাঙালি বেশ ভাল

জানে। খেতে দেওয়া। সেবতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা শাশুড়ি মুগ্ধ চোখে দেখেন। সামনেই বলেন, আহারে মেয়েটা কী ভাল! কী উদার! বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি সেবতি। কী জানি এমন মেয়ে পুত্রবধূ হিসেবে পেলে বেশ হত, মনে মনে ভাবেন কি না। আমার জায়গায় সেবতিকে কল্পনা করে আমি শিহরিত হই, বংশের রক্ষণশীলতা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখতে ইচ্ছে করে। কানে নল লগিয়ে রোগীর ফুসফুস বা হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করা মেয়েদের দেখতে ভাল দেখায়, কিন্তু পুত্রবধূতে পরিণত হলে নাড়ি টেপা, ছুরি কাঁচি হাতে অপারেশন করা মেয়ে যখন রান্নাঘরের আঙিনা মাড়াবে না, ড্যাং ড্যাং করে সকালে উঠে হাসপাতালে দৌড়বে, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে নাকে মুখে তৈরি-খাবার খেয়ে দৌড়াবে প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী দেখতে, ফিরবে রাত করে, কোনও কোনও রাত ফিরবে না—তখন কিন্তু তাকে কারও ভাল লাগবে না।

আমি এ মাসেও আবার দশম থেকে ষোড়শের অপেক্ষায়। দিন এলে সেবতির বাড়ি থেকে হাসানের জন্য নতুন ব্যান্ডেজ নিয়ে আসা, সেবতিকে এ-কারণে ও-কারণে খবর পাঠানো, চা খেতে ডাকছে সেবতি, এসব নানা ছুতোয় আমি কিছুক্ষণের জন্য হাওয়া হই বাড়ি যখন কিছুটা নিঝুম থাকে।

রূপসী শরীর হাতের মুঠোয় পেয়ে আফজাল উন্মাদের মতো চুমু খায়।

—ঝুমু, আরা ঝুমুমণি, এতদিন কোথায় ছিলে? কেন আসোনি? কেন ভালবাসোনি? কেন ভুলে ছিলে?

—ভুলে ছিলাম না। এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলিনি। আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তোমাকে ভুলব কী করে।

শুনে এত খুশি হয় আফজাল শুনে শুনে ছটি ছবি দেখায়, যা এক দিনে এঁকেছে।

—কার ছবি গো?

—চেনা যাচ্ছে না?

—না। ঠোঁটে আমার দুষ্টু হাসি।

আফজাল ছোট একটি আয়না তুলে ধরে আমার সামনে।

—বল যে নিজেকে চিনতে পারছ না।

হেসে আফজালের কালো অরণ্যে মুখ লুকোই।

মিলনে মিথুনে দুটো শরীর অনেকদিন পর যুগল উৎসব করে। আফজাল আবেগে এত কাঁপছিল যে বীর্যপতন হয় দ্রুত। হোক দ্রুত হোক। দ্রুত আমি নিজেকে গুছিয়ে ওপরতলার আমি ওপরতলায় রওনা হই।

—কী এক্ষনি যাচ্ছ কোথায়?

—যেতে হবে গো।

না যেও না এক্ষুনি।

আফজালের নাক টিপে বলি—তুমি আমার স্বামীকে চেন না! জানলে তোমাকে খুন করবে আগে, তারপর আমাকে। ভুলেও কোনওদিন ও বাড়ির দিকে চোখ তুলে চেয়ো না। কোনও চিঠি না। কোনও ফোন না।

—আমার পাগল পাগল লাগে।

—আমারও পাগল পাগল লাগে আফজাল। তুমি বুঝবে না এসবের কিছু।

আফজাল হাত ধরে টানে।—চল পালিয়ে যাই।

—পালাব কোথায়?

—দূরে। অনেক দূরে। অস্ট্রেলিয়া চলে যাব। আমার বোন থাকে ওখানে।

—কিন্তু আমি যে ওপরতলায় বাঁধা।

—সব ফেলে চল চলে যাই।

আমি হেসে বলি—চলে গেলে হারুনের কী হবে?

—ওর কথা ভাবছ কেন?

—ওর কথা ভাবার আমি ছাড়া কে আছে?

—ঝুমুর তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। তুমি কি আমাকে ভালবাস না?

—কী মনে হয় তোমার?

—একবার মনে হয় বাসো, আবার মনে হয় বাসো না। আচ্ছা তুমি কি ওই হারুনকে ভালবাস নাকি সত্যি করে বল তো।

—আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছি।

—ওই লোক নিশ্চয়ই তোমাকে কোনও শারীরিক সুখ দিতে পারে না।

—মাঝখানে পারেনি। এখন পারে।

—তাই বুঝি তুমি অনেকদিন আসোনি!

আমি সশব্দে হেসে উঠি।

—হাসছ কেন? তোমার স্বামীর কাছে তৃপ্তিই যদি পাও, তাকে যদি ভালই বাসো, তবে আর আমি কেন?

আফজাল ম্লান মুখে বলে।

—তুমি বুঝবে না। আফজালের নাকের তিল চুমু খেয়ে বলি।

ওর ভ্রূ কুঁচকে থাকে। সুন্দর সেই হাসিটি কোথাও নেই আর। ওকে আমি কী করে বোঝাব আমার সততার ক্রোধ, আমার সতীত্বের ক্রোধ।

ওর শুকনো ঠোঁটে চুমুতে ভিজিয়ে বলি, কাল আসব।

—কখন?

—জানি না। যে কোনও সময়। সারাদিন বাইরে বেরিয়ো না।

দৃশ্য থেকে দ্রুত অদৃশ্য হই।

হারুনকে সে রাতে বলি, পেটে আমার অসহ্য যন্ত্রণা।

—পেটে যে মাঝে মধ্যে কী হয় তোমার। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে শিগগিরি। এ নিয়ে প্রায়ই ভুগছ।

পরের দিন আমার পেট ব্যথা থেকে যায়। তারপর দিন পেটব্যথা নেই, কিন্তু মাথা ছিড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। প্যারাসিটামল একটার জায়গায় হারুনের সামনেই পাঁচটা খাই।

—তোমার বোধ হয় মাইগ্রেন হয়েছে।

দুর্বল স্বরে বলি, আমারও তাই মনে হয়।

তার পরদিন মাইগ্রেন ব্যথাটা কমে তবে কী বাসি খাবার খেয়ে ভীষণ আমাশায় ভুগছি।

পরদিন লাগে জ্বর জ্বর।

হারুন ঋতুর খবর রেখেছে, ঋতুর পরের দিনগুলো হারুন গোনেনি, কখন ডিম্বানু ডিম্বাশয় থেকে ছুটে গোল্লাছুট খেলা খেলছে—জানে না। টাকা পয়সার হিসেব রাখতে হারুন বেশ ভাল জানে, জানে না গোল্লাছুটের হিসেব রাখতে।

আফজাল বাড়ি থেকে মোটেও বের হয়নি ওই সাতদিন। কারণ পরের দিনগুলোয় বলেছি, কাল আসব। ষোড়শ দিনে কেবল বলেছি, কাল আমার যেতে হবে শাশুড়ির সঙ্গে দাওয়াতে। কাল আসা হচ্ছে না। এরপর সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আসব।

ওই দিন আফজাল আমাকে আদর করতে করতে বলেছে, তোমাকে কত ভালবাসি তুমি জানো না।

—কতটুকু, শুনি।

—যতটুকু ভালবাসলে যে কোনও রূপবতীকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

—তুমি নগ্ন নারী পেলে গোগ্রাসে খাবে। এই যে আমাকে পালিয়ে যেতে বলছ তোমার সঙ্গে তারপর দেখলে কোনও এক নারী পেলে, ধর কোনও ওপরতলার। তখন?

আফজাল খুব গম্ভীর হয়ে একটি সিগার ধরায়। ও সিগারেট মোটে ফোঁকে না। যদি ফোঁকে কখনও, সে সিগার। হাভানা থেকে ওর এক বন্ধু পাঠিয়েছে। সিগারের দুর্গন্ধ-ধোঁয়া ছেড়ে বলে, একটা কথা বলি, কেবল তোমাকেই বলছি। এর মধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছে।

—কী কাণ্ড। কী কাণ্ড?

—বউদি এসেছিল অনেক রাতে আমার ঘরে। পাতলা একটি জামা গায়ে ছিল। সেটি খুলে পুরো নগ্ন হয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল।

—বল কী?

আমি উঠে বসি।

—শোনই না। তারপর আমি বললাম এ কী, এখানে কেন এসেছ? বউদি বলল, আমি আর পারছি না।

—কী পারছে না?

—জানি না কী পারছে না। তবে আমি আর একটি কথা শুনতে চাইনি। তাকে ধমকে তার শোবার ঘরে পাঠিয়েছি। এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না। দাদা যদি কোনওদিন জানে এ ঘটনা, আত্মহত্যা করবে।

আফজাল দুচোখ উপচে পড়া ভালবাসা নিয়ে তাকায় আমার দিকে। আমার চোখ ঝলসে যায় এত ভালবাসা দেখে।

—সেবতি তোমার কাছে আসে কেন? নিশ্চয়ই কোনও ইঙ্গিত দিয়েছ ওকে

কাছে আসার! বলে আফজালকে হতভম্ব বসিয়ে রেখে দ্রুত চলে আসি ওপরতলায়।

আমার বুকে ফুটে ছিল কটি দাগ, আফজালের চুমুর দাগ। দাগগুলোকে হারুনের সামনে লুকোতে চেষ্টা করেও পারি না। এক রাতে আমার আঁচল সরিয়ে বুকে মুখ ঘষতে গিয়ে দাগগুলো দেখে হারুন।

—এসব কী হচ্ছে?

—কী সব?

—লাল দাগ।

—কেউ চুমু খেয়েছে মনে হচ্ছে। বলে আমি হেসে উঠি জোরে। আতঙ্ক লুকোই শব্দের আড়ালে। আমার হাসিতে হারুনও হাসে।

—বাস্তবে তো ঘটার জো নেই, মনে হয় আমার কোনও পূর্ব প্রেমিক এসে খেয়ে গেছে স্বপ্নে। আমি বলি।

হারুন সেই চুমুর দাগের ওপর আলতো চুমু খেতে খেতে বলে—চিংড়ি আর ইলিশ মাছ খেয়ো না।

ওসবে অ্যালার্জি হয়।

সেবতির বাড়িমুখো আমি আর হই না। আমার মাইগ্রেন, পেট ব্যথা, পিঠ ব্যথা, আমাশা ইত্যাদি অসুখ আর কিছু থাকে না বলে হারুন প্রতিরাতে বীর্যপতন ঘটায় আমার জরায়ুতে আর স্বপ্ন দেখতে থাকে একটি ফুটফুটে বাচ্চার, সুভাষের নয়, আরজুর নয়, হারুনের নিজের বাচ্চার।

১৪

পরের মাসে ঘটনা ঘটে। ঋতুস্রাবের দেখা নেই। দু সপ্তাহ যায়। মাথা ঘোরানো বমি হওয়া শুরু হয়, সেই আগের মতো। আমার বলতে হয় না, হারুনই আমার সকালের বমি হওয়া লক্ষ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগে থরথর কাঁপে।

—কী ব্যাপার হয়েছে কি? এভাবে ধরে আছো কেন? হারুনকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

—বুঝতে পারছ না। আমি নিশ্চিত তোমার বাচ্চা পেটে।

—ধুৎ। আমার মনে হয় না। কাল নিশ্চয়ই বাজে কিছু খেয়েছি। তাই বমি হচ্ছে।

—মোটেও না। এ মাসে মাসিক হয়েছে তোমার?

—কি জানি। এত মনে থাকে না, কোনও মাসে কী হয়েছে।

হারুন মিষ্টি হেসে আমাকে চুমু খেয়ে বলে, তুমি হলে ছোট্ট খুকি, কক্ষনো কিছুর হিসেব রাখতে পার না।

হা হারুন। আমার মতো হিশেব যদি তুমি রাখতে পারতে—মনে মনে বলি।

অনেক অনেকদিন পর হারুন আমাকে ভালবেসে জড়িয়ে ধরে। অনেক অনেকদিন পর হারুন তার আপিসের ব্যস্ততা, পারিবারিক ব্যবসায়িক সাফল্য ব্যর্থতা ভুলে আমাকে জড়িয়ে রাখে বুকের উষ্ণতায়। অনেক অনেকদিন পর হারুনের তুষ্ট তৃপ্ত সুখী মুখে স্বস্তির হাসি ফোটে। আমার চোখ ভিজে ওঠে তার জন্য করুণায়। কত দীর্ঘ দীর্ঘ দিন হারুনের খাঁচায় আমি বন্দি ছিলাম। আমার বাবা মা বোন বন্ধু যা কিছু আছে আমার নিজের, সব থেকে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে দূরে রেখেছিল হারুন। হারুন অনুমান করতে পারত, এসব মেনে নেওয়ার মেয়ে আমি নই। হারুন আমার ব্যক্তিত্বের কোনও খবরই রাখেনি বিয়ের আগে, তা তো নয়। চার দেওয়ালের মধ্যে পুরে রাখলেই সে কী কী করে ভাবল আমি আমার নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে মাথা পেতে বরণ করে নেব সে যা আদেশ করে, তা। হারুন অনুমান করতে পারত, গর্ভপাত করানোর জন্য যেভাবে কেঁদেছিলাম, যদি সত্যিকার ওই গর্ভ হারুনের হয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে কোনও ভাবেই ক্ষমা করব না। কী করে ও ভেবেছে তার সকল নিষ্ঠুরতা আমি নীরবে মেনেছি। কী করে সে ভাবতে পেরেছে আমাকে অপদস্থ করার অপমান করার শোধ আমি কোনওদিন নেব না! আমার করুণা হয় হারুনের জন্য। সে অনুমান করতে পারত এই যে শ্বশুরবাড়ির সবার জন্য রান্না করেছি, সবার যত্ন আত্তি করেছি, এই যে যা অভ্যেস নেই করেছি, ঘোমটা মাথায়—মাথায় গোবর-অলা গবেট মেয়েমানুষের মতো দিন যাপন, এই যে সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান, আদর্শ বা বিশ্বাস যা কিছু আমার গত জীবনের অর্জন সব বিসর্জন দিয়ে এই যে জীবন হারুন আমাকে উপহার দিয়েছে, সে জীবনের স্বপ্ন আমি কখনও দেখিনি। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসে ভালবাসায় আমি একটি সুখী দাম্পত্য-জীবন চেয়েছিলাম, ব্যক্তিস্বাধীনতা যেখানে ক্ষয় হয় না, নীচতা হীনতা যেখানে বাসা বাঁধে না, যেখানে কেবল গড়ে ওঠা আছে, ভেঙে পড়া নেই। যেখানে সততা ও সাহস নিয়ে দুটি জীবনের এগিয়ে চলা আছে, পিছিয়ে যাওয়া নেই। যেখানে কেউ কারও গতি রোধ করে না। যেখানে বৈষম্যের এক ফোঁটা স্থান নেই। যেখানে কোন্দল নেই, কলহ নেই, আছে সহমর্মিতা, সহানুভূতি। হারুন গায়ের জোরে আর বিয়ের জোরে আমার সব স্বপ্ন ছত্রখান করেছে। কী করে হারুন ভাবে আমি এর শোধ নেব না! কী করে সে ভাবে আমাকে চরম লাঞ্ছনা করে ধূলিসাৎ করে দেবে সে, আর আমি মাথা পেতে বরণ করে নেব সব নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অশোভন সব আচরণ! হারুন ভেবে দেখতে পারত আমি ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি কোনও বন্দি জীবন যাপন করার জন্য নয়। থাল বাসন ধোয়া মাজার আর মশলা বাটার জন্য নয়। শ্বশুরবাড়ির লোকদের রসনা তৃপ্ত করার জন্য আমি জন্ম নিইনি, এত ব্যর্থ জন্ম আমার নয়। দীর্ঘ এক বছরের দুঃসহ জীবন কাটাবার পর আমি এই প্রথম আমার গর্ভের ধন নিয়ে হারুনের উচ্ছ্বাস আমাকে সাফল্যের স্বাদ দিল। কোনও ক্ষোভ, কোনও কষ্টের আগুন আমাকে আর পোড়াল না।

হারুন তক্ষুনি একটি শিশিতে করে নিজে আমার পেচ্ছাব নিয়ে যায় ধানমণ্ডি

ক্লিনিকে পরীক্ষা করতে। ফিরে আসে বিরাট এক ফুলের তোড়া নিয়ে। আমার হাতে তোড়া দিয়ে, তোড়া আমার হাতেই থাকে, হারুন আমাকে পাঁজাকোলা করে নৃত্য শুরু করে। যে নৃত্যের আশায় বসেছিলাম একদা।

হারুন ঘরময় কেবল নয়, বাড়িময় নেচে বেড়ায়। শাশুড়ি বাতের ব্যথা নিয়ে উঠে আসেন কী হল কী হল বলে। এত হই চই কেন! কেন নয়, হারুন সোল্লাসে জানিয়ে দিল ঝুমুরের বাচ্চা হবে। হারুনকে কোনও কিছু নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত হতে বাড়ির কেউ দেখেনি। কারও চোখ কপালে, কেউ হা হা হাসছে। শাশুড়ি সোবহানআল্লা-সোবহানআল্লা বললেন বেশ কবার। মুখে তাঁর মধুর হাসি।

হারুন বলল, আজ পোলাও মাংস রান্না করুন আম্মা।

হারুনের আম্মা গা ম্যাজম্যাজ নিয়েই রান্নাঘরে গিয়ে পোলাও মাংস কালিয়া যত রকম পদ তাঁর পক্ষে সম্ভব, রান্না করতে লেগে গেলেন।

হারুন সেদিন আপিসে বলে দিল, সে আসছে না। কেন আসছে না? সুখবর, তাই আসছে না। সুখের দিনে আপিসে তার মন বসবে না।

হাবিবের হাতে দু'হাজার টাকা দিয়ে হারুন বলল, আলাউদ্দিনে যত মিষ্টি আছে, যত ফুল আছে বাজারে নিয়ে এসো। হাবিব গাড়ি নিয়ে চলে গেল আনতে। উচ্ছ্বাস ওর মধ্যেও।

হারুন যা কখনও করেনি, আমাকে বাড়ির সবার সামনে চুমু খেল। বারবার বলল আমার লক্ষ্মী বউ। আমার সোনা বউ।

এতদিনে সবার চোখ পড়ল আমার ওপর। এতদিনে—আমি যে কিছু পারি, আমি যে এই বংশের বাতির জন্ম দেওয়ার মতো বিশাল একটি কাজ করে ফেলতে পারি, তা যেন হঠাৎ করে জানল সবাই। ফুলে ঘর ভরে গেল। আত্মীয়-স্বজন কাছাকাছি যারা ছিল হারুনের তলবে চলে এল। মিষ্টি খাওয়ার ধুম চলল। কেউ কেউ বলল, বাচ্চা হওয়ার পর লোকে মিষ্টি খাওয়ায়, আর এ তো দেখছি সব আগে ভাগে।

হারুণ এটুকুতে ক্ষান্ত নয়। হাবিবকে দিয়ে হারুনের আপিসে, হারুনের বাকি আত্মীয়দের বাড়িতে, এমনকী ওয়ারির বাড়িতে, নুপুরের গ্রীন রোডের বাড়িতে মিষ্টি পাঠাল।

সারাদিন হারুনের ব্যস্ততা আমাকে নিয়ে। বন্ধুদের ফোন করে করে সুখবর দিচ্ছে। সে বাবা হচ্ছে।

কুমুদ ফুপু মিষ্টি পেয়ে নিজে চলে এলেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, হারুনের সব কিছুতে বাড়াবাড়ি, মনে হচ্ছে ও আজই বাবা হয়ে গেছে। বাচ্চা মাত্র পেটে এসেছে। হতে দে বাচ্চাকে বাবা। ন মাসে কি কম বিপদ আপদ যায়! কী করবি যদি তিন মাসের গর্ভপাত ঘটে।

কুমুদ ফুপু উদ্বিগ্ন। বাড়ির উৎসব দেখে আরও উদ্বিগ্ন।

এই উৎসবের মধ্যে দোলন এসে উপস্থিত। আনিস আসেনি? ওর ভীষণ ব্যস্ততা, তাই আসতে পারেনি। সুমাইয়ার ক্ষিদে-মুখে দোলন মিষ্টি ঢোকাতে-ঢোকাতে বলতে লাগল, সুমাইয়ার আব্বু টিলার ওপর একটি বাড়ি ভাড়া

নিয়েছে। ব্যবসা খুব ভাল হচ্ছে, দিন রাত ব্যস্ততা ওর, চট্টগ্রাম থেকে নড়ার সময় নেই। হাসানের চিকিৎসা কেমন হচ্ছে, ওর যত্ন ঠিক মতো হচ্ছে কি না এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই চলে এলাম। সুমাইয়ার আব্বু, বার বার আমাকে বলে দিয়েছে এক সপ্তাহ পরেই যেন চলে যাই। সংসার ফেলে বেশিদিন কি আর বাইরে থাকা যায়!

—তা ঠিক, যায় না। আমি বলি।

—আরও দুজন লোক আছে সঙ্গে। জাহাজে মাল আনা নেওয়ার ব্যবসা। বুদ্ধি না থাকলে এমন ব্যবসা কেউ করতে পারে না। সুমাইয়ার আব্বুর মতো বুদ্ধিমান কি যে কেউ হতে পারে! আমি বাড়ির সবাইকে বলে রেখেছিলাম, ও যদি একবার কাজে নামে, তাহলে ওর সঙ্গে পেরে উঠতে কেউ পারবে না। দেখলে তো!

—বাহ্! তোমার ভাগ্য ফিরে গেল দোলন।

—কি যে বল ভাবী, শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে আমাকে আলাদা থাকতে হবে, ভাবলে খুব কষ্ট হয়। সুমাইয়ার আব্বু ঢাকা এলেই শ্বশুরবাড়ি যাব।

হারুন রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে দিয়েছে, জোরে গান বাজছে। কণিকার 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' হারুন বারবার করে চালাচ্ছে। আমি কণিকার সঙ্গে হৃদয় বাসনা পূর্ণ হওয়ার গান গাইতে থাকি হারুন যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকে বুকের লাল দাগগুলোয়। তার বিশ্বাস তার ওই চুমুতে এলার্জির দাগগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলে হারুন বলল, তোমার বন্ধু সেবতিকে নেমন্তন্ন করো রাতের খাবার খেতে। আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাবে।

—শুধু সেবতি কেন, ওর স্বামীকেও বল।

হারুন সেবতি আর সেবতির স্বামীকে নিজে গিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এল।

সেবতির যে এখন প্রয়োজন আরও বেশি করে, সে হারুন বোঝে।

হারুনের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে আমার খাওয়ার সুযোগ হয় না। হারুন হাবিব শ্বশুর ইত্যাদি পুরুষদের খাইয়ে পরে আমাকে খেতে হয়। এখন হারুন কেন, অন্য পুরুষের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে বসেছি আমি, অবশ্য এই প্রথম এ বাড়িতে। শাশুড়ির রান্না করা পোলাও মাংস খেতে খেতে খাবার টেবিলের আড্ডা জমে উঠল। সেবতির হাসপাতাল, হারুনের ব্যবসা, আনোয়ারের এন জি ও প্রসঙ্গে যাবার আগে হারুন সুখবরটি দিল।

সেবতি উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে।

—এতক্ষণ খবরটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন শুনি!

হারুন বলল খবরটি আজই সে পেয়েছে। ঘটা করে সেবতিকে সুখবরটি জানানোর জন্যই এই আয়োজন।

—হারুন ভাই ছেলে চান না মেয়ে? সেবতি জিজ্ঞেস করে।

—একটি সুস্থ সন্তান চাই। ছেলে হোক মেয়ে হোক। হারুন বলে।

শাশুড়ি পাতে পাতে মাংস তুলে দিচ্ছিলেন। বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন

তাই দেবেন।

সেবতি শাশুড়ির কথায় হেসে ওঠে বলে, এক্স গিয়ে এক্স-এর সঙ্গে মিলবে নাকি ওয়াইয়ের সঙ্গে তা কার ইচ্ছেয় হয় জানি না, সম্ভবত কারও ইচ্ছেয় নয়। ছোটবেলায় অপেনটো বায়স্কোপ খেলতে গিয়ে, সেবতি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, জানো তো ওই যে দুজন মেয়ে দাঁড়ায় দু হাত উঁচু করে আর ছড়া বলতে থাকে, ওদের হাতের তল দিয়ে কুড়িটি মেয়ে লাইন করে যেতে থাকে, ছড়াটির শেষ লাইন হচ্ছে তাকে দিব মুক্তার মালা, ব্যস সামনে যে মেয়ে পড়ে, তাকেই দুহাতে ধরতে হয়। সেই এখন একজনের সঙ্গী। এ কি কারও ইচ্ছেয় হয়েছে? হয়নি। এ খেলা। খেলার সঙ্গী খেলার মধ্যেই নির্বাচন হয়।

পোলাও খেলে আমার বমি বমি লাগে। পোলাও মাংস রেখে গতকালের পটল দিয়ে পাতলা ঝোল করে রাঁধা ইলিশ মাছের তরকারি নিই। দেখে হারুন চেঁচিয়ে ওঠে, কি ইলিশ খাচ্ছ যে, তোমার এতে এলার্জি হয় তো!

এলার্জি হলে হিস্টাসিন খেয়ে নিয়ো। সেবতি বলে। হিস্টাসিন দিয়ে গেছি তো। ব্যান্ডেজের কারণে হাসানের পা চুলকোয়। ওকে হিস্টাসিন দিয়েছি। আছে রাণুর কাছে।

—খেতে বসেও ডাক্তারি। আনোয়ারের কনুইয়ের গুঁতো খায় সেবতি।

খেতে খেতে আফজালের কথা ওঠে। হারুনই ওঠায়।

—আপনার এক ভাই থাকত তো!

—থাকত কি, এখনও আছে। ঢাকায় দেখলাম ওর মন বসছে না। পাঠিয়ে দিচ্ছি অস্ট্রেলিয়ায়। ওখানে বোনের কাছে থাকুক। ঢাকায় কি আর শিল্পীদের কদর আছে! ছবি বেশ ভাল আঁকে। বিদেশে হয়তো নাম হবে।

সেবতির সঙ্গে চোখাচোখি হয় চকিতে, চোখ নামিয়ে নেয় ও। জল খায় দু গেলাস। অপ্রস্তুত সেবতি।

ঠোঁটে আমার মুচকি হাসি। কোথায় আমি অপ্রস্তুত হব, হয় সেবতি। কোথায় আমার পিলে চমকাবে, চমকায় সেবতির।

সেবতির অনুমান করার ক্ষমতা নেই আফজালের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক আমার হয়েছে। হঠাৎ একটুখানি দুলে উঠি, অস্ট্রেলিয়া চলে যাবার আগে আফজাল আবার ফাঁস করে দেবে না তো ঘটনা! আমার বাচ্চা পেটে আসার খবর ও নিশ্চয়ই পাবে, পেলে একবার কি ও ভাববে যে এ ওর বাচ্চা!

সম্ভবত না। কারণ ওর সঙ্গে যে মাসের কটা দিন আমি মিলেছি, হারুনের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি মিলেছি আমি, সুতরাং ভেবে নেবে এ বাচ্চায় তার কোনও অংশ নেই। খেতে খেতে আমি একটি উড়ো চিঠির কথা ভাবি, এমনকী হতে পারে আফজাল হারুনকে উদ্দেশ্য করে লিখল—আপনার বউ-এর সঙ্গে আমার এই হয়েছে সেই হয়েছে। না। আমি ভাবনাটি দূর করি, ভাবনাটি একটি পটলের সঙ্গে গিলে ফেলি। ভাবনাটি আবার ইলিশের একটি কাঁটার সঙ্গে গিয়ে তালুতে আটকায়, কাঁটাকে সাবধানে আঙুলে তুলে ফেলে দিই কাঁটা ফেলার পিরিচে। পিরিচ থেকে কাঁটা চলে যাবে আবর্জনার ঝুড়িতে।

আফজাল আপাদমস্তক প্রেমিক। ও যখন আমার শরীর স্পর্শ করে, ওর হাতে—হাতের আঙুলে ভালবাসা থাকে। একটি মেয়েই বুঝতে পারে পুরুষের কোন স্পর্শে ভালবাসা আছে, কোন স্পর্শে নেই—সে স্পর্শ একই রকম আলতো হোক। ভালবাসা মানুষকে আরও বেশি মানুষ করে, শ্বাপদ করে না। যে মানুষ সত্যিকার ভালবাসে না, সেই লিখতে পারে উড়ো চিঠি, সেই জ্বালাতে পারে আগুন, সেই পারে বুনতে ধ্বংসের বীজ। আফজাল আমাকে ভালবেসে স্পর্শ করেছে আমার সর্বাঙ্গ, চুমু খেয়েছে আমার প্রতি লোমকূপে, মৈথুন শেষে পাশ ফিরে শোয়নি, আমাকে জড়িয়ে ধরে আবেগে তিরতির করে ভালবেসে কেঁপেছে বলেই কিনা জানি না আমার মনে হতে থাকে ও আর যা কিছুই করুক যাকে ও ভালবেসেছে, ভালবেসে যার ছবি ও এঁকেছে তার ক্ষতি ও করবে না। কোনওদিন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বা সিডনির কোনও বাগানে কোনও সোনালি চুলের নীল চোখের কোনও সুন্দরীর দেখা পেলে ও হয়তো ভালবাসবে, একদিন ওর ঘরে আমার ছবিগুলো দেখে সেই রূপসী হয়তো জিজ্ঞেস করবে, ও কে?

আফজাল বলবে ওপরতলার বউ। ওকে বলেছিলাম ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি কথা বলো নাকো ওপরতলার যুবকের সাথে।

—তারপর? নীলঞ্জনা জিজ্ঞেস করবে।

—তারপর ওপরতলার বউ চলে গেছে ওপরতলায়, গিয়ে ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলেছে। যুবক তাকে নগ্ন করেছে।

—কোথায় এখন ও?

—সাত সমুন্দুর তেরো নদীর ওপারে।

এভাবেই আমি বেঁচে থাকব আফজালের স্মৃতিতে। আফজাল হয়তো আমার নামটিও একদিন ভুলে যাবে। একদিন হয়তো ও গুলিয়ে ফেলবে কোনটি সুরঞ্জনা কোনটি ঝুমুর।

আফজালের জন্য কি আমার মায়া হচ্ছে? নিজেকে আমি প্রশ্ন করি, নিজেকেই উত্তর দিই, না হচ্ছে না।

ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। ও আমাকে বলেছিল হারুনকে তালাক দিয়ে ওর সঙ্গে যেন পালিয়ে যাই, ওকে বিয়ে করি। সম্পর্ক আরও দীর্ঘ করলে ও আরও তাড়া দিত, ভাল যে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হারুনকে তালাক দিয়ে ওর কাছে গেলে কি এমন ভাল হত! আফজাল আমাকে বিয়ে করবে, বিয়ের পর সন্দেহ করবে নিশ্চয়ই আমি অন্য কারও সঙ্গে মিশছি, হারুনের স্ত্রী থাকাকালীন যদি আফজালের সঙ্গে সঙ্গমে জড়াতে পারি, তবে আফজালের স্ত্রী হবার পরও নিশ্চয়ই আমি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে জড়াব।

খাওয়া শেষে আনোয়ারকে নিয়ে হারুন বৈঠকঘরে বসে রাজনীতি ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে। শাশুড়ির পানের বাটা থেকে দুটো পান নিয়ে সেবতি আর আমি আসি শোবার ঘরে। দুজনে বিছানায় পা তুলে বসি, আলোচনা, আগত সন্তান।

সেবতি বলে, জিতে গেলে তো।

—হ্যাঁ গেলাম। কী দেবে বল।

—কী চাও?

—বন্ধুত্বটুকু কখনও নষ্ট হতে দিয়ো না। এই চাই।

সেবতির উপদেশ প্রথম তিন মাস স্বামীর সঙ্গে সহবাস চলবে না।

আমি হেসে উঠি, স্বামীর সঙ্গে সহবাস চলবে না, অন্য কারও সঙ্গে চলবে তো!

—তা চলবে। আমি ডাক্তার হিশেবে গ্যারান্টি দিতে পারি অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাসে কোনও ক্ষতি নেই।

তুমুল হাসির রোল।

এবার ধীরে সেবতির একটি হাত হাতে নিয়ে আমি বলি, তোমার দেবর সত্যি চলে যাচ্ছে?

সেবতির কপালে ভাঁজ পড়ে আফজালের প্রসঙ্গে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমি চাই না ও থাকুক এ বাড়িতে।

গলা চেপে বলি, কেন?

সেবতি ফিসফিস করে বলে, অসহ্য অসহ্য।

ওর হাতে চাপ দিয়ে বলি, কেন অসহ্য?

সেবতিও গলার স্বর চেপে বলে, জানো তো আমি এখন আলাদা ঘরে ঘুমোই। সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘরে শব্দ শুনে চমকে উঠি। দেখি আফজাল। পুরো ন্যাংটো হয়ে আমার বিছানায় শুতে এসেছে। আমার কাপড়চোপড় টেনে খুলে নিচ্ছে। কি বলব...

বলতে-বলতে সেবতির গা শিউরে উঠছে, ছি ছি ছি...আমি ওকে ধমকে তাড়ালাম ঘর থেকে।

তা কেন, তুমিই তো বলেছিলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে...

আমার কথা শেষ হয় না, সেবতি বলে, বলা আর করা দু জিনিস বুঝলে ঝুমুর। আমি আনোয়ারের ওপর রাগ করে বলেছি। যত হোক, আমি তো আফজালের ভাবী। একবার ভেবে দেখেছ আনোয়ার যদি টের পেত ভাইয়ের কাণ্ড। ভাইয়ের জন্য সে কি না করেছে। অস্ট্রেলিয়া যাবার ব্যবস্থা তো আনোয়ারই করে দিয়েছে। ওর কি নিজের সাধ্য ছিল যাওয়ার।

আমি সেবতির দিকে অবাক তাকিয়ে থাকি। ও দম ফেলে ফেলে বলে যায়, আমিও তাই চাই না ও এ বাড়িতে থাকুক। আনোয়ারকে এখনও ঘটনা জানাইনি। জানালে ও আফজালকে আর আস্ত রাখবে না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে যা কিছু হয় স্বামী-স্ত্রীতে হয়, আমরা দুজনে পরস্পরের ওপর এত নির্ভর করি, যৌনতা এ সম্পর্কে না থাক, বন্ধুত্ব তো আছে। এরকম বন্ধু কি আমি শত খুঁজলেও পাব? আমি আফজালকে কোনওরকম সুযোগ দিতে চাই না আমার সংসারের এতটুকু অনিষ্ট করার।

সেবতির শেষদিকের কথাগুলোয় আমি আর মন দিই না। ওকে থামিয়ে বলি, বমি বন্ধ হওয়ার জন্য কি কোনও ওষুধ খাব?

সেবতি বলে কাল ও আমাকে ওষুধ দিয়ে যাবে কিছু। কিছু আয়রন ট্যাবলেটও

দেবে। আমার ভাবনার কিছু নেই, ওগুলো সব ফ্রি স্যাম্পল।

রাতে হারুনের নিবিড় আলিঙ্গনে শুয়ে আমার হঠাৎ সেবতির জন্য বড় মায়া হতে থাকে। জানি না কেন বাহুতে ঠিক যেভাবে আফজাল হাত বুলিয়ে দিত, ঠিক সেভাবে হাত বুলোচ্ছিলাম, ভাবছিলাম আফজাল ঠিক এভাবে হয়তো সেবতিকে বুলিতে দিতে পারত, সেবতির ভাল না লেগে পারত না, হারুন বলে—দেখলে তো দেখলে তো।

চমকে উঠি।

দেখলে তো, গা চুলকোচ্ছে তো! বলেছিলাম ইলিশ মাছ খেয়ো না। গা চুলকোবে, গায়ে লাল লাল দাগ পড়বে।

হেসে বলি, ভেবো না তো এত।

হারুনের মন ইলিশ মাছে ফেলে রাখতে আমি সত্যি সত্যি কিছুক্ষণ গা চুলকোই। হারুন আমার চুলকোনোর জায়গাগুলোয় নরম করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, আনোয়ার লোকটি বেশ ভাল।

—কি বলল?

বলল তারও একটি বাচ্চার শখ। কিন্তু সেবতি এখন মোটে বাচ্চা চাইছে না। সেবতি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করবে, এ মুহূর্তে বাচ্চা হলে ওর আর লেখাপড়া হবে না, তাই।

—তাই কি?

—হ্যাঁ তাই।

আমার যখন ঘুমে চোখ লেগে এসেছে তখনই রাতের স্তব্ধতা ভেঙে মিহি কান্নার শব্দ আমাকে সজাগ করে। কে কাঁদে এত রাতে? পা-পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে শুনি দোলনের ঘর থেকে আসছে শব্দ। ওর বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে ও।

পিঠে একটি হাত রাখি ওর।

—দোলন, কাঁদছ কেন?

কান্না থামে। অনেকক্ষণ ও কোনও উত্তর দেয় না।

—কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?

দোলন ওভাবে শুয়ে থেকে বলে, সুমাইয়ার আব্বুর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কেন?

—একা একা থাকছে। আমাকে ছাড়া ওর ভাল লাগে না। এখন কে তাকে রেঁধে খাওয়াবে, আমার হাতের রান্না ছাড়া ও খেতে পারে না কিছু। আমার সঙ্গে না ঘুমোলে ওর ঘুম হয় না।

দোলনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, আনিসকে বল চলে আসতে, নয়তো তুমি চলে যাও।

দোলন ঝট করে উঠে বসে—কী বলছ ভাবী। আমি কী করে যাব! হাসানের

এই অবস্থা রেখে আমি কী করে যাব? হাসানের সেবা যত্ন তুমি কি ভেবেছে রাণু পারবে! ওই থানকুনি পাতাটি কি কিছু পারে, দেখেছ কখনও? ও তো কেবল কাঁদতে পারে, কাঁদলে কি হাসান ভাল হয়ে উঠবে?

— রাণু না পারুক। আমরা তো আছি। বাড়িতে এতগুলো মানুষ, সবাই তো যত্ন করছি হাসানের। সান্ত্বনা দিই দোলনকে।

দোলন ফুঁপিয়ে উঠল বলতে গিয়ে যে হাসান দোলনকে ডেকে নিজে বলেছে, ওর নাকি একেবারে যত্ন হচ্ছে না, ওর মনে হচ্ছে না ফুসফুস থেকে পানি সরানো হয়েছে। মনে হচ্ছে বাম পা ওর কোনওদিন জোড়া লাগবে। ভেতরে ঘা হয়ে গেছে।

দোলনকে শান্ত করে শুইয়ে দিয়ে আমি যখন ঘরে ঢুকি হারুন নাক ডাকছে।

রাত অনেক। আমার ঘুম আসে না। জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকি। বাগান থেকে হাসনুহানা ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। লম্বা শ্বাস টেনে হাসনুহানার ঘ্রাণ নিতে থাকি। এই ফুলের গন্ধে শুনেছি সাপ আসে। সাপ রাতে পেঁচিয়ে থাকে গাছের গুঁড়ি। ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আমিও বাগানে ওই সুগন্ধের পাশে শুয়ে থাকি।

মাস যায়। আমার তলপেট ভারী হতে থাকে।

আমার রান্না করার দরকার নেই। ঘরের কোনও কাজকর্ম করার দরকার নেই। হারুন বলে দিয়েছে।

—তো কী করব আমি?

—শুয়ে বসে বিশ্রাম করবে। প্রচুর খাবে। প্রচুর ফল। মাছ মাংস ডিম দুধ।

—এত খাবার কী দরকার আছে?

—তোমার দরকার নেই। দরকার আমার বাচ্চার।

—ও তাই বল।

যে যে বই পত্রিকা ম্যাগাজিন পড়তে চাই হারুন সব কিনে স্তূপ করে রেখেছে। শুয়ে শুয়ে পড়ি। শোবার ঘরে একটি টেলিভিশনও এনে রেখেছে, যেন শুয়ে শুয়েই দেখতে পারি।

ঘরের টেবিল ফুলে ফলে ভরে থাকে সবসময়। সকাল দুপুর রাত তিন বেলাতেই আমি শাশুড়ি, দোলন আর রাণুর হাতের রান্না খাই। হারুণ আপিস থেকে এখন আর রাত করে ফেরে না। বিকেল হলেই নাকি সে ছটফট করে বাড়ি আসার জন্য। আসার পথে আরও একগাদা জিনিস আমার জন্য কিনে আনে। সব খাবার জনিস। ফল তো আছেই, দুধ, হরলিক্স, কমলার রস, আপেল আঙুর-এর রস। এত খাবার আমি একা খেতে পারি না। বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে দিই। কিছু তবু ফুরোয় না। আমি এ বাড়িতে এখন খুব মূল্যবান একজন মানুষ। আমি এ

বাড়ির বংশের বাতিকে আমার ভেতর লালন করছি। আমি এদের উত্তরাধিকারীকে গর্ভে ধারণ করেছি।

শাশুড়ি ঘন ঘন এসে শরীর কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করেন। কী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে জিজ্ঞেস করেন। তিনি করেন কারণ হারুন এলে যেন বলি শাশুড়ি আমার দেখভাল করছেন। শাশুড়ি এবাড়িতে যত দাপুটে হোক না কেন, দাপট তিনি দেখান ছেলেবউদের ওপর, যে ছেলের ওপর তিনি নির্ভরশীল, সেই ছেলে এখন যা চাইছে তা তাঁর মেনে নিতেই হচ্ছে। টাকা যার হাতে, দড়ি তার হাতে। নাকে সবার দড়ি, দড়ি যেদিকে ঘুরবে—নির্ভর করা লোকগুলো সেদিকেই ঘুরবে। ক্ষমতা এখন আর অন্য কিছুর নেই, ক্ষমতা টাকার। বাবা মা ভাই বোন এসব সম্পর্কগুলো বা বয়সে বড়-ছোটর ব্যাপারগুলো এখানে এসে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। আজ বয়সে ছোটর হাতে টাকা এলে বয়সে বড় তাকে গুরু মানবে।

সারাদিনই আমার খবর নিতে ঘরে ঢুকছে বাড়ির সদস্যরা। এমনকী বাউণ্ডুলে হাবিবও।

—ভাবী কিছু লাগবে তোমার?

দোলন এসে জিজ্ঞেস করে, ভাবী কিছু খাবে?

রাণুও আসে, ভাবী শরবত করে আনব? ভাত কি এখানেই দেব না কি টেবিলে যাবে?

হাসান ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে এ ঘরে আসে, জানালার পাশে বসে উদাস তাকিয়ে থাকে আকাশে।

অনেকক্ষণ এভাবে ও বসে থাকে কথা না বলে। একসময় বলে সৌদি আরবের আকাশও তো এমনই আকাশ, তবে ওর দেশের জন্য কষ্ট হবে কেন!

হাসান প্রথম যেদিন এ কথা বলেছে, ওকে বলেছিলাম দেশ কি কেবল আকাশই? আরও কিছু তো আছে।

হাসান হেসে বলেছে, আর যা আছে সব ছোট ছোট, সবচেয়ে বড় হল আকাশ।

শুনে হেসেছি। হাসান কোনও উত্তর আশা করে কোনও প্রশ্ন করে না। এত ভিড়ভাট্টার মধ্যে মানুষ হয়েও ও নিজে খুব নির্জন। রাণুর সঙ্গে ওর মেলে ভাল। সুস্থ যখন ছিল, ও প্রায়ই রাণুর জন্য কিছু না কিছু লুকিয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। বাড়ির আর কারও জন্য নয়, কেবল রাণুর জন্য। দুটো কমলালেবু নয়তো একটি পাউডারের কৌটো। দেখে আমার ভাল লাগত। কেউ কাউকে ভালবাসে দেখলে আমার ভাল লাগে।

শাশুড়ি সারাদিন বসে কাঁথা সেলাই করেন। বাচ্চার কাঁথা। ছোট ছোট জামাও বানিয়ে রেখেছেন। বাচ্চার জামা। হারুন কদিন পর পরই আমাকে ধানমণ্ডি ক্লিনিকের ডাক্তার সোফিয়া মজুমদারের কাছে নিয়ে যায়। সেবতি প্রায়ই আসে। আগের মতো ঘন ঘন না হলেও আসে। ওর পড়ালেখার চাপ এখন খুব বেশি। পরীক্ষা সামনে।

হারুন যখন আপিসে থাকে, এ বাড়ির রাণুর সঙ্গেই আমার কথা হয় সবচেয়ে বেশি। ও পাশে বসে চুলে বিলি কাটতে কাটাতে বলে, তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে

বলেই তোমার এত খাতির এ বাড়িতে।

—কেন তোমাকে বুঝি কেউ খাতির করে না।

রাণু ঠোঁট উল্টে বলে, মোটেও না।

কী করে বুঝলে?

—বাইরে যেতে হলে আমাকে বোরখা পরতে হয়। বোরখা ছাড়া শাশুড়ি আমাকে বেরোতেই দেন না। কই, তোমার তো না পরলেও চলে।

—তুমি বোরখা না পরলেই তো পারো।

—শাশুড়ি মানবেন না। আমার স্বামী তো রোজগার করে না। রোজগার করলে দেখতে ঠিকই বোরখা ছাড়া বেরোতে পারতাম। শাশুড়ি ধমক দিতে পারতেন না।

রাণু একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে আনিসের খবর দেয়। আনিসকে পুলিশে ধরেছে।

—পুলিশে?

—হ্যাঁ পুলিশে।

—পুলিশে কেন? কী করেছে আনিস?

—ওর আরও দুজন বন্ধুকেও ধরেছে। চোরাকারবারির কাজ করত, তাই।

আমি উঠে বসি। বিস্ময় আমার, বল কি! আনিস কি ওই কাজ করতে চট্টগ্রাম গিয়েছিল?

—নিশ্চয়ই।

—হারুন জানত এ কথা?

—নিশ্চয় জানত। একেবারে গাদা গাদা টাকা আসার ব্যবসা, বুঝলে!

—তবে দোলনের কী হবে? দোলন তো সেই কবে থেকে চট্টগ্রাম যাবে যাবে করছে।

—তুমি যে কী বল ভাবী। তুমি কি কিছু খবর রাখো না? দোলন আপা তো চট্টগ্রামে গিয়ে দেখেছে আনিস দুলাভাই অন্য এক মেয়ে নিয়ে থাকছে। দোলন আপা পরে চট্টগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে। খবর শুনে হারুন ভাই বলেছে ঢাকায় চলে আসতে।

আমি থ হয়ে যাই শুনে। হারুন আমাকে এসবের কিছু জানায়নি কোনওদিন।

আনিসের খবরটির চমক শেষে রাণু শান্ত হয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে,

—ভাবী তোমাদের ওপর খাপ্পি দাপ্পি। হারুন ভাই তো সব দিচ্ছেন। তিনি মানুষ নন বুঝলে ভাবী, দেবতা। আমি হলে আমার স্বামীকে সমস্ত সংসারের বোঝা বইতে দিতাম না। তোমার কি রাগ হয় না?

—কি জানি বুঝি না। আমার কণ্ঠে উদাসীনতা।

—তোমার একটা আলাদা সংসার করতে ইচ্ছে হয় না? আমার কিন্তু হয়।

আমি হেসে রাণুর ডান হাতটি হাতে নিয়ে ওর সরু আঙুল নিয়ে খেলা করি, মনে মনে বলি, আমার কি কেবল আলাদা সংসারের স্বপ্ন ছিল রাণু! চমৎকার

একটি জীবনের স্বপ্ন ছিল। আমার জন্য খোলা একটি আকাশ থাকবে, এখন সংসার নামের এই খাঁচায় বসে থাকতে থাকতে ভুলে গেছি আকাশ দেখতে আসলে ঠিক কেমন!

রাণু বাঁ হাতে আমার চুলে আবার হাত রাখে, বুলোতে বুলোতে খুব নরম কণ্ঠে বলে, হারুন ভাইকে বল ওকে টাকা দিতে।

—ওকে কাকে?

—বোঝো না বুঝি? ওকে।

হা হা করে হেসে উঠি যখন খানিক পর বুঝি যে ওকে হচ্ছে হাসানকে। হাসান যেহেতু রাণুর স্বামী, স্বামীর নাম উচ্চারণ নিষেধ, তাই ওর ও, ওকে এসব বলেই স্বামীকে বোঝাতে হয়। আমি হাসিটি গিলে ফেলি, কারণ আমার জন্যও হারুণ শব্দটি উচ্চারণ বারণ, আমিই বা রাণুর চেয়ে আলাদা কীসে! শাশুড়ির জন্যও জয়নাল উচ্চারণ বারণ। দোলনের জন্যও আনিস।

—বিদেশ যাওয়া তো এখন আর হচ্ছে না, এখানেই ব্যবসা শুরু করুক কিছুর। রাণু মিনমিন করে বলে।

—হাসান নিজে বললেই পারে।

—ও খুব চুপচাপ থাকে। দেখেছ তো। কাউকে কিছু বলতে চায় না।

রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, নিজেরই তো ভাই। পরের ছেলে আনিস, তাকে তো ছয় লাখ টাকা দিয়ে দিল। আর আপন ভাই অসুস্থ পড়ে আছে...। তুমি আজই বল ভাবি।

—তোমার হারুন ভাই কিন্তু সবার জন্য ভাবে। তাকে বলার দরকার হয় না।

—তবু তোমার কথার দাম আছে না!

—এ সংসারে আমার দাম একরত্তি নেই। এখন সবাই আমার যত্ন করছে, এ আমার জন্য নয়, আমার পেটের বাচ্চাটির জন্য। তুমি আর আমি সবাই এক। সংসারে মেয়েমানুষের কোনও দাম নেই।

—তাহলে দোলন, তার এত দাপট কীসের?

—দাপট কি তার আসলেই কিছু আছে রাণু?

রাণুর আঙুলগুলো রাণুকে ফেরত দিয়ে আমি চোখ বুজি। আমার খুব ঘুম পায় আজকাল।

রাণু পাশে বসে ফিসফিস করে বলে যায়, দোলনকে তো ওর শ্বশুর বাড়িতে ঢুকতেই দেয় না। শাশুড়ির কপালে নাকি থাল ছুঁড়ে মেরেছিল, কপাল ফেটে গেছে শাশুড়ির। ও আস্ত একটা ডাইনি।

বিকেলে সেবতি আমার ঘুম ভাঙায়।

চোখের নীচের চামড়া টেনে ধরে রক্তশূন্যতা আছে কি না দেখে। নাড়ি দেখে, রক্তচাপ মাপে। বুকে নল বসিয়ে হৃদপিণ্ড দেখে, ফুসফুস দেখে। তারপর পিঠে চাপড় দিয়ে বলে, সব ঠিক।

সব ঠিকের পর সেবতি বিছানার পাশে একটি চেয়ার টেনে বসে বলে,

আফজালের যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে।

—কবে যাচ্ছে?

—সাতাশ তারিখে।

সেবতিকে খুব মলিন দেখায়। আফজালের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি বলি, তোমার পরীক্ষা কবে শুরু হচ্ছে।

—সে দেরি আছে। তবু এত পড়তে হচ্ছে কী বলব! রাত তিনটে চারটেয় ঘুমোতে যাই।

—আফজাল কি আবার তোমাকে বিরক্ত করেছে রাতে?

সেবতি রুষ্ট স্বরে বলে, বিরক্ত করবে আবার? আফজালের মতো ছেলে? অত সাহস তার আছে নাকি?

সেবতির মুখটি বড় শুকনো লাগে। মনে হয় অনেকদিন ও কিছু খায়নি। আফজালের সাহস নেই বলে আমার মনে হতে থাকে সেবতির রাগ হচ্ছে। ওর সাহস থাকলে সেবতি বেঁচে যেত।

সেবতি বলে, ভাল যে এখন আর ন্যাংটো কোনও মেয়ের ছবি আঁকে না।

—তবে কি আঁকে?

—সেদিন দেখলাম একটি মেয়ে এঁকেছে, মেয়েটির পেছন দিক, শাড়ি পরা, মুখ দেখা যাচ্ছে না, মেয়েটির সামনে সিঁড়ি। সিঁড়ি অনেকদূর চলে গেছে।

বুকের ভেতরে হু হু করে ওঠে আমার। সেবতি বসে থাকে পাশে উদাস। আমি আফজালের মুখটি মনে করার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে এরকম হয়, ওর মুখটি ঠিক মনে করতে পারি না। ওর কি গোঁফ আছে, না কি নেই? বারান্দায় কদাচিৎ যদি দাঁড়াই, আফজালকে আর বাগানে হাঁটতে দেখি না। ওকে ভালবেসে কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটাবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। বিয়ে নামক ব্যাপারটির হারুনের সঙ্গে কি আফজালের সঙ্গে কি যে কোনও রহিম করিম যদু মধুর সঙ্গে হোক, একই অবস্থাই হবে আমার বিশ্বাস। একই ঘানি, কলুর বলদের মতো এক সংস্কারের চর্চা করতে করতে ঘুরতে হবে, ঘুরে মরতে হবে। আফজাল হয়তো ভাববে শারীরিক সুখের লাগি আমি ওর দ্বারে ভিড়েছিলাম। আমি এক শরীর-সর্বস্ব নারী, আর কিছু নই। হৃদয় বলে আমার কিছু নেই। হৃদয়কেই আমি সম্পদ মনে করি, কিন্তু সে আমিই মনে করি, আর কেউ নয়। আমার শরীরকেই আমার একমাত্র সম্পদ বলে মনে করা হয়। যদি আমার এতটুকু কোনও মূল্য থাকে, সে আমার শরীরের কারণেই। আর আমার এই শরীরও এখন আর আমার সম্পদ নয়, এ আমার স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের সম্পদ। আফজালের কাছে বাঁধা পড়লে আমার এই শরীরই হয়ে দাঁড়াবে আফাজালের সম্পদ। এই শরীরে যা কিছু রোগ শোক ব্যাধি ব্যারাম তা সওয়ার জন্য আমি, আর এই শরীর যা কিছু সুখ, শান্তি, সন্তান, সম্ভোগ, সম্পদ মিলাতে পারে, তা অন্যের।

সেবতি কখন নিঃশব্দে চলে যায়, খেয়াল করিনি।

হারুন বিকেলে ফিরে আমাকে চুমু খায়। চুলে, চোখে, নাকে, ঠোঁটে, চিবুকে।

চুমু খায়, মুখে আঙুর তুলে দেয়, বুকের লাল দাগগুলো চলে গেছে কি না দেখে। বুকে মুখ ঘষে দিয়ে বলে, সব চলে গেছে, এরপর থেকে আর ইলিশ খাওয়া চলবে না। ইলিশ খেলে আমার বাচ্চার গায়েও ফুসকুড়ি হবে।

হারুন দশটি মুরগির বাচ্চা এনেছে। প্রতিদিন একটি মুরগির বাচ্চার সুপ খাওয়ানো হবে আমাকে।

মুরগির ডিম আনা হয়েছে। প্রতিদিন নিয়ম করে চারটে ডিম। নিয়ম করে আধসের দুধ। হারুন নিজে দুধের গেলাস হাতে নিয়ে আমাকে খাওয়ায়। মুখ সরিয়ে নিলে আবার সোনা আমার লক্ষ্মী আমার খাও খাও বলে আরও খেতে বলে। বলে, ডাক্তার বলেছে খেতে, খাও।

এখন আর পুরুষ মানুষ খেয়ে গেলে তারপর আমার খেতে হয় না। আমার খাওয়া সবার আগে। রাতে হারুন আমাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। আমার পাতে সবচেয়ে ভাল খাবারগুলো উঠিয়ে দেয়।

এত খেলে আমি জানি আমার ওজন বেড়ে যাবে খুব। যাচ্ছেও বেড়ে। অবশ্য এসব খাবার তো আমাকে ভালবেসে দেওয়া হচ্ছে না। বাচ্চা পেটে আসার আগে আমি কী খেয়েছি না খেয়েছি হারুন কোনওদিন জিজ্ঞেস করেনি। আমার কী খেতে পছন্দ তা সে আজও জানে না। অথচ আমার সব মুখস্ত হারুন কী খেতে পছন্দ করে, কি অপছন্দ করে। কেবল খাবার দাবার নয়, কী পরতে ও পছন্দ করে, কী করতে, এমনকী কী ভাবতে।

রাতে হারুন সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। সে যে এত চমৎকার আদর করতে পারে, আগে আমার জানা ছিল না। মনে হতে থাকে আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি। আমি হারুনের আদর পেতে পেতে বলি, এই বল তো তুমি কী চাও? ছেলে না মেয়ে?

হারুন আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমাকে যা উপহার দেবে তাই। আমার সন্তান যা হবে, তাই হবে। ছেলে বা মেয়ে।

মনে মনে বলি, আসলে মুখে যাই বল না কেন, তুমি ছেলে চাও হারুন, ছেলে। ছেলে হওয়ার মজা তুমি তো জানো। তুমি নিজে যে ভাবে জীবন উপভোগ করছ, নিশ্চয়ই চাও তোমার ছেলেও একই রকম করুক। মেয়ে হওয়ার জ্বালা আমার চেয়ে তুমি কিছু কম জানো না। আমি ছেলে মেয়ে কিছুই চাই না, এ সন্তান আসলে আমার কাঙ্ক্ষিত সন্তান নয়। এ আমার প্রতিবাদের, প্রতিশোধের সন্তান। এ আমার স্বপ্নের ভ্রূণ নয়, এ আমার ক্ষোভের, যন্ত্রণার ভ্রূণ। এ আমার সুখ নয়, স্বস্তি নয়, এ আমার দুঃখের আরেক নাম, এ আমার কষ্টের পৃথিবী।

হারুন আপিস কামাই করছে ঘন ঘন। আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, হাওয়া খেতে নিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রিমা উদ্যানে। রেস্তোরাঁয় খেতে নিচ্ছে। পেট নিয়ে একদিন সোহেলি ফুপুর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়েও আসা হল। একটু হাঁটাহাঁটি করা ভাল, ডাক্তার বলেছেন। বলেছেন বিশ্রামও নিতে। আমাকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হারুনের কাজই হল আমার পেটের ওপর আলগোছে কান পেতে বাচ্চার বুকের ধুকপুক শোনা। শুনতে পেলে হারুন এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে আমার পুরো পেটে চুমু খেতে খেতে ভেতরের মানুষটির সঙ্গে কথা বলে, কি গো বাবুসোনা, ছোট্ট সোনামণি, আমি তোমার বাবা, তোমার বাবা আমি।

আমি হেসে উঠি।

—কী ব্যাপার হাসছ কেন?

—বাচ্চাকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছ যে তুমি ওর বাবা?

হারুনের সুখী মুখ, খুশি মুখ। হ্যাঁ সে এখনই জানাতে চায়। দিন গোনে হারুন, ঘণ্টা গোনে, মুহূর্ত গোনে কখন সে সন্তানের মুখ দেখবে।

এখনই বাচ্চার জন্য সে বিছানা বালিশ, কাপড় চোপড়, তেল সাবান তোয়ালে, দুধ দুধের বোতল সব কিনে রেখেছে। বাচ্চার খেলনাপাতি কিনে বাড়ি ভরে ফেলেছে।

কী চাও তুমি বলো? হারুন প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে বলে। বললেও আমি জানি, আমি যা চাই, তা দেবার সামর্থ্য হারুনের নেই। আপাতত আমি আমার বাবা মাকে দেখতে চাই।

হারুন আমার বাবা মাকে নেমন্তন্ন করে এ বাড়িতে। ব্যাগ ভরে বাজার করে নিয়ে আসে তার শ্বশুর শাশুড়ির জন্য। নানারকম রান্নার আয়োজন চলে বাড়িতে। হারুন ওয়ারি থেকে আমার বাবা মা তো বটেই নুপুরকেও নিয়ে আসে। সুখ উপচে পড়ে আমার, মাকে বুকে জড়িয়ে মায়ের গায়ের গন্ধ নিই। চেনা গন্ধ। ইচ্ছে করে এই গন্ধটির পাশে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে নুপুরের সঙ্গে ছোটবেলার মতো গোলাপপদ্ম খেলতে নামি। আমার ঘুমোনো হয় না, খেলা হয় না। সবাই আমার স্ফীত উদরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমাকে সম্ভবত খুব উদ্ভট লাগছে, আমাকে আমি বলে চেনা যাচ্ছে না।

নুপুর বললেও সে কথা। বলল, আমি অনেক বদলে গেছি।

বদলে গেছি? আমি হেসে উঠি, জানি না হাসিটি আমার ঠোঁটে হাসির মতো দেখায় কি না।

—আমি কি বলেছিলাম আমার কোনওদিন বাচ্চাটাচ্চা হবে না!

নুপুর ম্লান হাসে।

মা আঁচলে চোখ মোছেন। বাবা বিষণ্ণ বসে থাকেন এক কোণে।

দীর্ঘ দীর্ঘদিন আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম আমার ঘনিষ্ঠ মানুষদের কাছ থেকে। হঠাৎ করে একদিন এখন সবাইকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি, যখন আমি ঠিক আগের মতো নেই, বেঢপ একটি শরীর নিয়ে হাঁটছি, কোমরে হাত রেখে বিছানায় বসছি, হাঁপাচ্ছি, শুয়ে পড়ছি—দেখতে আমাকে অন্যরকম লাগছে, তাই বলে তো আমি বদলে যাইনি, আমি সেই আগের ঝুমুরই আছি। অন্তত মনে। আমি এখন আপাদমস্তক গৃহবধূ, আমি জানি এ রূপে আমি কখনও নিজেকে কল্পনা করিনি, আমার বাবা মা বোনও হয়তো করেনি। আমার অন্যরকম হবার কথা ছিল, আমার এখন শাশুড়ির পদশব্দে ঘোমটা মাথায় দেওয়ার কথা ছিল না।

—কী ব্যাপার, এত মলিন কেন সবার মুখ? খুশি হও। আমার স্বামী ভাল টাকা কামাচ্ছে, আমাকে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে,আমার বাচ্চাটিকেও খাওয়াবে পরাবে। খুশি হচ্ছ না কেন?

—চুপ কর তো! নূপুর বলে।

—কি তোমাদের সঙ্গে এত দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ রাখিনি বলে ভেবে নিয়েছ তোমাদের কথা আমি ভাবি না? তোমাদের আমি ভাল বাসি না।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠি আমি। বাবাকে জড়িয়ে, মাকে জড়িয়ে, বোনকে জড়িয়ে কাঁদি। প্রাণ ভরে কাঁদি।

আমি কাঁদি আমার অক্ষমতার জন্য। লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হয়ে স্বনির্ভর হব, এই প্রেরণা আমাকে দিতেন বাবা। অথচ আমি লেখাপড়া শিখেছি, বিদ্বান হয়েছি, মাথায় জ্ঞানের বোঝা নিয়ে পরনির্ভর হয়ে বসে আছি, একটি বস্তুর মতো বসে আছি। পরজীবীদের আলাদা কোনও জীবন থাকে না। আমি কাঁদি সেইসব দিনের কথা মনে করে, সেইসব দিন, সেইসব দিনে মা বলতেন, আমার ছেলের দরকার নেই, আমার মেয়েই ভাল। বাবা বলতেন, এই মেয়েদেরই আমি ননিটা ছানাটা খাইয়ে মানুষ করব, এই মেয়েদেরই লেখাপড়া শিখিয়ে বড় বানাব, ছেলের দরকার নেই, এরাই আমাকে বুড়ো বয়সে দেখবে।

পরজীবী মেয়ের কি কোনও সাধ্য আছে বাবাকে দেখে! বাবা কখনও চাননি তাঁকে আমি তাঁর অভাবে খাওয়াব, পরাব, আমার টাকায় বাবা নিজের সংসার চালাবেন। বাবা চিরকালই অসম্ভব অহংকারী মানুষ। একবার তাঁর টাকার দরকার হয়েছিল, কোনও আত্মীয়ের কাছে হাত পাতেননি, জলের দরে তাঁর বিক্রমপুরের জমি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বাবাকে দেখেছি নিজের আদর্শে অবিচল থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে। পেনশনের টাকায় এখন তাঁর নিজের সংসার চলে। অভাব আছে, কিন্তু অভাববোধ নেই তাঁর।

নূপুর কি আমার এই চার দেয়ালের বদ্ধ ঘরটির মধ্যে টের পাচ্ছে বাতাস ভারী হয়ে আছে, তা না হলে ও উঠে দুটো জানালা হাট করে খুলে দেবে কেন! জানালা গলে যে হাওয়াটুকু আসে, তা ও বড় বড় শ্বাস টেনে নিচ্ছেই বা কেন!

মা আমাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমি তো তোর মতো অত লেখাপড়া শিখিনি, তাই চাকরি বাকরি আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তুই কেন অকর্মা বসে আছিস?

—বাহ দেখছ না কি বহন করছি শরীরে!

মা শুকনো ঠোঁটে আসেন। হাসেন আমার অযৌক্তিক উত্তরে। যা বহন করছি তা আমাকে সারাজীবন তো বইতে হবে না। আর কমাস পরই আমি মুক্তি পাব এ থেকে।

অতিথিদির জন্য বেশ ভাল ভাল খাবার রান্না হচ্ছে। এ সব দেখে যে আমার বাবা বা মা কেউ ভাববেন যে বিত্তশালীর বাড়িতে মেয়ে সুখে আছে, তা নয়। তা যে নয় তা আমার বোধে উদয় হয়। ওয়ারিতে আমাদের বাড়ির পাশে একটা খুব পয়সাঅলা লোকের বাড়ি ছিল, লোকটি লোক ঠকানোর ব্যবসার করত, যখনই আমি বলতাম, লোকটি খুব বড়লোক, বাবা আমাকে শুধরে দিয়ে বলতেন, বলো ধনী, বড়লোক নয়। সেই ধনীর বাড়ির মেয়েরা দামি দামি ফ্রক পরত, দেখে বলতাম আমিও ওরকম ফ্রক চাই। বাবা কিছুতে ওসব ফ্রক কিনে দিতেন না। বলতেন খুব দামি পোশাক পরলে সুন্দর লাগে কে বলেছে? তোমার পরিচয় তোমার ভেতরের তুমিতে, তোমার জ্ঞানে বিদ্যায়, তোমার আচরণে ব্যবহারে—বাইরের পোশাকে নয়। যাদের ভেতরে ফাঁকা, তারাই বাইরেটাকে আঁকড়ে ধরে। যখন তেরো বছর বয়স, একবার রাস্তার ছেলেরা আমার জামা ধরে টেনেছিল বলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিলাম, বাবা আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলে আবার ভেব না যে কোনও ছেলের চেয়ে তুমি কিছু অংশে কম। বাবা বলতেন, যখন হাঁটবে, হাঁটবে মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড রাখবে সোজা, দৃঢ়, যদি রাস্তায় কেউ আবার অসভ্যতা করে, কষে এক থাপ্পড় দেবে গালে।

বাবা আমাকে আর নূপুরকে এসব মন্ত্র শিখিয়ে বেশি সাহসী করে তুলেছিলেন। আমরা খুব কমই পরোয়া করতাম আশপাশের কটূক্তি, বাঁকা হাসি, ছুড়ে দেওয়া জল, পানের পিক, ঢিল। প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যাওয়ার সাহস বা মনের শক্তি আমাদের ছিল। অন্তত একটা সময় অবধি ছিল। কিন্তু বিয়ের শেকলে আমাদের দুজনকেই জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, নূপুর যতটা না শক্ত শেকলে বাঁধা, তারও চেয়ে বেশি শক্ত আমার শেকল। আমার পরিচয়ই এখন আমার প্রতিবন্ধক। এই সমাজে একটি মেয়ের পরিচয় তার স্বামীর পরিচয়ে। এমনকী সেবতির মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষকেও লোকে মিসেস আনোয়ার বলে জানে। এ পাড়ায় এন জি ও কর্মী আনোয়ারের চেয়ে ডাক্তারের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু পাড়ার লোকেরা আনোয়ারকেই চেনে বেশি। সেবতি যে ডাক্তার তা কম লোকেই জানে, বেশির ভাগ লোক জানে আনোয়ার লোকটি এন জি ও চালায়, লোকটির একটি বাড়ি আছে, লোকটির একটি গাড়ি আছে, লোকটির একটি বউ আছে। সেবতি এ পাড়ায় যে ক্লিনিকে বসে রোগী দেখে, সেই ক্লিনিকে পাড়ার রোগীরা যায় মিসেস আনোয়ারের এর কাছে চিকিৎসা পেতে, ডাক্তার সেবতির কাছে নয়। আনোয়ার যে এ পাড়ায় খুব জনপ্রিয় তা নয়, আনোয়ার পাড়ার কোনও উন্নয়নের কাজ করছে না যে লোকে তাকে চিনবে, এ মানুষ-আনোয়ারকে চেনা নয়, এ একটি পুরুষকে চেনা। আমি যে ডাক্তারের কাছে প্রতিমাসে যাচ্ছি, সেই ডাক্তার আমাকে দেখছেন, আমাকে চেনেন তিনি হারুন উর রশিদের স্ত্রী হিসেবে, যে হারুন উর রশিদের

মতিঝিলে একটি আপিস আছে, ডাক্তার এও জানেন হারুন উর রশিদের কীসের ব্যবসা। কিন্তু ডাক্তারের যে রোগী, আমি, আমি ঝুমুর, তা ডাক্তার জানেন না, আমি পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি, তা ডাক্তার জানেন না।

শাশুড়ি খাবার দিয়েছেন টেবিলে, অতিথিদের নিয়ে আমার খেতে যাবার ডাক পড়েছে। আজ এ বাড়িতে এমন আয়োজন, যে কেউ দেখলে ভাববে শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামীর আদরে আমি বেশ সুখে আছি। হারুন নিজে অতিথিদের পাতে ভাত উঠিয়ে দিচ্ছে, শাশুড়ি থেকে থেকে বলছেন, আরও বেশি করে নিন বেয়াই, বউমা তুমি তো দেখি একেবারে খাচ্ছ না, এমন পাখির দানার মতো দানা তুললে হবে!

শাশুড়ি বললেন মাকে, আপনাদের মেয়ে তো এখন আমাদের মেয়ে, বড় আদরে এখানে আছে ও, বড় সুখে রেখেছি ওকে।

মা স্মিত হাসেন।

পোলাও মাংস, কোরমা, কালিয়া, দই মিষ্টি এসব টেবিলে সাজিয়ে হারুন বেশ গর্বিত, বারবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছে কতটুকু মুগ্ধ আমি। আমি অপ্রতিভ হাসি হেসেছি, সম্মানিত অতিথির জন্য এমন আয়োজন হয়, এবং এমন সম্মানিত অতিথিকে কেউ ঘন ঘন কামনা করে না। জানি এই তৈলাক্ত খাবারে সুসজ্জিত টেবিল ছেড়ে মার সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে কাজলি মাছের চচ্চড়ি দিয়ে শুকনো লঙ্কা ডলে ভাত খেলে আমার আরাম হত। মারও হত।

গাড়ির ড্রাইভার ওয়ারিতে সম্মানিত অতিথিদের পৌঁছে দেবে এরকম কথা। দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা মা আর বোনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আমার আবার সেইসব দিনের কথা মনে হল। সেইসব দিন, যেসব দিনে বাবা বলতেন নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজের পায়ে দাঁড়ালে নিজের সম্মান থাকে। পরনির্ভর মানুষের যত স্বচ্ছলতাই থাকুক না কেন, সেই স্বচ্ছলতা সত্যিকার কোনও সুখ দেয় না। এমন আদর্শের কথা শুনে শুনে বড় হয়ে আজ কি না ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক পরিবারের জবুথবু বউ হয়ে বসে আছি! বাবা বলেছিলেন, হয় হারুনকে বিয়ে কর, নয় তাকে আসতে বারণ কর, মেলামেশা বন্ধ কর। এর মানে তো এই ছিল না যে ওকে বিয়ে করে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, তুমি তোমার নিজস্বতা বিলিয়ে দাও।

হারুন আমাকে দরজা থেকে সরিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে যায়। রাতে শুয়ে শুয়ে ও হিসেব দেয় কোন দোকান থেকে কোন মাংস কিনেছে সে, কোন দোকান থেকে মাছ। এর চেয়ে ভাল মাছ আর মাংস বাজারে আর নেই। এর চেয়ে বেশি দাম আর কোনও মাছ মাংসের নেই। টাকা পয়সা হারুনের খুব প্রিয় একটি বিষয় সে আমি জানি। আমাদের বিয়ের কথা যখন হচ্ছিল, হারুন বেশ প্রথমই যে কথাটি জানতে চেয়েছিল, তা হল, দেনমোহর কত হবে?

দেনমোহর নিয়ে হারুন ভাবছে, এ আমাকে বিষম অবাক করেছিল। বলেছিলাম, এক পয়সাও নয়।

হারুন চমকেছে, বলেছে, মেয়ে বা মেয়েপক্ষ তো দেনমোহরের টাকা বাড়াতে চায়।

আমি হেসে বলেছি, তোমার আমার জীবনের সঙ্গে টাকা পয়সার নয়, ভালবাসার সম্পর্ক। যেদিন ভালবাসা থাকবে না, সম্পর্ক ভেঙে যাবে। তোমার কি এ কথা বিশ্বাস হয়, আমি কোনওদিন তোমার কাছে দেনমোহরের টাকা দাবি করব?

শুনে হারুন ভীষণ খুশি হয়েছিল। আমার একটি হাত টেনে নিয়ে সে হাতটি ওর দাড়ি কামানো নীল হয়ে থাকা গালে বুলোতে বুলোতে বলেছে, তুমি অন্যরকম মেয়ে, তাইতো তোমাকে এত ভাল লাগে। হারুন আবেগে কেঁপেছিল সেদিন। দেনমোহর এক পয়সা না হওয়ার আবেগে। বলেছিল, তোমাকে আমার করে চাই, সম্পূর্ণ আমার করে।

আমি হারুনের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছি, আমি আমিই, তুমি তুমিই। ভালবাসা কখনও একজনকে আরেকজনের সম্পত্তি করে না।

সেইসব দিন। মেরুদণ্ড সোজা রাখা আমার সেইসব দিন কণা কণা চাঁদের আলোর মতো আমার গায়ে পড়ছে এসে। আমি আলোকিত হচ্ছি। পাশে শুয়ে থাকা হারুন অন্ধকার মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ধানমণ্ডির নয়, গুলশানের একটি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করে হারুন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য সে ছুটি নিয়েছে আপিস থেকে। চব্বিশ ঘণ্টা আমার কাছ থেকে সে নড়ছে না। হারুনকে দেখে মনে হয় সে নিজে প্রসব করবে বাচ্চা। হারুন ব্যস্ত আমাকে পান করাতে, খাওয়াতে, আমাকে বসাতে, হাঁটাতে, শোয়াতে। ব্যস্ত বাচ্চার কাঁথা কাপড় দুধের বোতল গোছাতে। ব্যস্ত ডাক্তার ডাকতে, নার্স ডাকতে, আত্মীয় স্বজনের ভিড় ক্লিনিকে। সোহেলি ফুপু আমাকে জ্ঞান দেন প্রসবযন্ত্রণা কী করে সইতে হবে, শাশুড়ি একটি তাবিজ আমার বাহুতে লাগিয়ে দিয়ে যান। একটি কাগজে দরুদ লিখে দেন যেন পড়ি। শাশুড়িকে লক্ষ করি, উদ্বিগ্ন। দেখে আমার পুলক লাগে। এতকাল দেখেছি তিনি হাবিব হাসান আর দোলনের জন্যই ভাবেন, ওদের মঙ্গলই কামনা করেন শুধু। এ তাবিজ বা দরুদ আমি নিশ্চয় করে জানি আমার মঙ্গল কামনায় নয়, হারুনের সন্তানের মঙ্গল কামনায়। শাশুড়ি, আমি লক্ষ করি, আমার যত্ন যা করেন, করেন হারুনের সামনে। আমার মনে হয়, তাঁর ভেতরে এক আশঙ্কা কাজ করে, হারুন না আবার তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ে, হারুন না আবার সন্তানের আকর্ষণে স্ত্রীর অনুগত হয়ে ওঠে। হারুন না আবার তার বাবা মা ভাই বোনের ব্যাপারে উদাসীন হয়।

হারুন এখন যে কোনও দিকেই ঝুঁকতে পারে, আমার কিছু যায় আসে না। আর সে না তাকাক আমার নির্জনতার দিকে, দুঃসহ একাকিত্বের দিকে। এখন আমার

জগত জুড়ে হামাগুড়ি দেবে আমার সন্তান। তার সামান্য কৃপা বা করুণার আশায় আমি আর ব্যাকুল হব না। কি দরকার আর! ভালবাসা সময়ে না এলে সে ভালবাসার স্বাদ তত থাকে না। এখন হারুনের ভালবাসা দেখলে আমার আদিখ্যেতা মনে হয়। বয়স পার করে বছর পার করে হঠাৎ সামনে নতজানু হয়ে হারুন যদি বলে বসে তোমাকে ভালবাসি ঝুমুর, আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করব না কেন! আমার কাছে অদ্ভুত শোনাবে না কেন ওই শব্দাবলী! হারুনকে দেখতে অচেনা লাগবে না কেন!

সন্ধেয় ডাক্তার দেখতে এলে হারুনের অস্থিরতা বেড়ে যায়। বাচ্চা ভাল আছে তো! সব ঠিক তো! কোনও অসুবিধে নেই তো! সিজারিয়ান লাগবে না তো! ইত্যাদি বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। ডাক্তারকে ফেনার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

ডাক্তার হাঁটেন, পেছনে পেছনে হারুন হাঁটে। ডাক্তার শেষে ধমকে ওঠেন, আপনি অযথা অস্থির হচ্ছেন কেন? সব ঠিক আছে, কতবার বলতে হবে?

হারুন তবু ডাক্তারের পেছন পেছন কেবল হাঁটে না, দৌড়য়। আমি একটু উহু করলেই দৌড়ে যায় ডাক্তার ডেকে আনতে। ডাক্তার বলে দেয় আগে নার্স যাবে, দেখবে, তারপর আমাকে ডাকবে।

হারুনের অস্থিরতা দেখে আমার বড় হাসি পায়, আবার রাগও ধরে। ইচ্ছে হয় তাকে বলি, কার জন্য এত উদ্বেগ তোমার? এ তো তোমার সন্তান নয়। তোমার সন্তানকে তুমি নিজে হাতে হত্যা করেছ। আর যাকে এত ভালবাসছ, যার জন্য অস্থির হচ্ছ, সে একবিন্দু তোমার নয়। এক ফোঁটা তোমার নয়।

সিজারিয়ানের প্রয়োজন হয় না। প্রসবকক্ষে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেয়ে রাত সাড়ে তিনটেয় আমি একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিই। হারুন লুফে নেয়। আমার সন্তানকে, আমার আর আফজালের সন্তানকে সে নকশি কাঁথায় মুড়ে বুকে জড়িয়ে রাখে। দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। তৃপ্তিতে আমি চক্ষু বুজি। নারকেল যেভাবে কুড়োয়, সেভাবে একদিন আমার জরায়ু থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিল হারুনের সন্তান। আমি কিছুই ভুলিনি। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে আমি বড় করুণ কাতর চোখে তাকিয়েছিলাম হারুনের দিকে। হারুনের চোখ ছিল পাথর-মতো। আমি কেঁদে উঠেছিলাম, হারুনের শক্ত নিষ্ঠুর হাতদুটো ধরে অনুনয় করেছিলাম, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর হারুন, এ তোমার সন্তান, এ আমাদের প্রথম মিলনের উপহার, নিজের সন্তানকে এভাবে মেরো না। হারুন শোনেনি। শক্ত হাতে আমাকে ঠেলে দিয়েছে অপারেশন টেবিলের দিকে। চক্ষু বুজে আজ সেই নারকেল কুড়োর মতো শব্দ শুনছি। ডাক্তার নয়, নার্স নয়, যেন কুড়োচ্ছে হারুন নিজেই। হারুনের গা ভিজে উঠেছে ঘামে, চোখ রক্তাভ, দাঁতাল হাসি মুখে, মরিয়া হয়ে কুড়োচ্ছে। আমি কষ্ট পাচ্ছি, বলছি থামো। সে থামছে না। আমার মনে হতে থাকে কেবল জরায়ুর ভ্রূণ নয়, পুরো জরায়ু খুবলে তুলে নিচ্ছে সে, সাড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে আমার তলপেটে, পেটে বুকে যা কিছু ছিল, গলা বেয়ে ওপরে উঠছে, আমার নাক চোখ মুখ সব তুলে নিচ্ছে, মস্তিষ্ক কুড়োচ্ছে, কুড়িয়ে

যাচ্ছে...মাথায় বিষম যন্ত্রণা হতে থাকে আমার। চিৎকার করে ডাক্তারকে বলি ঘুমের ওষুধ দিতে।

ডাক্তার সেলাইয়ের জায়গায় ব্যথা হচ্ছে ভেবে আমাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন।

ঘুম যখন ভাঙল, চোখ মেলে দেখি আমি হাসপাতালের একটি নতুন ঘরে, শাদা বিছানায় শোয়া।

দেখি হারুন বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে আরেকটি বিছানায়, আর তাকে ঘিরে শাশুড়ি, দোলন, রাণু, সোহেলি ফুপু।

সোহেলি ফুপু বলছেন, হারুনের নাক চোখ কপাল পেয়েছে।

দোলন বলছে, ভাবীর মতো হাতের আঙুলগুলো।

শাশুড়ি শুধরে দিচ্ছেন, না না না। হাতের আঙুল পায়ের আঙুল একদম হারুনের মতো।

ঠোঁট কার মতো?

রাণু বলছে, একেবারে হারুন ভাইয়ের ঠোঁটই যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুমাইয়া বৃত্তের মধ্যে মাথা গলিয়ে আবদার করে বাচ্চাকে সে একটু ছোঁবে। হারুন সুমাইয়াকে এক হাতে সরিয়ে দেয়, কাছে যেতে দেয় না।

শাশুড়ি বলেন বাপের মতো লম্বা লম্বা পা হয়েছে।

হারুন কাঁথা তুলে বাচ্চার পাগুলো দেখে। মুগ্ধ চোখ হারুনের।

আমি চোখ মেলেছি, আমাকে বাচ্চাটি দেখাতে নিয়ে আসে হারুন। উজ্জ্বল মুখ, পিতৃত্বের অহংকার সারা মুখে। অহংকার আমার চোখের সামনে বাচ্চাটির মুখটি ধরে। আফজালের মুখখানা দেখি ছোট্ট মুখটিতে। আফজালের মুখ হঠাৎ হঠাৎ আমি মনে করতে পারি না, কিন্তু এই মুখটি দেখে চকিতে সেই মুখটি মনে এল। হাত বাড়িয়ে আফজালের ছেলেকে কোলে নিতে চাইলাম, হারুন বলল খুব সাবধানে, খুব সাবধানে নেবে।

আমাকে উঠে বসতে হল। দু হাত ধুতে হল সাবান আর গরম জলে, হাতের ওপর পরিষ্কার কাঁথা বিছিয়ে দেওয়া হল, তার ওপর বাচ্চা। এত ছোট বাচ্চা আমি কোনওদিন কোলে নিইনি, আমার ভয় ভয় লাগে, হাতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় কি না। কেঁদে উঠছে বাচ্চাটি চোখ মুখ বিকৃত করে, ঠোঁটজোড়া সরু করছে, ঠিক আফজাল যেমন করত চুমু খাবার সময়।

হারুন গা ঘেষে বসেছে আমার, বাচ্চাটির দিকে অভিভূত দু চোখ।

—সবাই বলছে আমার মতো হয়েছে দেখতে। হবে না, হবেই তো।

—তুমি তো চেয়েছিলে দেখতে তোমার মতো হোক।

—আমার ছেলে আমার মতো হবে না কার মতো দেখতে হবে!

আমার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। সম্ভবত হারুন সে হাসিকে অনুবাদ করে এ তো আমারও ছেলে বাবা।

—কান তোমার কানের মতো।

হারুন ছেলের কানের ভাগ ছাড়া শরীরের আর কোনও ভাগ আমাকে দিতে

চায় না।

বাচ্চার গলায় একটি সোনার চেইন। ছেলের মুখ দেখে গলায় পরিয়ে দিয়েছে হারুন। এরকমই নাকি নিয়ম। হারুনের তাগাদায় বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হয় আমার। গা শিরশির করে। হারুন কাছে বসে অপলক চোখ বাচ্চার দুধ খাওয়া দেখে। দুধ খাওয়ানো হয় কি হয় না, ঘর ভরে যায় লোকে, ডাক্তার, নার্স। হাবিব এর মধ্যেই প্রচুর মিষ্টি এনে রেখেছে। সবাইকে পিরিচে করে মিষ্টি দেওয়া হয়।

বিকেলে হারুনের বন্ধুরা আসে বাচ্চা দেখতে, হাতে হাতে উপহার। কেউ জামাকাপড়, কেউ খেলনা, কেউ দুধের বোতল, শরীরে মাখার ক্রিম, সাবান, শ্যাম্পু। অনেকে সোনার আংটি, চেইন। আমার মা আনেন ছোটছোট পাতলা কাপড়ের সাদা জামা, তাঁর অত টাকা নেই সোনার গয়না কেনার। দেখে হারুন একটু কি হতাশ হয়! হয় হয়তো।

প্রথম দিন মিষ্টি খাওয়ানো হল, এতে হারুন সন্তুষ্ট নয়, হাসপাতাল থেকে বেরোবার দিন সবাইকে বিরানি খাওয়ানো হবে ঠিক করল। হাসপাতালে আরও দু চার দিন থাকতে হবে, পথ প্রশস্ত করার জন্য যৌনাঙ্গ ছিঁড়তে হয়েছে দুদিকে এক ইঞ্চি করে, সেটি সেলাই করে দেওয়া হয়েছে, সে সেলাই শুকোতে হবে, তারপর হাসপাতাল থেকে বিদেয়। সেলাই পড়ার কারণে যা যা দরকার, আমাকে গরম জলে বসানো, সেলাইয়ে মলম লাগানো সব হারুনই করে, হারুনই আমাকে ধরে স্নানঘরে নিয়ে যায়। বাকিটা সময় বাচ্চার সঙ্গে সে আছেই, বাচ্চাকে জল খাওয়ানো, দুধ খাওয়ানো, বাচ্চার কাঁথা বদলানো সব নিজে হাতে করে। আমি ঘুমোচ্ছি, বাচ্চা ঘুমোচ্ছে, এক হারুনেরই ঘুম নেই চোখে। বলেছি তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর, ঘুমোও। আমার কাছে নূপুর না হয় মা থাকুক রাতে। হারুন বলেছে, বাচ্চা যখন আমার, কষ্ট তো আমাকেই করতে হবে। আর একে আমার কষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। এ তো আনন্দ। তা বটে, আনন্দ। হারুনকে এত দীর্ঘদিন বিয়ের পর আমি আর কাছে পাইনি। ও একবারও আপিস ইত্যাদির নামও উচ্চারণ করে না। যেন তার ব্যবসাপাতি নেই, আপিস নেই। তার একটিই পরিচয়, সে ছেলের বাপ।

হারুনের জন্য কি একবার আমার মায়া হওয়া উচিত? আমি তার না ঘুমিয়ে ক্লান্ত কান্ত কিন্তু আনন্দিত চোখের তারায় তাকিয়ে ভাবি, আমি কি অনুতপ্ত হব, বলব অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর! কিন্তু কেন! যে অপরাধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইব, সে অপরাধের শাস্তি তো পেয়ে গেছি আগেই, এক অপরাধের জন্য দুবার শাস্তি নেব কেন!

হাসপাতালে সন্তান জন্মের উৎসব শেষে, সেলাই শুকোলে বাড়ি ফিরে আসি। বাড়ি ফুলে ফুলে সাজানো, বাচ্চার বাড়ি প্রবেশের উৎসব এখানে জমকালো করে করার আয়োজন হয়েছে। হারুনের আত্মীয়রা এক এক করে দেখতে আসছে, উপহার দিচ্ছে, খাচ্ছে, গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, আনন্দ চারদিকে। আমার আদর আরও বেড়ে গেছে এ বাড়িতে। আমি এখন ঘোমটা পড়া কুলবধূ নই। আমি এখন

বংশের বাতির মা, যে সে কথা নয়।

উৎসবের ধুম পড়ে বাড়িতে। হাসপাতাল থেকে এসে বাড়িতে থিতু না হতেই বাচ্চার আকিকা উৎসবের আয়োজন। বাড়ি সাজানো হচ্ছে দক্ষ লোক এনে। এত ঘটা কেন? আরে বংশের প্রথম ছেলে, ঘটা করেই তো করতে হয়। তা বটে মনে মনে বলি, আজ যদি মেয়ে জন্মাত, তবে এত ঘটার প্রয়োজন ছিল না। ছেলে বলেই এত কিছু। আস্ত একটি গোরু জবাই করে খাওয়ানো হল যত আত্মীয় আছে, যত স্বজন আছে, যত পড়শি আছে, এ বাড়ির সবার যার যত বন্ধু আছে, যত চেনা জানা আছে, সবাইকে। উপহারে ঘর উপচে পড়ল। হারুন দিন রাত ব্যস্ত উৎসবে। বিশাল আয়োজন। বাচ্চার নাম হারুন রেখেছে, মাহবুব উব রশিদ। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। বলেছিলাম, আমার নামের সঙ্গে মেলাবে না? হারুন বলেছে, বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়েই ছেলের নাম রাখতে হয়। তোমার নামের সঙ্গে কী করে মেলাব, তোমার পুরো নাম জিনাত সুলতানা, ছেলের নাম কি রাখা যাবে মাহবুব উর সুলতানা, বল!

যাই হোক, ডাক নামটি আমাকে রাখতে দাও। ছেলের ডাক নাম রাখো, আমার আবদার, আনন্দ।

ঠিক আছে, আনন্দ।

আমি হেসেছি। আমার হাসি-ঠোঁটে হারুন চুমু খেয়ে বলেছে, তুমি আমার জীবন সার্থক করেছ।

—কী করে?

—কী করে বুঝতে পারছ না? আমাকে আমার সন্তান উপহার দিয়ে।

হারুনের জন্য সত্যি আমার মায়া হয়। বেচারা।

উৎসবে সেবতি আসে, আনোয়ারও। দুজন বাড়ির লোকের মতো অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ব্যস্ততা শেষে সেবতি আমার কাছে এসে বসে, কপালের ঘাম শাড়ির আঁচলে মুছে বলে, তোমাকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে গো!

—কেন?

—তোমার স্বামী এত ভালবাসে তোমাকে, আমার জানা ছিল না।

—ছেলেকে ভালবাসে, আমাকে নয়।

—তোমাকে না ভালবাসলে ছেলের জন্য এমন পাগল হত না। অনেক বাবাই তো দেখেছি, কেউ এত করে না বাচ্চা হলে।

কথা এগোতে এগোতে আফজালে পৌঁছে। আফজাল চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়।

চলে গেছে? শ্বাস ফেলার শব্দ, এটি আমার দীর্ঘশ্বাস নাকি নির্ভার হওয়া ঠিক বুঝি না।

সেবতিকে আগের দিনের মতো দুঃখী লাগে না। আফজালের ওপর ও কোনও কারণে বিরক্ত, তাও মনে হয় না।

বলে, ওর ছবিগুলো সব নিয়ে যেতে পারেনি। কিছু ফেলে গেছে।

একটু কী আঁতকে উঠি! ভাবি, কোন ছবি, বিছানায় সোয়া নগ্ন নারীর ছবি, দীঘল চুলের মেয়ে? না কি ওই সুরঞ্জনা, ছোট চুল—দক্ষিণ ভারতীয় দেখতে মেয়েটি!

সেবতির দিকে প্রশ্ন চোখে তাকাই! ও উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িতে নিজেকে কেমন মানাচ্ছে দেখতে দেখতে বলে—ওই শেষ ছবিটি, একটি মেয়ের পেছন দিক, সামনে সিঁড়ি, সেই ছবিটি, নেয়নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে এ। বলেছে, এ কেউ নয়। এ স্বপ্ন। তাই কি? বলেছে, তাই। আনোয়ার আজ সেবতিকে বলেছে, সেবতিকে নাকি বেশ সুন্দর লাগছে। আসলেই লাগছে কী? সেবতি আমার কাছে জানতে চায়। সবুজ একটি জামদানি শাড়ি পরেছে ও, মিলিয়ে সবুজ একটি টিপ কপালে।

বলি, চমৎকার লাগছে। তুমি তো দেখতে সুন্দর। সবসময়ই তুমি সুন্দর।

সেবতি আয়নার সামনে থেকে সরে আমার গায়ের ওপর পড়ে, গাল টিপে দিয়ে বলে, তোমার মতো সুন্দর না তো! হারুন ভাই কি মিছিমিছি পাগল না কি তোমার জন্য!

সেবতিকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে হেসে বলি, আমি এখন ছেলের মা, হারুনের পাগলামো দেখার সময় আমার নেই।

বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে নিই সেবতির সামনেই, দুচোখ বড় করে সেবতি দৃশ্যটি দেখে। একটু উদাস লাগে সেবতিকে। সেবতিও নিশ্চয়ই চায় মা হতে। ওরও ইচ্ছে করে এভাবে বুক খুলে দুধ খাওয়াতে একটি ফুটফুটে শিশুকে।

—তোমার স্বামীও তো তোমাকে খুব ভালবাসে! আমি বলি।

—তা বাসে। আনোয়ার এই শাড়িটি আমাকে দিয়েছে তোমার বাচ্চার আকিকা উৎসবে পরার জন্য। ভাল নিশ্চয়ই বাসে।

—শাড়ি গয়না দেওয়া মানেই কী ভালবাসা সেবতি?

—নিশ্চয়ই। ভালবাসলে কৃপণতা করতে পারে না লোকে। টাকা পয়সা খরচ করতে হলে হৃদয়ের দরকার হয়। আর হৃদয় যার জন্য আকুপাকু করে, তাকে ইচ্ছে করে সব দিয়ে দিই। টাকা পয়সা ধন দৌলত যা কিছু সম্পদ আছে সব।

উৎসবের দিন লোকের ভিড় খানিকটা কমে এলে দোলন মন খারাপ করে আনন্দর কাছে এসে বসে, দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে বলে, সুমাইয়ার আব্বু এখনও বাচ্চা দেখল না।

—তার নাকি আসার কথা, তুমিই তো বলেছিলে। আনন্দকে কোলে তুলে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলি।

—আর বোলো না ভাবী। এত টাকার ব্যবসা। ব্যবসায় লাভ হচ্ছে খুব, এখন যদি নড়ে ওখান থেকে, সর্বনাশ হবে। কাল আমাকে টাকা পাঠিয়েছে মনিঅর্ডার করে, আমার শাশুড়িকেও পাঠিয়েছে।

দোলনের নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ঘাম আমি আঙুলে মুছে দিই। বলি, কী করবে টাকা দিয়ে?

—ভাবছি আনন্দের জন্য কিছু কিনব।

—আনন্দর জন্য কিছু কেনার দরকার নেই। তুমি নিজের জন্য কেনো, সুমাইয়ার জন্য কেনো। দোলনের জন্য বড় মায়া হতে থাকে আমার।

উৎসবের পরদিন থেকে হারুন আপিস যেতে শুরু করে। যাওয়াই কেবল, আপিসে তার মন টিকছে না সে বুঝি। দিনে দশ-বারোবার ফোন করে, আনন্দ কী করছে?

আনন্দ ঘুমোচ্ছে। আনন্দ খাচ্ছে। আনন্দ হাবিবের কোলে, হাসানের কোলে, শাশুড়ির কোলে, শ্বশুরের কোলে।

বিকেলে আপিস থেকে ফিরে আনন্দকে কোলে নিয়ে হারুন বাড়িময় হাঁটে। আনন্দকে নিয়ে হারুনের অতি উৎসাহ দেখে বাড়ির মানুষগুলোও আনন্দকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বা করতে বাধ্য।

হারুনকে শাশুড়ি বা দোলন বা হাবিব হাসান আনন্দ আজ হেসেছে হাত নেড়েছে এসব খবর দেয়।

আনন্দকে স্নান করানো, দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোয় আমি যত না জড়াই, হারুন তার চেয়ে বেশি জড়ায়, বাড়ির মানুষও।

হাসানের সৌদি আরবে যাওয়ার ব্যাপারটি পাকা হয়ে গেছে তা উৎসবের দুদিন পর রাণু আমাকে দেয়। খুশিতে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাবী আমার কপাল খুলে গেল।

রাণুর কপালে হাত দিয়ে আমি হাসি, কপালটি দেখতে তো আগের মতোই আছে। এর কোনও পরিবর্তন তো দেখছি না।

খুশিতে রাণুর চোখে জল।

নিজে সে জল মুছতে মুছতে বলল, ও আগে যাবে। পরে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

বললাম, আমাদের ছেলে চলে যাবে, কষ্ট হবে না?

কষ্ট কেন হবে। নিজের সংসারেই বেশি সুখ ভাবী। পরের সংসারে হয়তো ভাল খাওয়া পরা যায়, কিন্তু স্বস্তি নেই। নিজের সংসারে ডাল-ভাত খেলেও স্বস্তি। রাণুর বয়সে আমি মাঠ জুড়ে গোল্লাছুট খেলে বেড়িয়েছি। বারো কি তেরো বছর বয়স রাণুর। এখনই পাকা সংসারি মেয়েদের মতো কথা বলে। বিয়ে জিনিসটি মেয়েদের বয়স ধুম করে বাড়িয়ে দেয় বোধ হয় আমি ভাবি।

এই রাণু, আমি গলা নামিয়ে বলি, হাসান তোমাকে ভালবাসে?

রাণু ঠোঁট উলটে বলে, ভালবাসার আর দরকার কী? নিজের একটি সংসার হচ্ছে, সংসার করব মন দিয়ে। ঘর ঘোছাব, রান্নাবান্না করব, স্বামীর জন্য অপেক্ষা করব, স্বামীকে খাওয়াব, নিজে খাব, এক সঙ্গে ঘুমোব, বাচ্চা কাচ্চা হবে, তাদের লালন পালন করব।

—বাহ, এ সব করলেই হল বুঝি, ভালবাসার দরকার নেই?

রাণু ঠোঁট উলটে বলে, ভালবাসা তো আগেই হয়েছে। যখন ইসকুল পালিয়ে ওর সঙ্গে সিনেমায় যেতাম, পার্কে ঘুরে বেড়াতাম। এক দিন তো বড় বোনের শাড়ি

পরে সাবালিকা সেজে বিয়ে বসলাম।

—আচ্ছা বিয়ে কী করে বসে, বল তো। তুমি কি বিয়ের দিন কোথাও বসেছিলে, আর হাসান দাঁড়িয়েছিল?

রাণু খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে ওর গাল গোলাপি হয়ে ওঠে, বলে, তা নয়, আমরা দুজনেই বসেছিলাম, কাজির আপিসে। তবে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে বিয়ে বসা, আর ছেলেদের বিয়ে করা।

—এই পার্থক্যটা কেন হয়েছে?

রাণু বলে, বিয়ের পর মেয়েরা বাপের বাড়িতে বসে থাকে আর ছেলেরা কাজ করে, তাই।

রাণুর কথায় হাসতে চেয়েও হাসি আসে না আমার। এই একরত্তি মেয়েটা এত কিছু বোঝে কী করে!

হঠাৎ হঠাৎ হাসতে হাসতে বড় কঠিন কথা বলে ফেলে। আর দেখে মনে হয় নিজের দিকে ছাড়া ও আর কারও দিকে তাকায় না, অথচ এই রাণুই খবর রাখে এ বাড়ির কার কোথায় কী হচ্ছে।

রাণুকে আমার আবার বলতে ইচ্ছে হয়, লেখাপড়া চালিয়ে যাও। কিন্তু ও নিজেই বলেছে আরও লেখাপড়া করার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। কি লাভ এম এ বি এ পাশ করে? ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। সাত ক্লাস অবদি পড়েও বিয়ে করে স্বামীর সংসারে ঘানি টানতে হয়, এম এ পাশ করেও করতে হয়।

উৎসবের পরও উৎসবের রেশ থেকে যায়। বেলুনে ঝুলে থাকে, রেফ্রিজারেটর উপচে পড়ে বাড়তি খাবারে। খুচরো অতিথি আসতে থাকে। ভাসতে থাকে মানুষগুলো হাসিখেলায়, সুখোভেলায়। কিন্তু দিন আবার আগের মতো হতে থাকে একটু একটু করে। হঠাৎ হঠাৎ দোলনের মিহি কান্নার সুর ভেসে আসতে থাকে এক গভীর রাতে। শাশুড়ি হাবিবের জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকেন। আমি আনন্দকে এর ওর দায়িত্বে দিয়ে অথবা ঘুম বাড়িয়ে টুকটাক রান্না করতে থাকি। শ্বশুর দিন দিন গম্ভীর হতে থাকেন।

একদিন শাশুড়ি বলেন, হারুনের তো চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা। কিছু বলেছে তোমাকে?

আমি মাথা নাড়ি, না তো কিছু বলেনি।

—আনিসের জামিন তো আজও হল না। হারুন বলেছিল ও চট্টগ্রাম নিজে যাবে।

—কী করে যাবে, ছেলে বলতে ও তো অজ্ঞান, চট্টগ্রামে কি আনন্দকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারবে?

—যতদিনই পারুক, থাকতে হবে তো! যত হোক নিজের বোনের স্বামী। হাবিবের ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে, ও তো পরীক্ষা দিল না এ বছর।

আনন্দ ছিল হাবিবের কোলে, ও নীচের বাগান থেকে আনন্দকে হাওয়া খেতে

নিয়ে গিয়েছিল, হাবিবের হাত থেকে আনন্দকে নিয়ে বলি, কি তোমার পড়ালেখার কী খবর?

—ও গোল্লায় গেছে।

—আর গান টান গোল্লায় যায়নি?

হাবিব একগাল হেসে বলে, সে চলছে ভাল। আমাদের দলের নাম কী জানো? ডিফারেন্ট টাচ।

—আচ্ছা আজকালকার ছেলেছোকরারা গানের দল করলে নাম ইংরেজিতে দেয় কেন?

লিকলিকে হাবিব হেসে লতার মতো বেঁকে যেতে থাকে, বলে, বেশ তো আজকালকার বলছ, তুমি কি খুব সেকেলে নাকি? বুড়ো হয়ে গেছ?

—তা তো গেছি কিছু। বাচ্চার মা হয়েছি।

শাশুড়ি বলেন, একে এত আশকারা দিয়ো না তো গানের ব্যাপারে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে বল।

শুনে আমার বেশ ভাল লাগে। আমার উপদেশের মূল্য আছে তা হলে। আমাকেও সম্ভবত এখন মুরুব্বি বলে মনে করা হয়। তাই হয়তো, নীচতলার ভাড়ার টাকা আগে যেমন শাশুড়ির হাতে দেওয়া হত, এখন আমার হাতে দেওয়া হয়। হারুনই বলেছে, সেবতিকে বোলো টাকাটা তোমার হাতেই দিয়ে যেতে। সংসারের খরচে লাগিও টাকাটা। টাকা হাতে আসার পর থেকে বাজার করা, মাঝে মাঝে হাবিবের আবদার সওয়া, আনন্দর জন্য লেগেই আছে কেনাকাটা—সব সারতে হয়।

—আগামি বছর যদি পরীক্ষা না দাও, তোমাকেও বিদেশে পাঠিয়ে দেবে আনন্দর বাবা।

হাবিব দু হাত জড়ো করে বলে, ও কাজটি করতে দিয়ো না ভাবী। আমাদের ডিফারেন্ট টাচ এমন জনপ্রিয় হবে, দেখে নিও আমি কিছু একটা হবই হব।

শাশুড়ি খুশি হন হাবিবের ব্যাপারে আমার নাক গলানোয়।

শাশুড়ি খুশি হন সুমাইয়ার হাত ভরে, ফ্রকের কোঁচড় ভরে কিছু খেলনা দিই।

দিন স্তিমিত হতে থাকলেও হারুনের উচ্ছ্বাসে কোনও ভাটা পড়ে না। আনন্দকে নিয়ে তার মাত্রাছাড়া আবেগ আগের মতোই। আনন্দর কাঁথা কাপড় ধোয়ার জন্য, দুধের জল গরম করার জন্য, গরম জলে আনন্দর দুধের বোতল থাল বাটি ধোয়ার জন্য, ঘুমিয়ে থাকলে আনন্দ যেন গড়িয়ে বিছানা থেকে পড়ে না যায়, সেদিকে চোখ রাখার জন্য একটি বারো বছর বয়সি মেয়েকে কাজে রেখেছে হারুন। আপিস থেকে ফেরার পথে আনন্দ যদিও এখন খেলনা বলতে কিছু বুঝতে শেখেনি, রাজ্যির খেলনা নিয়ে আসে, চাবিঅলা গাড়ি, উড়োজাহাজ এ সব। বোতাম টিপলে কথা বলে এমন সব পুতুল।

হারুনের এখন জগৎ বলতে আনন্দ। রাতে যতবার কেঁদে ওঠে আনন্দ, হারুনই উঠে ওকে জল বা দুধ খাওয়ায়, কাঁথা বদলে দেয়। ছুটির দিনে তো আনন্দ স্নান করানো, দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, প্যারামবুলেটরে করে ওকে বাগানে

বেড়াতে নেওয়া সব হারুনই করে। আনন্দকে কাছে পাওয়ারই সুযোগ হয় না তখন আমার।

—আনন্দ যত না আমার, মনে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি তোমার।

শুনে হারুন তৃপ্তিতে হাসে।

যেহেতু এ বাড়িতে হারুনকে হারুন ডাকা নিষেধ, ডাকি আনন্দর বাবা বলে। এতে হারুনের খুশি আরও উথলে পড়ে। আনন্দর বাবা কোথায় গেলে, আনন্দর বাবা এদিকে এসো তো—যতবারই ডাকি, হারুনের ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে ওঠে বাবা হওয়ার গর্ব। আনন্দকে কোলে নিয়ে বাড়িময় হেঁটে বেড়ায়, বাড়ির সবাইকে ডেকে ডেকে বিষম উত্তেজনায় দেখাতে থাকে আনন্দ কী করে তাকিয়েছে, কী করে বা বা বলছে, নিশ্চয় বাবা বলে ডাকছে তাকে, কী করে হাত নাড়তে নাড়তে হারুনের গালে আদর করে দিচ্ছে—আমার মনে হয় দোলনের বুঝি ঈর্ষা হচ্ছে দেখে, কারণ হারুন সুমাইয়াকে একটিবার কোলেও তোলে না, সুমাইয়া পাশে দাঁড়িয়ে যখন হারুনের আদর দেখে আনন্দর জন্য। শাশুড়িরও সম্ভবত রাগ হয়, অথবা আশঙ্কা হয়। হারুন তার ভাইবোনের কথা আগে যেমন বলত বা ভাবত, এখন আর তেমন নয়। এখন সব ছাপিয়ে আনন্দ তার জগৎ দখল করেছে। তার জীবন জুড়ে বসেছে। রীতিমতো রাজত্ব করছে।

যার যেমনই লাগুক, আনন্দর জন্য হারুনের এই ভালবাসা আমাকে প্রচণ্ড ভাল লাগা দেয়।

১৮

সময় চোখের পলকে উড়ে যায়, পাখির মতো যায়। সময় যে যায় যায়ই, ফিরে আসার নাম করে না। সময় তো আর মেয়েমানুষ নয় যে শেকলে বাঁধা যাবে, চারদেয়াল আটকে রাখা যাবে! আধঘুমে হাত বাড়িয়ে একদিন চমকে সজাগ হই, হাতটি শূন্যতাকে ছুঁয়ে ফিরে আসছে। আনন্দ কোথায়? পাশে হারুন ঘুমোচ্ছে, তাকে ঠেলে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করতে নিই আনন্দ নেই কেন এখানে, হাতটি ফিরিয়ে নিই, হঠাৎ চেতন ফেরে বলে, আনন্দ তো বছর পার হয়ে গেল শাশুড়ির ঘরে ঘুমোয়, ওর আলাদা বিছানায়। ও বড় হতে হতে এত বড় হয়েছে যে বাড়ির কাছেই ছোট বাচ্চাদের একটি ইসকুলে ভর্তি হয়ে গেছে। আনন্দ তো সেই আগের ছোটটি নেই। হাঁটতে শিখেছে, দৌড়োতে, কথা বলতে, ছবি আঁকতে, এমনকী বইয়ের অক্ষরে আঙুল রেখে পড়তেও। আনন্দকে নিয়ে হারুনের আহ্লাদ এতটুকু কমেনি কোনওদিন। আনন্দকে বাবা বলতে শেখাচ্ছিল সে আনন্দর জন্মের দিন থেকেই। আনন্দ মা বলার আগে বাবা বলতে শেখে, শুধু বাবা নয়, বাবা খাব, বাবা যাব, বাবা কোল, বাবা দোল। আনন্দর মুখের বাবা ডাকা হারুনকে যত সুখী করেছে, পৃথিবীর আর কিছু তাকে করেনি, সে বারবারই বলেছে। এত সুখী সে যে তার কোম্পানির নামই পালটে দিয়েছে, মডার্ন ট্রেডার্স

এখন আনন্দ ট্রেডার্স।

তিন বছরে কেবল আনন্দই যে বড় হয়েছে তা নয়, আরও অনেক কিছু ঘটে গেছে এ সংসারে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শ্বশুর মারা গেছেন। হাসান আর রাণু চলে গেছে সৌদি আরবে। হাবিব গানের দল থেকে বেরিয়ে চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে। আনিসকে তালাক দিয়ে দোলন বাড়িতে বসে আছে, ধীরে ধীরে অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠছে ও, একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলে, সুমাইয়ার বই খাতা ছিঁড়ে বালতির পানিতে ডুবিয়ে রাখে, আনন্দকে একলা পেলে গালে চড় কষায়, আনন্দর গলার সোনার চেইন খুলে ও একদিন জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। শাশুড়ি দোলনের জন্য প্রায়ই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন, জায়নামাজে বসে মোনাজাতের হাত তুলে দীর্ঘ সময় কাটান।

সেবতিরা চলে গেছে, অন্য ভাড়াটে এসেছে নীচতলায়, চার মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে এক মধ্যবয়সী দম্পতি। চলে যাবার আগে সেবতি এসেছিল দেখা করতে, বলেছে আফজাল চিঠি লিখেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, ওখানে এক মেমসাহেবকে বিয়ে করেছে ও, সুখে আছে, ওদেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। সেবতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে চলে গেছে, আনোয়ার গেছে কুমিল্লায় এন জি ও চালাতে।

আমার পরিবর্তনও লক্ষ করার মতো। আমার মাথা থেকে ঘোমটা খসেছে। একাই বাড়ি থেকে বেরোই যখন প্রয়োজন, বাজার করতে যাই, ঘুরে বেড়াতে যাই, ওয়ারি যাই, নুপুরের বাড়ি যাই, শিপ্রা আর দীপুর সংসারে দিন কাটিয়ে আসি, নাদিরা চন্দনা সুভাষ আরজুর বাড়িতে আড্ডা দিয়ে আসি। চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে, নাদিরা জানিয়ে দিয়েছে সে বিয়ে-টিয়ে করবে না। সুভাষের বিয়ের কথা চলছে। টিউশনি করে ও সংসার চালায়, এখনও ভাল কোনও চাকরি পায়নি। আরজু ওর বাবার কোম্পানিতেই কাজ করছে, ইচ্ছে একটি জাহাজ কিনবে।

অনেকদিন উৎসব হয় না বাড়িতে। হারুনকে বলি উৎসবের আয়োজন কর, আমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করব এ বাড়িতে।

হারুন জিজ্ঞেস করে, তোমার বন্ধুদের?

—হ্যাঁ আমার বন্ধুদের।

—কারা তোমার বন্ধু?

—হারুনের চোখে চোখ রেখে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলি, তুমি চেনো আমার বন্ধুদের। সুভাষ, আরজু, চন্দনা, নাদিরা ওদের তো নিশ্চয় চেনো, চেনো না?

—ও ওরা!

হারুন মাথা নাড়ে, সে চেনে।

হারুন আর আমি দুজন কাঁচা বাজারে ঢুকে রাজ্যির বাজার করি। রসুনি আর সখিনাই রান্না করে সপ্তব্যাঞ্জন। বিকেলে বন্ধুরা এক এক করে আসে। ছুটির দিন, হারুনের আপিস যাওয়া নেই। পাজামা পাঞ্জাবি পরে গায়ে সুগন্ধী মেখে ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসি ঝুলিয়ে আমার বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানায়। আমি লাল পেড়ে শাদা শাড়ি পরে মাথায় বেলি ফুল গুঁজে যেন পয়লা বৈশাখের উৎসব করছি, মুখে হাসি, মনে

ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনা সরিয়ে ফেলে আগুন জ্বালার উচ্ছ্বাস, বসি বন্ধুদের পাশে। যদিও সুভাষ আরজু চন্দনা আর নাদিরার মধ্যে আগের মতো দেখাসাক্ষাৎ হয় না, আড্ডা জমে না, কিন্তু বন্ধুত্বে কোনও ভাটা পড়েনি। অনেকদিন পর পুরনো বন্ধুরা মিলিত হয়ে আগের মতো উচ্ছল হয়ে উঠল। যে আমি বিচ্ছেদের কারণ হয়েছিলাম, সেই আমিই আজ সেতুর মতো। ওরা হারুনের সামনে প্রথম অপ্রতিভ ছিল, পরে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠল যখন হারুন নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছে এতকাল যে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি, তা আমার ইচ্ছেয়, হারুনের ইচ্ছেয় নয়।

নিজের কাঁধে সব দোষ নিয়ে হারুনকে যেমন আমার বন্ধুরা একসময় আমুদে মানুষ হিসেবে জানত, সেরকমই যেন জানে, আমি তাকে কাছে টেনে বলি, চল দুজন মিলে দূরে কোথায় দূরে দূরে গানটি গাই। হারুন না না করে ওঠে, আমি গাইতে জানি নাকি! তুমি গাও। না তোমাকেও গাইতে হবে। তা হলে ওই গানটি ধর, ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া...অনেক অনেকদিন পর হারুন আমার সঙ্গে গায়। গানের কথাগুলো আমারও মনে নেই, হারুনেরও নেই। নাদিরা বলে বলে দেয়। গানে গান জাগে। সুভাষ গেয়ে ওঠে—আজ নয়, কাল নয়, পরশু, বিভাবরী সূর্য তো উঠবে... গেয়ে উঠি। সঙ্গে বাকিরা। এই গানটি বাবা গাইতেন আমাকে নুপুরকে সুভাষ আর সুজিতকে নিয়ে। গান শেষে একবার ইচ্ছে করে সুজিতের প্রসঙ্গ তুলি। সুভাষকে যদি গ্রাস করে ফেলে বিষাদ, না—আজ কোনও কষ্টের কথা বলব না, আজ কোনও দুঃখ নয়, আজ আনন্দ। তবু একটি আশঙ্কা উঁকি দেয় মনে, সুভাষ কি ওর মাকে নিয়ে দেশান্তরী হবার কথা ভাবছে, ভাবছে কি এই দেশ আর নিরাপদ নয় ওদের কারও জন্য!

সুজিতের মৃত্যুর পর আমার গলায় তেমন জোর নেই যে সুভাষকে বলি এই দেশ তোরও দেশ। সকলে জানে সুজিত মারা গেছে সড়ক দুর্ঘটনায়, কিন্তু বাবার কাছে ঘটনাটি শুনেছি সেদিন। কোনও সড়ক দুর্ঘটনা নয়, সুজিত আরমানিটোলা মাঠে ফুটবল খেলছিল, খেলার মাঠ থেকে মুখচেনা দুটো ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। একেবারে সোজা তারা মসজিদিতে। মসজিদে ঢুকে সুজিত জিজ্ঞেস করে, কী করতে আমাকে এনেছ এখানে?

ছেলেদুটো বলল, এখানে তুই মুসলমান হবি। বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

দৌড়ে পালাতে গেল সুজিত, শক্ত হাতে ধরে ফেলল তাকে ছেলেদুটো। সুজিত তখন চিৎকার করে বলছে যে সে মুসলমান হবে না।

মুসলমান হবি না তো দেখ, বলে ছেলেদুটো সুজিতকে টেনে নিয়ে গেল নদীর ধারে, ওখানেই সন্ধের অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা একশো লোকের সামনে দা দিয়ে কুপিয়ে সুজিতকে মেরেছে ওরা। কত বয়স ছিল সুজিতের! সতেরো কি আঠারো।

কষ্টে গলা বুজে আসছে যেই, সুভাষের পিঠে চাপড় দিয়ে মনের জোরে কষ্টকে আপাতত সরিয়ে বলি,—দেখিস সাবধান, বিয়ের পর আবার বন্ধুদের ভুলে যাসনে যেন।

—কীসের বিয়ে, নাদিরা বলে, ওর তো বিয়ে টিয়ে হচ্ছে না, মিনি ভেগেছে।

—এত বছর প্রেম করার পর?

—সুভাষ যত না প্রেম করত, তার চেয়ে বেশি প্রেম করছে ভাবত।

কষ্ট লুকোতে আমি আর কি পারি, সুভাষ আমার চেয়ে অনেক পারে। সুজিত কি করে মারা গেছে, এ কথা একবারও আমাকে ও বলেনি, কাকিমার যে ক্যানসার হয়েছে, বলেনি। সুভাষের দিকে চেয়ে মনে মনে বলি, তুই এই দেশে ছেড়ে কোথাও যাসনে, এখানে নিতুন কাকার স্মৃতি আছে, বুড়িগঙ্গার জলে সুজিতের রক্ত আছে, এত সব ছেড়ে কোথায় পালাবি তুই!

ক্লিক। আরজুর নতুন ক্যামেরায়। ক্যামেরায় আমার উদাস মুখটি। সুভাষের অপ্রস্তুত ভঙ্গিটিও। আরও ছবি ওর চাই। আমাকে টেনে কোলে বসিয়ে দিল হারুনের। হারুন ভাই শীতল নয় শীতল নয়, উষ্ণ আলিঙ্গন চাই, হাসুন, কৃত্রিম নয়, অকৃত্রিম হাসি চাই বলে বলে ক্যামেরার বোতাম ও টিপতেই লাগল, চন্দনা আনন্দকে বসিয়ে দিল কোলে, ব্যাস, ছোট পরিবার সুখী পরিবার বলে রব উঠল। আনন্দকে এক হাতে আরেক হাতে হারুনকে জড়িয়ে সুখী পরিবারের সুখী নারী হেসে উঠল খিল খিল। ক্লিক ক্লিক। এরপর হারুনের হাতে ক্যামেরা দিয়ে বাবা তুমি একটু বোতাম টেপো তো—বলে পুরনো বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে, কোমর জড়িয়ে, গলা জড়িয়ে, পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। হারুন বাধ্য স্বামীর মতো বোতাম টিপে গেল। টিপছে, কিন্তু কোনও বিরক্তির ভাঁজ নেই কপালে। সম্ভবত ভাবছে, এ যখন সংসারে রক্তে মাংসে মনে মস্তিষ্কে জড়িয়ে আছে, যখন বাঁধাই পড়েছে সন্তানে, তখন মাঝে মাঝে সুতো ঢিলে করলে এম কোনও ক্ষতি নেই, যদি এত ইচ্ছেই করেছে বন্ধুদের খাওয়াবে—একদিন না হয় খাওয়াক। সুতো ঢিলে করলে ক্ষতি নেই তো বটেই, বরং ঢিলের মজাটি বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করা যায়। হারুন তাই করছে, মজা করে মজা দেখছে, কিন্তু আমি তাকে বোঝাতে চাই, সুতো ঢিলে করলে কোথাও কোনও অসঙ্গতি হয় না। সুভাষ বা আরজুর সঙ্গে সম্পর্কটি যে ঠিক কি, তা বোঝানোর সুযোগ হয়।

আনন্দ আমার বন্ধুদের এক কোল থেকে আরেক কোলে গড়াতে থাকে। হই চই গান বাজনা, হাসি ঠাট্টায় মধ্যরাত ছুঁয়ে যাই। হারুনকে বোঝাতে চাই বন্ধুসঙ্গ আমাকে অন্যরকম প্রাণ দেয়, আমি যে আমি তা অনুভব করি, এবং এ অনুভবের প্রয়োজন আছে জীবনে। বোঝাতে চাই স্বামী সন্তান সংসারের বাইরেও মানুষের একটি জীবন আছে, যে জীবনের মূল্য অনেক।

খাওয়া দাওয়া শেষে যখন চা পান করছে সবাই, আর গল্প করছে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, সমাজ সংসার ইত্যাদি—সবাইকে থামিয়ে আমি দাঁড়াই। বলি, আমার প্রিয় স্বামী এবং প্রিয় বন্ধুরা, আমার কিছু জরুরি কথা আছে, কিছু চমকও আছে।

সবার চোখ আমার দিকে, কান পাতা, মন পাতা।

—আমার গালে কেউ একটি চড় দিলে আমি তার গালে দুটি চড় দিই, সে একদিন পর হোক কী এক যুগ পরে হোক, আমি কী খুব ভুল করি?

চন্দনা আর নাদিরা চেঁচিয়ে বলল, মোটেও না মোটেও না।

—আমার হাতে একটি কাগজ...

একটি কাগজ আমি মেলে ধরি সামনে। আমাকে থামিয়ে নাদিরা বলে, কে তোর গালে চড় দিয়েছিল শুনি!

জোরে হেসে উঠি। বলি, আরজু ওই আরজু আমার গালে একদিন চড় কষিয়েছিল।

আরজু লাফ দিয়ে ওঠে, ঝুমুর গাঁজা খেয়েছে রে গাঁজা খেয়েছে।

—মনে নেই বুঝি, মধুর ক্যান্টিনে বসে রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছিল, তুই ছিলি পিকিংপন্থী, আমি ছিলাম মস্কোপন্থী, মাও জেতংকে গাল দিয়েছিলাম বলে তুই উত্তেজিত হয়ে গালে চড় কষিয়েছিলি?

হতবাক আরজুর গালে দুটো নরম চড় দিয়ে আমি আবার হাতের কাগজটি তুলে ধরি।

—এই কাগজটি কেউ কি অনুমান করতে পারো, কীসের?

হারুন মাথা নাড়ে, সে অনুমান করতে পারে না।

চন্দনা বলে, বিয়ের কাগজ এটি।

নাদিরা উচ্চস্বরে হেসে বলে, কী জানি, ডিভোর্সের কাগজও হতে পারে।

সুভাষ বলে, কবিতা লিখেছিস?

আরজু ফোড়ন কাটে, লেনিনের ভাষণ নাকি!

—এটা আমার চাকরিতে যোগ দেওয়ার কাগজ।

একই সঙ্গে সবগুলো চোখ বিস্ফারিত।

—ভিখারুন্নেসা নুন ইসকুলে শিক্ষকতার চাকরি। আগামীকাল সকাল নটায় আমি চাকরিতে যোগ দেব।

সকলে হাততালি দিল, হারুন ছাড়া।

সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বলি, এই চাকরি যে আমি খুব নির্বিঘ্নে পেয়ে গেছি তা নয় কিন্তু, দরখাস্ত দিয়েছি, ডাক পড়েছে, পরীক্ষা দিয়েছি, লিখিত, মৌখিক। পাশ করে তবে ফল পেয়েছি।

—সব গোপনে? হারুন জিজ্ঞেস করে।

হারুনের গালে চুমু খেয়ে বলি, হ্যাঁ সব গোপনে, আমার আবার কিছু কিছু জিনিস গোপন করার অভ্যেস আছে কি না।

বন্ধুরা বিদেয় হয় অনেক রাতে। আরজু তার গাড়িতে সুভাষ, নাদিরা আর চন্দনাকে তুলে নেয়, ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ও গুলশান ফিরবে।

শুতে এসে হারুন আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে আগে বলনি কেন চাকরির কথা?

—বলিনি, চমকে দেব বলে।

—এমন একটি জিনিস, তুমি চমক হিসেবে নিয়েছ।

—তুমি তো চমকেছ, তাই না? আমি যে গোপনে গোপনে কত কিছু করে

ফেলতে পারি, সে দেখে অবাক হওনি?

—একটি চড় খেলে দুটি চড় দাও, ব্যাপারটা কি? কি বোঝাতে চেয়েছ?

একটু সময় নিই উত্তর দিতে। হারুনের ঔৎসুক্য আমাকে ঠেসে ধরে।

—বিয়ের পর তুমি তো আমাকে চাকরি করতে দাওনি, এর মানে চড় দিয়েছ আমার ইচ্ছের গালে। এখন বছর কয় বাদে নিজে চাকরির ব্যবস্থা করে তোমাকে চমকে দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, চাকরি পাওয়ার ক্ষমতা আমার আছে, এ হচ্ছে তোমার অনিচ্ছের গালে দুটি চড়।

—ও।

হারুন চড় প্রসঙ্গে আর কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, চাকরি করবে যে বলছ, কী করে করবে, আনন্দর কথা ভাবছ না? ওকে ইসকুলে আনা নেওয়া, এসব কে করবে?

—আমি করব, তুমি করবে, হাবিবও তো করতে পারে।

—আনন্দর নাওয়া খাওয়া, ওর দেখাশুনা, এসব?

—বাড়িতে আনন্দর জন্য আলাদা কাজের মেয়ে আছে। তা ছাড়া শাশুড়ি আছেন। আর আমি তো সারাদিনের জন্য হাওয়া হয়ে যাব না। বিকেলে আমার ক্লাস। আনন্দকে তার আগে ইসকুল থেকে নিয়ে আসব। এ সব নিয়ে ভেবো না তো।

হারুন স্পষ্ট করে বলছে না যে তুমি চাকরি করতে পারবে না, তোমাকে দেব না চাকরি করতে। বলছে না কারণ সে আমাকে আগের মতো নিরীহ গোবেচারা ধরনের মেয়েমানুষ ভাবছে না আর, ভাবছে না কারণ আমি নিজে নিজের চাকরি জোগাড় করার ক্ষমতা রাখি, আমি নিজে কিছু একটা ঘটিয়ে দিতে পারি, কারও ওপর নির্ভর করা ছাড়াই।

—আনন্দ তো কেবল তোমার ছেলেই নয়, আমার ছেলেও। ওর কীসে ভাল হবে, সে তো তুমি একাই শুধু ভাব না, ভাবি তো আমিও।

হারুন অনেকক্ষণ জানালায় উদাস তাকিয়ে থেকে বলে, তোমার কী টাকাপয়সার অভাব পড়েছে?

—টাকা পয়সার অভাব হবে কেন? তুমি তো আমাকে টাকা দিচ্ছই।

—তবে?

—সে তো তোমার টাকা। আমার টাকা তো নয়। নিজের টাকা উপার্জন করতে কেমন লাগে, আমার বুঝি জানতে ইচ্ছে করে না। নিজের টাকা দেখতে কেমন, খরচ করতে কেমন, এসবের স্বাদ নিতে আমার ইচ্ছে করে। আমার তো ইচ্ছে করে আমার নিজের উপার্জন থেকে আমি তোমাকে কিছু দিই, আনন্দকে দিই, আমার বাবা মাকে দিই। তুমি যেমন তোমার বাবা মার দায়িত্ব নিয়েছ, আমারও তো ইচ্ছে করে কিছুটা হলেও দায়িত্ব নিতে।

এ স্পষ্ট যে হারুন যেভাবে আমার জীবনকে দেখতে চাইছে, আমি সেভাবে যাপন করছি না আমার জীবন। হারুনের অঢেল টাকা, তার কারখানায় দুশো কর্মচারী কাজ করে, কেউ হারুনের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, থাকে

মুখ মাথা নিচু করে। হারুন যা আদেশ করে, দুশো কর্মচারী তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। হারুন যদি বলে ডানে যাবি না, বাঁয়ে যা, ওরা বাঁয়ে যাবে। হারুন যদি বলে, কড়া রোদে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাক, ওরা থাকবে। এত বশংবদ লোক দেখে অভ্যস্ত হারুন, ঘরের স্ত্রীকেও সে দেখতে চায় তেমনই। তার টাকার ওপর দুশো কর্মচারী যেমন নির্ভর করছে, ঘরের স্ত্রীও তো। সে কেন চাইবে দেখবে স্ত্রীটি হঠাৎ অবাধ্য হয়ে উঠছে, স্ত্রীকে বাঁয়ে যেতে বললে স্ত্রী ডানে যাচ্ছে! বিছানায় হারুন ছটফট করে, তার ঘুম আসছে না, লক্ষ করি।

হারুনের পাশে শুয়ে জানালার দিকে চোখ ফেলে ভোরের আলো দেখতে দেখতে ভাবি আমি, হারুনের স্ত্রী বটে আমি, কিন্তু পুরুষিক সুখের জন্য আমি নিজেকে ঘরের দাসিতে পরিণত করতে পারি না। যে দাসির আর কোনও কাজ নেই ঘরের ঝুল ময়লা দূর করা, খাবার তৈরি করা, সন্তান জন্ম দেওয়া, সন্তান লালন পালন করা, আর পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সব তৃষ্ণা মেটানো ছাড়া। এরকম কোনও শর্তে আমি হারুনকে বিয়ে করিনি।

বাবা একদিন বলেছিলেন, এ তোমার পছন্দের জীবন। এই জীবনই তুমি চেয়েছিলে, এই জীবনই বেছে নিয়েছ। তবে নিজের ব্যক্তিত্ব টিকে থাকে এমনভাবে বাঁচতে চেষ্টা কোরো। স্বামীর টাকায় খেয়ে পরে ব্যক্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে দেখেছি, হয় না। আসলে সম্ভবও নয়, একজন আমাকে পুষবে আর আমার ওপর মাতব্বরি করবে না, এ হতে পারে না। বাবার সব কথার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার এখন মনে হয়, হারুনের সঙ্গে আমি ঘোরাফেরা করেছি বলেই তাকে আমার বিয়ে করতে হবে, বাবার এই আদেশটি কোনও অর্থেই সঠিক ছিল না। বাবার মতো মুক্ত মনের মানুষের মধ্যেও অবচেতনে সংস্কার ছিল। হারুনকে আরও জানা আরও চেনা উচিত ছিল বিয়ে করার সিদ্ধান্তটি নেওয়ার আগে। প্রেম ঘটে আবেগে, এক সঙ্গে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত আবেগের উপর ভর করে হওয়া উচিত নয়। ভোরের আলো আমার গায়ে এসে পড়ে, রাতে না ঘুমিয়েও বড় স্নিগ্ধ, বড় শুদ্ধ, বড় তাজা লাগে নিজেকে।

সকালে আনন্দকে স্কলাসটিকা কিন্ডারগার্টেনে পৌঁছে দিয়ে আমি বেইলি রোডের ইসকুলে যাই রিকসা করে। প্রধান শিক্ষিকার ঘরে বসে কাগজে সই করি, নিজের কাজ বুঝে নিই। অদ্ভুক এক ভাল লাগায় মন ভরে থাকে। এই প্রথম নিজেকে খুব শক্তিমান বলে মনে হয় আমার। এই প্রথম আমি অনুভব করি, আমি একজন মানুষ, একজন আলাদা মানুষ, আমি কেবল হারুনের স্ত্রী বা আনন্দর মা, বা শাশুড়ির বউমা, দোলন হাসান আর হাবিবের ভাবীই নয়, আমার কেবল বাবা মার কন্যা, নূপুরের বোন নই, আমি জিনাত সুলতানা ঝুমুর, আমি শিক্ষিকা। আমি কোনও ফেলনা কিছু নই, আমি কোনও বস্তু নই, ঘর সাজাবার বা সংসার সাজাবার জিনিস নই, আমি একজন মানুষ, এবং এই সমাজকে দেবার আমার অনেক কিছু আছে, আমার ভেতর শক্তি আছে, আমার সামর্থ্য আছে। মাথায় ঘোমটা পরে সারাদিন স্বামী আর তার আত্মীয়দের সেবা করলে স্বামী এবং আত্মীয়দের লাভ হয় বটে, আমার কী হয় ক্ষতি ছাড়া? আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়াব, হারুন জানবে

আমি এখন তার অনেক নিষ্ঠুরতা আর মেনে নেব না, অনেক কিছুরই আমি এখন মোটেও পরোয়া করব না, কারণ কোনও কিছুর জন্যই আমি তার কাছে আর বাঁধা নই, নিজের জীবন যাপনের ব্যবস্থা আমি এখন ইচ্ছে করলেই করতে পারি। হারুনকে আমি ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা মানে এই নয় যে তার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করব, আমার সকল সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটবে। আমাকে ভালবেসে হারুন তো কিছু ত্যাগ করেনি। ভালবাসা মানে কখনও নিঃস্ব হয়ে যাওয়া নয়।

আনন্দর জন্মের জন্য আমার কোনও অপরাধবোধ নেই। আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এত নগণ্য তুচ্ছ মানুষ নই আমি যে একজন আমার গালে অযথা চড় কষাবে, আর আমি হজম করব তা, একজন আমাকে ধুলোয় মেশাবে আর আমি তাকে মাথায় তুলে পুজো করব। আনন্দকে যখন বাপ বাপ বলে হারুন আদর করে, আমার ভেতরে তখন সুখের ফোয়ারা ওঠে। সেই যে হারুনের অবিশ্বাসের আগুনে আমি পুড়েছিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পুড়েছিলাম, সেই আগুন, আমাকে পোড়ানো আগুন এখন আমি সুখের জলে নেভাই।